গ্রিম ভাইদের সমগ্র রচনাবলী

৩

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ ঃ
জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৩৬৫
মে ২৫, ১৯৫৮

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাধাই :
মহামায়া বাইন্ডার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

কবরের ঢিবি

এক ধনী চাষী একদিন তার আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিজের বাগান আর ক্ষেতের দিকে তাকিয়েছিল। ফসলের চারা তখন দিনকের দিন বাড়ছে ফলে-ফলে ছেয়ে গেছে বাগানের গাছ। গত বছরের প্রচুর ফসলের ভারে গোলাবাড়ির চিলেকোঠার কড়িকাঠগুলো ভেঙে পড়ার দাখিল। তার পর সে গেল গোয়ালে আর আস্তাবলে। গোয়ালে-গোয়ালে নধর গোরু আর জোয়ান ষাঁড়। আস্তাবলে-আস্তাবলে হৃষ্টপুষ্ট চক্‌চকে ঘোড়া। শেষটায় অন্দরমহলের ঘরে গিয়ে লোহার সিন্দুকগুলোর দিকে সে তাকাল। সেগুলোর মধ্যে ছিল তার টাকাকড়ি।

এইভাবে যখন সে তার ধনদৌলতের হিসেব-নিকেশ করতে ব্যস্ত এমন সময় খুব জোরে-জোরে ধাক্কা পড়ল—তার বাড়ির দরজায় নয়, তার হৃদয়ের দরজায়। সেটা খুলতে একটা স্বর প্রশ্ন করলে, "এইভাবে ধনদৌলত জমিয়ে তুমি কি ভালো কাজ করেছ? গরিবকে সাহায্য করেছ, আতুরের কাছে গিয়েছ? ক্ষুধার্তের সঙ্গে তোমার রুটি ভাগাভাগি করে নিয়েছ? যা পেয়েছ তাতে কোনোদিন তৃপ্ত হয়েছ? আরো বেশি ধনদৌলত কি সর্বদা কামনা কর নি?"

বিনা দ্বিধায় সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয় উত্তর দিল, "আমার মধ্যে কোমলতার বালাই নেই। আত্মীয়দের প্রতি কোনোদিন দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাই নি। গরিবলোক দোরগোড়ায় এলে দূর-দূর করে তাড়িয়েছি। ভগবানের কথা কোনোদিন ভাবি নি। সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছি ধনদৌলত বাড়াতে। স্বর্গমর্তের সব সম্পদ পেলেও তৃপ্ত হতাম না।"

নিজের হৃদয়কে এই উত্তর দিতে শুনে চাষীর সর্বাঙ্গ থর্থর্ করে উঠল। এমন জোরে হাঁটু কাঁপতে শুরু করল যে, সে বাধ্য হল ধপ্ করে বসে পড়তে।

এমন সময় আবার ধাক্কা পড়ল—কিন্তু এবার তার বাড়ির দরজায়। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল তার গরিব প্রতিবেশী। অগুনতি তার ছেলেমেয়ে সে জানত না কী করে তাদের খাওয়াবে।

গরিব লোকটি ভাবল, 'জানি—আমার পড়শি যেমন ধনী তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু ছেলেমেয়েরা রুটির জন্যে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তার কাছে সাহায্য চেয়ে দেখি, যদিও জানি খালি হাতেই ফিরতে হবে।' তার পর চেঁচিয়ে ধনী চাষীকে সে বলল, "জানি কোনোদিন কাউকে কিছু দাও না। কিন্তু ডুবন্ত লোকের মতো আমার এখন মরিয়ার মতো অবস্থা। আমার ছেলে মেয়েরা উপোস করে আছে। তাই কিছু গম ধার দাও।"

ধনী চাষী তার দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল। তার পর করুণার প্রথম সূর্যরশ্মিতে তার লোভের বরফ গলল। সে বলল, "গম তোমায় ধার দেব না, উপহার দেব। কিন্তু এক শর্তে।"

গরিব লোক প্রশ্ন করল, "কী শর্তে?"

"আমি মরবার পর তিন রাত আমার কবরের ওপর তোমার নজর রাখতে হবে।"

গরিব লোক আবার প্রশ্ন করল, "আমায় কী করতে হবে?"

ধনী চাষী আবার বলল, "আমি মরবার পর তিন রাত আমার কবরের ওপর তোমায় নজর রাখতে হবে।"

শর্তটার কথা শুনে গরিব লোক অস্বস্তি পেল। কিন্তু তখন তার অত্যন্ত দুরবস্থা। তাই আপত্তি করতে সাহস পেল না। রাজি হয়ে গম নিয়ে সে চলে গেল।

মনে হয় কী ঘটবে তার পূর্বাভাস ধনী চাষী পেয়েছিল। কারণ দিন কয়েক পরে অসুখে পড়ে হঠাৎ মৃত্যু হল তার। কেউ বুঝল না কিসে সে মরল। কেউই শোক করল না তার জন্য।

তাকে কবর দেবার পর গরিব লোকের মনে পড়ল প্রতিজ্ঞাটার কথা। শর্তটা অনায়াসেই না মানতে সে পারত। কিন্তু ভাবল, 'আমার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার লোকটা করেছিল। তার গম দিয়ে ছেলেমেয়েদের

খাইয়েছি। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা—তাকে যে কথা দিয়েছিলাম সেটার খেলাপ করা উচিত নয়।'

তাই রাত হতে গির্জের আঙিনায় গিয়ে কবরের ঢিবিটার উপর সে বসল। চার দিক একেবারে নিস্তব্ধ। কবরগুলোর উপর জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করতে লাগল। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ সুরে চেঁচাতে চেচাতে উড়ে যেতে লাগল এক-একটা প্যাঁচা। সূর্য ওঠার পর গরিব লোকের পাহারা দেওয়া শেষ হল। নিরাপদে সে বাড়ি ফিরল।

একই ভাবে কাটল দ্বিতীয় রাত। কিন্তু তৃতীয় রাতে তার গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। মনে হল ভুতুড়ে কোনো কাণ্ড-কারখানা ঘটবে। গির্জের আঙিনায় পৌঁছে সে দেখে পাঁচিলের ছায়ায় একটা অচেনা লোক। তখন আর লোকটা যুবক নয়, মুখে তার নানা ক্ষতচিহ্ন। কট্‌মট্ করে অস্থির চোখে গরিব লোকের দিকে সে তাকাল। একটা ছেঁড়া আলখাল্লায় লোকটার সর্বাঙ্গ ঢাকা। শুধু ঘোড়ায় চড়ার বুট-জোড়া দেখা যায়।

গরিব লোক তাকে প্রশ্ন করল, "কিসের খোঁজে এখানে এসেছ? গির্জের এই নির্জন আঙিনায় ভয়ে শিউরে উঠছ না?"

"কিছুই খুঁজছি না। কাউকেই ভয় পাই না। আমি সেই ছেলেটার মতো—অনর্থক যে বেরিয়েছিল কী করে কাঁপতে হয় শিখতে। তার সঙ্গে আমার তফাত শুধু এই—তার বিয়ে হয় এক রাজকন্যের সঙ্গে আর সে পায় প্রচুর ধনদৌলত। কিন্তু আমি যে গরিব সেই গরিব। দিনকের দিন আরো গরিব হয়ে পড়ছি। এক কালে সৈনিক ছিলাম। কিন্তু এখন বরখাস্ত হয়ে গেছি। এখানেই রাত কাটাব। কারণ অন্য কোনো আস্তানা আমার নেই।"

গরিব লোক বলল, "ভয় না পাও তো আমার সঙ্গে ঐ কবরটার ওপর নজর রাখতে এসো।"

লোকটা বলল, "নজর রাখাই তো সৈনিকদের কাজের একটা অঙ্গ। এখানে দেবতাই আসুক চাই ভূত-প্রেতই আসুক আমরা একসঙ্গে তার মুখোমুখি দাঁড়াব।"

তারা গিয়ে পাশাপাশি বসল কবরটার উপর।

মাঝরাত পর্যন্ত সব-কিছু চুপচাপ। হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এল একটানা চাপা শিস্ দেবার শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে তারা দেখে—শয়তান

স্বয়ং হাজির। শয়তান বলল, "দূর হ—এখানে ঘুর্‌ঘুর্‌ করছিস কেন? এই কবরের মধ্যে যে শুয়ে সে আমার সম্পত্তি। এক্ষুনি দূর হ, নইলে তোদের ঘাড় মটকাব।"

সৈনিক বলল, "টুপিতে লাল পালক গোঁজা, ভদ্রলোক মশাই। তুমি আমার ওপরওয়ালা অফিসার নও যে আমার ওপর হুকুম জারি করতে পার। তাই তোমার আদেশ পালন করলাম না। তোমাকে ভয় পাই না। পথ দেখো। আমাদের জ্বালিয়ো না।"

শয়তান ভাবল, 'নচ্ছার দুটোকে টাকাকড়ি দিয়ে হাত করতে হবে।' তাই গলার স্বরে মধু ঢেলে সে প্রশ্ন করল, "এক থলি মোহর পেলে ঝামেলা না বাধিয়ে চুপচাপ বাড়ি যাবে?"

সৈনিক উত্তর দিল, "তোমার প্রস্তবটা বিবেচনা যোগ্য। কিন্তু এক থলি মোহরে একেবারেই আমরা সন্তুষ্ট হব না। আমার লম্বা বুটের এক পাটিতে যত ধরে তত মোহর দিলে এখান থেকে যাব।"

শয়তান বলল, "আমার কাছে অত মোহর নেই। যদি অপেক্ষা কর তো পাশের শহরের এক সুদখোরের কাছ থেকে সেগুলো ধার করে আনতে পারি। লোকটা আমার বিশেষ বন্ধু। যত চাইব তত ধার দেবে।"

শয়তান শহরে চলে যাবার পর সৈনিক তার বাঁ পায়ের বুট খুলে বলল, "ওকে শায়েস্তা করছি। দোস্ত, তোমার ছুরিটা দাও তো।" ছুরি দিয়ে বুটের শুকতলা কেটে কবরের ঢিবিটার কাছে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে সেটা সে রাখল। পাশেই ছিল একটা খাদ। তার পর সে বলে উঠল, "এইবার ঠিক হয়েছে।"

দুজনেই বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এক থলি মোহর নিয়ে ফিরে এল শয়তান।

বুটটা দেখিয়ে শয়তানকে সৈনিক বলল, "মোহরগুলো ওটার মধ্যে ফেলো। থলিতে যে মোহর রয়েছে তাতে মনে হয় না বুটটা ভরবে।"

থলিটা উজাড় করল শয়তান। কিন্তু বুটের তলা দিয়ে সেগুলো পড়ে গেল খাদে। জুতোটা যেমন খালি ছিল তেমনি রইল।

তাই দেখে সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, "হাঁদারাম কোথাকার! আগেই বলেছিলাম—ওতে হবে না। আরো মোহর নিয়ে এসো গে।"

গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে শয়তান গিয়ে আর-একটা বড়ো-সড়ো মোহরের থলি নিয়ে এল।

সৈনিক বলল, "মনে হয় না এতেও বুটটা ভরবে।"

ঝন্‌ঝন্‌ করে মোহরগুলো পড়ল। কিন্তু বুটটা—যে খালি, সেই খালি।

জ্বল্‌জ্বলে চোখে বুটের মধ্যে তাকিয়ে শয়তান দেখল সৈনিক মিথ্যে বলে নি। মুখটা বেজায় বেজার করে সে বলে উঠল, "তোমার পা দেখছি বেঢপ বড়ো।"

সৈনিক বলল, "আমার পা যেমনই হোক-না কেন তোমার মতো আমার পায়ে ক্ষুর নেই। চট্‌পট্‌ গিয়ে আরো মোহর আনো। নইলে তোমার কথামতো কাজ করব না।"

শয়তান আবার গিয়ে ঘাড়ে করে এমন একটা বড়ো বস্তায় মোহর নিয়ে এল যেটার ভারে রীতিমতো সে টলছিল। বুটের মধ্যে মোহরগুলো সে ঢালল। কিন্তু বুটটা—যে খালি, সেই খালি। ভীষণ চটে সে চেষ্টা করল সৈনিকের হাত থেকে বুট ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আকাশে উঠল সূর্য। সঙ্গে-সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে শয়তান দিল চম্পট।

বড়োলোকের গরিব আত্মাটা বেঁচে গেল।

গরিব লোক তখন বলল সৈনিকের সঙ্গে সে মোহরগুলো ভাগাভাগি করে নেবে। কিন্তু সৈনিক বলল :

"আমার ভাগটা গরিবদের বিলিয়ে দিয়ো। ঈশ্বর যতদিন চান তোমার কুঁড়েঘরে গিয়ে ততদিন তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

শজারু আর খরগোশ

ছেলেমেয়েরা। এই গল্পটাকে প্রথমে তোমাদের মনে হবে একটা ধাপ্পাবাজি। গল্পটা কিন্তু সত্যি। কারণ এটা শুনেছিলাম আমার ঠাকুরদার মুখে। গল্পটা বলার সময় সর্বদা তিনি বলতেন, "ছেলেমেয়েরা। গল্পটা সত্যি, নইলে লোকে বলত না।" এবার শোনো গল্পটা :

সেদিন ফসল কাটার ঝল্‌মলে সকাল। আফিমগাছে ফুল ফুটেছে। আকাশে সূর্য ঝক্‌মক্ করছে। ফসল-কাটা ক্ষেতের উপর দিয়ে তাজা বাতাস বইছে। বাতাসে লার্ক পাখির গান। ঝোপে ঝোপে মৌমাছিদের গুন্‌গুন্। রবিবারের পোশাক পরে লোকেরা চলেছে গির্জেয়। মনে হয় সবাই আনন্দে ডগমগ। শজারুর মনেও তখন ফুর্তি।

বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শজারু গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজছিল— রবিবার সকালে যেরকম ভালো বা যেরকম মন্দ সুর ভাঁজতে পারে শজারুরা, ঠিক সেইরকম করে। আপন মনে গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে শজারুর মনে হল—তার বউ যতক্ষণ ছেলেমেয়েদের স্নান-টান করিয়ে পোশাক-আশাক পরাবে ততক্ষণে ক্ষেতে গিয়ে দেখে এলে মন্দ হয় না তার শালগমগুলো কতটা বড়ো হয়েছে। শালগমের ক্ষেতটা ছিল তার বাড়ির কাছেই। মাঝে মাঝে সে আর তার পরিবারের সবাই সেগুলো চুরি করে খেত। এইভাবে চুরি করে খেতে-খেতে তার ধারণা জন্মে গিয়েছিল শালগমগুলো তারই সম্পত্তি। দরজাটা বন্ধ করে শজারু গেল

ক্ষেতে। বাড়ি থেকে বেশি দূর সে যায় নি, শালগম ক্ষেতের কাছে বৈঁচি-ঝোপের কাছে সবে পৌঁচেছে, এমন সময় খরগোশের সঙ্গে তার দেখা। খরগোশও বেরিয়েছিল একই ধান্ধায়—তার বাঁধাকপিগুলো দেখতে। খরগোশকে আসতে দেখে বন্ধুর মতো শুভদিন জানাল শজারু। কিন্তু খরগোশ খুব ভারিক্কি চালের ভদ্রলোক, স্বভাবটাও উদ্ধত। তাই শজারুর অভিবাদনের কোনো উত্তর না দিয়ে নাক উঁচু করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়ে খরগোশ প্রশ্ন করল, "এত সকালে ক্ষেতে যে ?"

শজারু উত্তর দিল, "এমনিই—বেড়াতে বেরিয়েছি।"

হো-হো করে হেসে উঠে খরগোশ বলল, "বেড়াতে বেরিয়েছ ? মনে হচ্ছে তোমার পাগুলোকে আরো ভালো কাজে লাগাতে পার।"

খরগোশের টিপ্পনি শুনে শজারুর পিত্তি জ্বলে গেল। সব-কিছু সে সইতে পারে, কিন্তু নিজের পা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য সইতে পারে না। কারণ প্রকৃতিদত্ত পাগুলো তার বাঁকা। তাই সে বলল, "মনে হচ্ছে তোমার ধারণা, আমি আমার পা দিয়ে যা পারি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ নিজের পা দিয়ে তুমি করতে পার।"

খরগোশ উত্তর দিল, "তাই তো আমার ধারণা।"

শজারু খেঁকিয়ে বলল, "সেটা প্রমাণ হওয়া দরকার। বাজি ফেলে বলতে পারি, দৌড়ে তোমাকে হারিয়ে দিত পারব।"

হো-হো করে হেসে উঠে খরগোশ বলল, "বাঁকা-বাঁকা পা নিয়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে ? হা হা—খুব ভালো কথা। তোমার বাঁকা পায়ের কথা যাগ গে যাক। যখন দৌড়বার অতই তোমার সখ, আমি রাজি। কিন্তু বাজিটা কী ?"

শজারু বলল, "একটা সোনার মোহর আর এক বোতল আঙুর-রস।"

খরগোশ বলল, "রাজি। হাতে হাত ঝাঁকিয়ে এসো এক্ষুনি দৌড়নো যাক।"

শজারু বলল, "না অত তাড়াহুড়োয় দরকার নেই। আজ সকালে এখন পর্যন্ত আমার খাওয়া হয় নি। বাড়ি গিয়ে কিছু জলখাবার সেরে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাজির হব।"

তার প্রস্তাবে খরগোশ রাজি হতে শজারু চলে গেল। যেতে যেতে আপন মনে সে বলে উঠল, 'লম্বা-লম্বা পায়ের ওপর খরগোশের খুব।

ভরসা। আমি ওকে প্যাঁচে ফেলছি। ও মনে করে নিজে সে ভারি হোমরা-চোমরা কেউকেটা জাঁদরেল ভদ্রলোক। আসলে কিন্তু ভীষণ বোকা। বোকামির মাশুল ওকে দিয়ে দেয়াচ্ছি।'

এই-সব ভেবে বাড়ি ফিরে বউকে শজারু বলল, "বউ, চট্‌পট্‌ পোশাক পরে নাও। আমার সঙ্গে তোমায় ক্ষেতে যেতে হবে।"

তার বউ শুধোল, "কী ব্যাপার?"

"খরগোশের সঙ্গে আমি দৌড়ের বাজি ধরেছি—একটা সোনার মোহর আর এক বোতল আঙুর-রস। তোমাকে সাহায্য করতে হবে।

শজারুর বউ আঁতকে চেঁচিয়ে বলল, "কী ফ্যাসাদ বাধিয়েছ গো। তোমার কি মাথা খারাপ হল, নাকি ভীমরতি ধরল? খরগোশের সঙ্গে দৌড়বার কথা কী করে ভাবতে পারলে?"

উত্তরে শজারু বলল, "বেশি বকবক কোরো না। ওটা আমার ভাবার কথা। পুরুষদের কাজে নাক গলাতে এসো না। চট্‌পট্‌ পোশাক পরে নাও। আমরা একসঙ্গে যাব।"

বেচারা শজারুর বউ কী আর করে? ভালো লাগুক চাই না লাগুক, বরের কথা শুনতে সে বাধ্য হল।

যেতে-যেতে বউকে শজারু বলল, "যা বলি এখন মন দিয়ে শোনো। সামনের লম্বা মাঠটায় আমরা দৌড়ব। লাঙলের একটা রেখা ধরে খরগোশ দৌড়বে, আমি দৌড়ব লাঙলের আর একটা রেখা ধরে। মাঠের ওপাশ থেকে আমরা দৌড়তে শুরু করব। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না—শুধু লাঙলের রেখার এইখানটায় ঘাপ্‌টি মেরে থেকো আর খরগোশ তোমার কাছাকাছি পৌঁছলে লাফিয়ে উঠো আর চেঁচিয়ে বোলো, " 'আগেই এখানে পৌঁছে গেছি!' "

ক্ষেতে পৌঁছে বউকে শজারু দেখিয়ে দিল কোনখানে তাকে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতে হবে। তার পর সে গেল ক্ষেতের অন্য পাশে। সেখানে পৌঁছে শজারু দেখে খরগোশ তার জন্য অপেক্ষা করছে। শজারুকে সে বলল, "দৌড় দেবার জন্যে তৈরি?"

শজারু উত্তর দিল, "আলবৎ!"

তার পর দুজনে গিয়ে দাঁড়াল লাঙলের দুটো আলাদা-আলাদা রেখায়। খরগোশ গুনতে লাগল, "এক-দুই-তিন!" আর সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটতে শুরু করে দিল বাতাসের মতো। শজারু মাত্র দুয়েক পা দৌড়ে লাঙলের রেখার মধ্যে গুঁড়ি মেরে চুপচাপ বসে রইল।

ঝড়ের মতো ছুটতে-ছুটতে মাঠের অপর প্রান্তের কাছাকাছি খরগোশ পেঁৗছতেই শজারুর বউ চেঁচিয়ে বলল, "তোমার আগেই এখানে পেঁৗছে গেছি।

খরগোশ চমকে উঠল। ভীষণ অবাক হল। তার কোনোই সন্দেহ রইল না যে, শজারু নিজেই কথা বলছে। কারণ এ কথা তো সবাই জানে—শজারুর বউকে দেখায় হুবহু তার বরের মতো।

খরগোশ ভাবল, 'নিশ্চয়ই এখানে কোনো জাদুর মায়া রয়েছে।' তাই চেঁচিয়ে সে বলল, "এদিক থেকে ওদিকে আবার আমরা ছুটব।" এই-না বলে সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়তে শুরু করল ঝড়ের বেগে। বাতাসের ঝাপটায় কানদুটো তার চলে গেল মাথার পিছনে। শজারুর বউ কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রইল চুপচাপ বসে।

মাঠের অন্য প্রান্তে খরগোশ পেঁৗছলে হাঁক দিয়ে শজারু তাকে বলল, "আগেই পেঁৗছে গেছি!" খরগোশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "এদিক থেকে ওদিকে আবার আমরা ছুটব।"

শজারু বলল, "আমার আপত্তি নেই। যতবার বলবে ততবারই ছুটতে রাজি।"

এইভাবে খরগোশ ছুটল তিয়াত্তর বার। আর প্রতিবারই খরগোশ যখন মাঠের এ-প্রান্তে বা ও-প্রান্তে পেঁৗছয়—হয় শজারু নয় তার বউ চেঁচিয়ে ওঠে, "আগেই পেঁৗছে গেছি!"

চুয়াত্তর বারের বার খরগোশ তার দৌড় শেষ করতে পারল না। মাঠের মাঝ-বরাবর সে পড়ে গেল। গল্‌গল্‌ করে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। তার পর গেল মরে।

জিতের সোনার গিনি আর মদের বোতলটা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে বেজায় খুশি হয়ে শজারু ফিরল বাড়িতে। তারা মরে না গেলে নিশ্চয়ই এখনো বেঁচে আছে।

এইভাবে বুক্‌স্‌টেহুড্‌ হিথ্‌[১]-এ ছুটিয়ে ছুটিয়ে খরগোশকে মেরেছিল শজারু। তার পর থেকে কোনো খরগোশ বুকস্‌টেহুড-এর কোনো শজারুর সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কখনো নামে নি।

১ বুক্‌স্‌টেহুড জার্মানির একটি গ্রামের নাম। সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে মজার-মজার বহু প্রচলিত গল্পের জন্য এই গ্রাম বিখ্যাত, যেমন বিখ্যাত ফ্রান্সের সব মজার-মজার ফন্দি-ফিকিরের গল্প 'গ্যাস্‌কন্‌'-কে নিয়ে।

এই ইতিহাস থেকে তোমাদের দুটো শিক্ষা লাভ করা উচিত। প্রথমটা হল—নিজেকে যতই হোমরা-চোমরা মনে হোক-না কেন, কোনো মানুষেরই উচিত নয় তার চেয়ে নিচু স্তরের লোককে নিয়ে, এমন-কি, শজারুকে নিয়েও, ঠাট্টা-তামাশা করা। আর দ্বিতীয়টা হল—বিয়ে করার সময় নিজের স্তরের মেয়েকে বিয়ে করাই ভালো, যার চেহারার সঙ্গে স্বামীর চেহারার মিল আছে। তাই, যে-ই শজারু হোক-না কেন তার উচিত দেখা তার বউও যেন হয় শজারু।

ঢাকী

এক সন্ধেয় তরুণ এক ঢাকী একা-একা চলেছিল মাঠ দিয়ে। যেতে-যেতে একটা হ্রদে পৌঁছে সে দেখে তীরে পড়ে আছে তিন টুকরো রেশমী সাদা কাপড়। সেগুলো দেখে আপন মনে সে বলে উঠল, 'কাপড়গুলো আশ্চর্য সুন্দর তো!' এক টুকরো কাপড় পকেটে ভরে সে বাড়ি ফিরল। শুতে যাবার সময় কাপড়টার কথা তার মনেও রইল না।

সবে যখন তন্দ্রা এসেছে তার মনে হল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। কান খাড়া করতে সে স্পষ্ট শুনল কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, "ঢাকী, ঢাকী, জেগে ওঠো।"

রাতটা অন্ধকার ছিল বলে কাউকেই সে দেখতে পেল না। কিন্তু তার মনে হল খাটের পায়ের দিকে কে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। ঢাকী তাকে প্রশ্ন করল, "কী চাও?"

"গত সন্ধেয় হ্রদের তীর থেকে আমার যে-শেমিজটা নিয়ে এসেছ সেটা ফিরিয়ে দাও।"

ঢাকী বলল, "দিচ্ছি। কিন্তু আগে বল তুমি কে।"

সেই স্বর বলল, "আমি এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার মেয়ে। কিন্তু এক ডাইনি তুক্‌তাক্‌ করে কাঁচ-পাহাড়ে আমাকে নির্বাসন দিয়েছে। প্রতিদিন আমার দুই বোনের সঙ্গে ঐ হ্রদে স্নান করতে আসি। কিন্তু শেমিজটা না থাকায় আমি আবার উড়ে ফিরে যেতে পারছি না। আমার বোনেরা অনেক আগে উড়ে গেছে। কিন্তু বাধ্য হয়ে

আমাকে থাকতে হয়েছে। তোমায় মিনতি করে বলছি—শেমিজটা ফিরিয়ে দাও।"

ঢাকী বলল, "উতলা হোয়ো না। শেমিজটা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব।"

উঠে পড়ে পকেট থেকে সেটা বার করে মেয়েটিকে সে দিল। সাগ্রহে সেটা নিয়ে মেয়েটি ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে ঢাকী তাকে বলল, "এক মিনিট সবুর কর। তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারব।"

মেয়েটি উত্তর দিল, "কাঁচ-পাহাড়ে উঠে ডাইনির হাত থেকে আমাকে তুমি মুক্ত করতে পার। কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা পারা সম্ভব বলে মনে হয় না। পাহাড়টায় তুমি পৌঁছতে পার। কিন্তু সেটায় চড়তে পারবে না।"

ঢাকী বলল, "ইচ্ছে থাকলেই সব-কিছু করা যায়। তোমার ওপর আমার ভারি মায়া পড়ে গেছে। কাউকেই আমি ভয় পাই না। কিন্তু কাঁচ-পাহাড়ে যাবার পথ আমার জানা নেই।"

মেয়েটি উত্তর দিল, "তোমাকে আমি শুধু বলতে পারি পথটা গেছে এক বনের মধ্যে দিয়ে। সেই বনে নর-খাদকরা থাকে।" তার পর ঢাকী শুনল মেয়েটিকে হালকা পায়ে চলে যেতে।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে, ঢাকটা পিঠে ঝুলিয়ে নির্ভীকচিত্তে ঢাকী গেল সেই নরখাদকের বনে। বনের মধ্যে খানিকটা যাবার পর চার দিকে সে তাকাল কিন্তু কোনো দৈত্য তার চোখে পড়ল না। তাই সে ভাবল, 'কুঁড়েগুলোকে জাগানো দরকার।' এই-না ভেবে এমন জোরে-জোরে ঢাকে সে কাঠি দিল যে, ভয় পেয়ে উড়ে পালাল পাখির ঝাঁক

একটা দৈত্য ঘাসে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঢাকের বাদ্যি শুনে মিনিট কয়েকের মধ্যে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়ে পাইনগাছের মতো লম্বা আর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে দৈত্য দাঁত খিঁচিয়ে ঢাকীকে বলল, "হতভাগা! ঢাক পিটিয়ে আমার অত সাধের ঘুমটা ভাঙালি কেন?"

ঢাকী উত্তর দিল, "হাজার লোক যারা আমার পেছন-পেছন আসছে, ঢাকের বাদ্যি শুনে যাতে তারা পথ চিনতে পারে তাই ঢাক পেটাচ্ছি।"

দৈত্য প্রশ্ন করল, "আমার বনে তারা কী করছে?"

"তারা চায় তোকে খতম করে অন্য দৈত্য-দানাদেরও সাবাড় করতে।"

দৈত্য বলল, "তাই নাকি! আমি তাদের পিঁপড়ের মতো পায়ে পিষে মারবে।"

তাচ্ছিল্যের সুরে ঢাকী বলল, "তাদের ধরতে পারবি বলে ভেবেছিস নাকি? তাদের কাউকে ধরার জন্যে তুই ঝুঁকলেই বন্দুকের গুলির মতো ছুটে পালিয়ে সে লুকিয়ে পড়বে। ঘুমোবার জন্যে তুই শুলে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে শ'য়ে শ'য়ে বেরিয়ে এসে তোর শরীর বেয়ে তারা উঠে পড়বে। তাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে ইস্পাতের হাতুড়ি! চক্ষের নিমেষে তোর মাথার খুলিটা তারা গুঁড়িয়ে দেবে।"

কথাগুলো শুনে মনমরা হয়ে পড়ে দৈত্য ভাবল, 'এই ক্ষুদে-ক্ষুদে বিচ্ছু মানুষগুলোকে কী করে শায়েস্তা করতে হয় জানি না। নেকড়ে আর ভালুকদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কোন কায়দায় এই কেঁচোগুলোকে কাবু করতে হয় সেটা আমার জানা নেই।' তার পর সে চেঁচিয়ে বলল, "শোন্! তোরা এখন যদি চলে যাস আমি কথা দিচ্ছি তোর আর তোর স্যাঙাৎদের ভবিষ্যতে কোনোদিন কোনো অনিষ্ট করব না। তুই যদি এখন কিছু চাস তো বল—দেখি কী করতে পারি।"

ঢাকী বলল, "তোর ঠ্যাঙাদুটো খুব লম্বা। তাই আমার চেয়ে অনেক জোরে ছুটতে পারিস। আমাকে কাঁধে করে কাঁচ-পাহাড়ে পেঁৗছে দে। সংকেতে আমার লোকদের জানাচ্ছি তোকে না জ্বালিয়ে তারা যেন ফিরে যায়।"

দৈত্য বলল, "আমার কাঁধে উঠে বোস। যেখানে বলবি সেখানে নিয়ে যাব।"

ঢাকীকে দৈত্য কাঁধে তুলে নিতে মনের আনন্দে সে ঢাক পিটিয়ে চলল। দৈত্য ভাবল দলের লোকেদের সংকেত সে জানাচ্ছে ফিরে যেতে।

খানিক বাদে পথে দেখা গেল আর-একটা দৈত্যকে। প্রথম দৈত্যের কাঁধ থেকে ঢাকীকে তুলে তাকে সে রাখল তার পোশাকের বোতাম-ঘরে। বোতামটা থালার মতো বড়ো। সেটা চেপে ধরে মনের আনন্দে চলল ঢাকী।

তার পর তারা পেঁৗছল তৃতীয় দৈত্যের কাছে। দ্বিতীয় দৈত্যের বোতাম-ঘর থেকে চাষীকে তুলে সে রাখল তার টুপির কিনারে। সেখানে

পায়চারি করতে-করতে গাছপালার চুড়োর উপর দিয়ে তার চোখে পড়ল নীল দিগন্তে একটা পাহাড়। মনে মনে সে বলে উঠল, 'ওটাই নিশ্চয় কাঁচ-পাহাড়।' আর সত্যিই তাই। দৈত্য বড়ো-বড়ো করে কয়েক পা হাঁটতেই তারা পৌঁছে গেল কাঁচ-পাহাড়ে।

দৈত্য তাকে টুপির কিনার থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলে ঢাকী তাকে বলল পাহাড়টার চুড়োয় পৌঁছে দিতে। কিন্তু দাড়ির মধ্যে দিয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে কী সব বলে দৈত্য ফিরে গেল তাদের বনে। প্রকাণ্ড পাহাড়টার সামনে একলা দাঁড়িয়ে রইল বেচারা ঢাকী। পাহাড়টা এমনই উঁচু যে, মনে হয় যেন তিনটে সাধারণ পাহাড়কে ওপর-ওপর রাখা হয়েছে। তা ছাড়া সেটা স্বচ্ছ আর আয়নার মতো মসৃণ। কী যে করবে ভেবে পেল না ঢাকী। বার বার চেষ্টা করেও সে উঠতে পারল না। প্রতিবারেই গেল পিছলে পড়ে। তাই সে ভাবল, 'এখন যদি পাখি হয়ে যেতে পারতাম—!' কিন্তু ও কথা ভেবে আর লাভ কী? ভাবলেই তো আর ডানা গজায় না!

কী যে করবে ভেবে না পেয়ে সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় দেখে দুটো লোক মারামারি করছে। তাদের কাছে গিয়ে সে দেখে ঘোড়ার একটা জিন নিয়ে তাদের মারামারি। জিনটা মাটিতে পড়ে ছিল।

ঢাকী তাদের বলল, "তোমাদের তো ঘোড়াই নেই। মিছিমিছি তা হলে বোকার মতো জিন নিয়ে মারামারি করছ কেন?"

উত্তরে তাদের একজন বলল, "জিনটা নিয়ে মারামারি করার দস্তুরমতো কারণ আছে। জিনটায় বসে মনে-মনে যেখানে যেতে চাইবে চক্ষের নিমেষে সেখানে পৌঁছে যাবে। জিনটা আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি। এটাতে এখন আমার চড়বার পালা। কিন্তু ও লোকটা কিছুতেই আমায় চড়তে দিচ্ছে না।

ঢাকী বলল, "দাঁড়াও, তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।" এই-না বলে খানিক দূরে গিয়ে সাদা একটা খুঁটি সে মাটিতে পুঁতল। তার পর তাদের কাছে ফিরে এসে বলল, "ঐ খুঁটিটার কাছে আগে যে ছুটে পৌঁছতে পারবে জিনে বসবার প্রথম অধিকার তার।"

তার কথায় রাজি হয়ে দুজনেই ছুটতে শুরু করল। আর খানিকটা তারা ছুটে যেতেই জিনটায় বসে ঢাকী মনে মনে বলল, 'আমার ইচ্ছে—

কাঁচ-পাহাড়ের চুড়োয় উঠি।' চক্ষের নিমেষে সেখানে পৌঁছে সে দেখে চুড়োয় রয়েছে পাথরের পুরনো একটা বাড়ি। বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড একটা মাছ-পুকুর। তার কাছেই অন্ধকার গহন এক বন। সেখান কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর চিহ্ন সে দেখতে পেল না। গাছের শন্‌শন্‌ শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ সেখানে ছিল না। ঢাকীর মনে হল মেঘগুলো রয়েছে বনের ঠিক উপরে।

তিনবার টোকা দেবার পর এক বুড়ি বাড়ির দরজাটা খুলল। মুখটা তার তামাটে। চোখ দুটো লালচে। তার লম্বা নাকের উপর ছিল একজোড়া চশমা। মনে হল তাকে সে খুঁটিয়ে দেখে নিল। তার পর প্রশ্ন করল—সে কী চায়। ঢাকী সেখানে আশ্রয় চাইল। তার কথা শুনে বুড়ি বলল, "কাজ করলে আশ্রয় পাবে। তোমাকে তিনটে কাজের ভার দেব।"

ঢাকী বলল, "কাজ করতে ভয় পাই না, তা সে যত শক্তই হোক-না কেন।"

তার কথা শুনে বুড়ি তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ভালো-ভালো খাবার খাইয়ে শুতে দিল নরম একটা বিছানায়।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বুড়ি তার শুকনো কোঁচ্‌কানো আঙুল থেকে একটা অঙ্গুষ্ঠানা (সেলাই করার সময় ছুঁচের খোঁচা এড়াবার জন্য আঙুল-ঢাকা টুপি) ঢাকীকে দিয়ে বলল, "এই আঙুল-টুপি দিয়ে পুকুরের জল ছেঁচে ফেলবে—একফোঁটাও যেন না থাকে। সন্ধের মধ্যে কাজটা শেষ করা চাই। মাছগুলো পুকুরপাড়ে আলাদা-আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে ভুলো না।"

"অদ্ভুত ধরনের কাজ তো!" মন্তব্য করল ঢাকী। তার পর গেল পুকুরের জল ছেঁচতে। সারা সকাল দারুণ খেটে সে কাজ করল। কিন্তু ক্ষুদে আঙুল-টুপি দিয়ে বিরাট একটা পুকুরের জল ছেঁচে ফেলা তো সম্ভব নয়। সেভাবে কাজ শেষ করতে অন্তত হাজার বছর লাগবার কথা। দুপুরে খাবার সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে আপন মনে সে বলে উঠল, 'এইভাবে কাজ করা আর না করা—দুই-ই সমান।'

এমন সময় বাড়ি থেকে একটি মেয়ে এসে তার সামনে এক থালা খাবার রেখে বলল, "তোমাকে ভারি মনমরা দেখাচ্ছে—কী হয়েছে?"

ঢাকী তার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি পরমা সুন্দরী। হতাশ সুরে সে বলল, "বুড়ির প্রথম কাজটাই করতে পারছি না। অন্য দুটো কাজ করব কেমন করে? এক রাজকন্যের খোঁজে এখানে এসেছি। কিন্তু এখনো তার দেখাই পাই নি।"

মেয়েটি বলল, "এখানে অপেক্ষা কর। তোমাকে আমি সাহায্য করব। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। ঘুম ভাঙলে দেখবে কাজটা শেষ হয়েছে।"

খুশি হয়েই ঢাকী মেয়েটির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমে ঢাকীর দু চোখ বুজতেই জাদুর একটা আঙটি আঙুলে ঘুরিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, "জল, বেরিয়ে যা। মাছ, বেরিয়ে আয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে পুকুরের সব জল সাদা কুয়াশা হয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে গেল আর মাছগুলোও লাফিয়ে তীরে উঠে আকার আর রঙ অনুসারে আপনা-আপনি সার বেঁধে শুয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর ব্যাপারটা দেখে ভীষণ অবাক হল ঢাকী।

মেয়েটি বলল, "একটা মাছ অন্যদের সঙ্গে শুয়ে নেই। একেবারে একলা রয়েছে। কাজ শেষ হয়েছে কি না দেখার জন্যে সন্ধেবেলায় বুড়ি এসেই তোমাকে বলবে, 'মাছটা এখানে কী করছে?' সঙ্গে-সঙ্গে সেটা তার মুখে ছুঁড়ে মেরে বোলো 'বুড়ি ডাইনি, এটা রয়েছে তোর জন্যে'।"

সন্ধেয় বুড়ি এসে প্রশ্নটা করতেই ঢাকী তার মুখে মাছটা ছুঁড়ে মারল। বুড়ি এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন অপমানটা গায়েই মাখে নি। কোনো কথাও সে বলল না। কিন্তু ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো।

পরদিন সকালে বুড়ি তাকে বলল, "গতকাল খুব সহজ কাজ দিয়েছিলাম। তার চেয়ে কঠিন কাজ দেওয়া দরকার। আজ সন্ধের মধ্যে বনের সমস্ত গাছ কেটে, কাঠ চেলা করে সাজিয়ে রাখতে হবে।" কথাগুলো বলে ঢাকীকে সে দিল দুটো কুড়ুল আর দুটো করাত। কিন্তু সবগুলোই সীসের।

কী করবে ঢাকী ভেবে পেল না। কিন্তু দুপুরের খাবার নিয়ে সেই মেয়েটি এসে বলল, "আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম ভাঙলে দেখবে কাজটা শেষ হয়েছে।"

মেয়েটি তার আঙুলের জাদু আঙটি ঘোরাতেই ভয়ঙ্কর শব্দ করে বনের সব গাছ হুড়্‌মুড়্‌ করে ভেঙে পড়ল। মনে হল যেন অদৃশ্য অনেক দৈত্য সেগুলো কেটে ফেলেছে।

ঢাকীর ঘুম ভাঙতে মেয়েটি তাকে বলল, "শোনো! সব গাছগুলো কেটে চেলা করে সাজানো হয়ে গেছে। একটা ডাল শুধু পড়ে আছে আলাদা হয়ে। সন্ধেয় বুড়ি এলে সেটা দিয়ে তাকে এক-ঘা মেরো আর বোলো 'বুড়ি ডাইনি, এটা রয়েছে তোর জন্যে'।"

সন্ধেয় বুড়ি এসে বলল, "দেখলে তো, কী রকম সহজ কাজ দিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে ডালটা পড়ে কেন?"

ডালটা তুলে সেটা দিয়ে বুড়িকে এক-ঘা দিয়ে ঢাকী বলে উঠল, "বুড়ি ডাইনি, এটা রয়েছে তোর জন্যে।" কিন্তু মনে হল না আঘাতটা বুড়ি টের পেয়েছে। তার মুখে শুধু ফুটে উঠল বিদ্রূপের মৃদু হাসি।

বুড়ি বলল, "কাল সব চেলা-কাঠ গাদা করে আগুন ধরিয়ে দিয়ো।"

পরদিন ভোরে উঠে সে কাজ শুরু করল। কিন্তু একলা লোকের পক্ষে পুরো একটা বনের কাঠ গাদা করা তো সম্ভব নয়। তাই কাজ তার মোটেই এগুলো না। তার কপাল ভালো—সেই বন্ধু মেয়েটি তাকে ভুলে যায় নি। ঢাকীর জন্যে দুপরের খাবার নিয়ে সে এল আর খাওয়া সেরে তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ঢাকী। ঘুম ভাঙতে দেখে—সব চেলা-কাঠ গাদা হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে আর লক্‌লক্‌ করে আগুনের শিখা পৌঁচেছে আকাশে।

মেয়েটি বলল, "শোনো। বুড়ি ডাইনি এসে আবার তোমার ঘাড়ে কাজ চাপাবে। যা বলে তাই কোরো—যাতে সে তোমার কোনো খুঁত ধরতে না পারে। তুমি সামান্য ভয় পেলেই তোমায় ধরে সে চুল্লিতে ভরবে। তার কথামতো কাজ করলে তাকে আগুনে ফেলে নিকেশ করতে পারবে।"

মেয়েটি চলে যেতে বুড়ি এসে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠাণ্ডায় জমে গেলাম, জমে গেলাম। কিন্তু ঐ সুন্দর আগুনে আমার বুড়ো হাড়গুলো গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু দেখো, একটা কাঠ জ্বলছে না। ওটা বার করে আনো। কাঠটা এনে দিতে পারলে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি যেতে পারবে। তাই হাসিমুখে আগুনে ঝাঁপ দাও।"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ঢাকী ঝাঁপ দিল অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে।

কিন্তু তার একটি চুলও পুড়ল না। কাঠটা টেনে বার করে রাখল সে মাটিতে। আর মাটির ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সেটা হয়ে উঠল সেই পরমা সুন্দরী মেয়ে, বিপদে যে তাকে সাহায্য করেছিল। মেয়েটির পরনের সোনালী পোশাক দেখে ঢাকী চিনতে পারল সেই রাজকন্যেকে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে বুড়ি বলল, "ভাবছ রাজকন্যেকে পেয়ে গেছ। কিন্তু বলে দিলাম—এখনো পাও নি।"

মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে বুড়ি তার দিকে ছুটে যেতেই ঢাকী বুড়িকে ধরে অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলল আর আগুনের শিখাগুলো এমন ভাবে লক্‌লক্‌ করে উঠল, যেন শয়তান ডাইনিকে খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে।

রাজকন্যে তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঢাকীকে। দেখল, বাস্তবিকই সে সুন্দর আর সুপুরুষ। মনে পড়ল, তার জন্য ঢাকী নিজের জীবন বিপন্ন করে এসেছে। তাই তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজকন্যে বলল, "আমাকে উদ্ধার করার জন্যে নিজের জীবনকে তুমি তুচ্ছ করেছিলে। আমাকে খুব ভালোবাসবে বলে কথা দিলে তোমায় বিয়ে করব। আমাদের ধনদৌলতের অভাব হবে না। এখানে যথেষ্ট আছে।" এই-না বলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঢাকীকে সে দেখাল বড়ো-বড়ো সিন্দুক আর আলমারির মধ্যেকার রাশিরাশি সোনা-দানা আর হীরে-মুক্তো-পান্না আর জহরত—ডাইনি যেগুলো জমিয়েছিল। সব সোনা-রুপো সেখানে রেখে তারা সঙ্গে নিল শুধু জহরতগুলো।

কাঁচ-পাহাড়ে থাকতে তাদের আর ইচ্ছে করল না। ঢাকী তাই রাজকন্যেকে বলল, "আমার সঙ্গে ঘোড়ার জিনটায় বোসো। পাখির মতো উড়তে-উড়তে একসঙ্গে আমরা নীচে নামব।"

রাজকন্যে বলল, "পুরনো জিনটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। জাদুর আঙটিটা ঘোরালেই আমরা বাড়ি পৌঁছব।"

ঢাকী বলল, "বেশ কথা। আঙটিটা ঘুরিয়ে মনে-মনে ইচ্ছে কর যেন আমরা শহরের সিংহদ্বারের সামনে পৌঁছে যাই।"

মুহূর্তের মধ্যে সেখানে তারা পৌঁছতে ঢাকী বলল, "প্রথমে আমার বাবা-মার কাছে গিয়ে সব খবর তাদের জানাব। আমার জন্যে এই মাঠে অপেক্ষা কর। ফিরতে আমার দেরি হবে না।"

রাজকন্যে বলল, "খুব সাবধানে থেকো—এই আমার মিনতি।

তোমার বাবা-মার ডান গালে কিছুতেই চুমু খাবে না। খেলেই সব-কিছু ভুলে যাবে আর আমাকে একলা পড়ে থাকতে হবে এই মাঠে।"

"তোমাকে কী করে ভুলতে পারি?" বলে ঢাকী তার ডান হাত রাজকন্যের দিকে বাড়িয়ে কথা দিল—শিগ্‌গির ফিরবে।

নিজেদের বাড়িতে সে যখন গেল কেউই তাকে চিনতে পারল না—এতই বদলে গিয়েছিল তার চেহারা। কারণ কাঁচ-পাহাড়ে যে তিনটে দিন সে কাটিয়েছিল আসলে সেগুলো তিনটে বছর।

নিজের পরিচয় দিতে তার বাবা-মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল আর আবেগে অভিভূত হয়ে রাজকন্যের সাবধান-বাণী ভুলে তাদের দুজনেরই দু গালে সে চুমু খেল। নিজের পকেট উজাড় করে টেবিলে সে রাখল হীরে-মুক্তোগুলো। এত ধনদৌলত নিয়ে কী যে করবে তার বাবা-মা ভেবে পেল না। শেষটায় তার বাবা বানাল দারুণ সুন্দর একটা প্রাসাদ। চার দিকে তার বাগান, মাঠ আর বন প্রাসাদটা যেকোনো রাজপুত্রের থাকার উপযুক্ত। প্রাসাদটা তৈরি হবার পর ঢাকীকে তার মা বলল, "তোর জন্যে একটি কনে পছন্দ করেছি। সামনের সপ্তাহে এইদিন তোর বিয়ে।" তার ছেলে খুশি হয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল।

এদিকে সেই রাজকন্যে বেচারি শহরের সিংহদ্বারের সামনের মাঠে অনেকক্ষণ রইল অপেক্ষা করে। সন্ধেতেও ঢাকীকে ফিরতে না দেখে সে নিশ্চিত বুঝল বাবা-মার ডান গালে চুমু খেয়ে তার কথা একেবারে সে ভুলে গেছে। মনের দুঃখে তার বাবার রাজসভায় না ফিরে জাদুর আঙটি ঘুরিয়ে সে চলে এল বনের মধ্যে নির্জন এক বাড়িতে। প্রতি সন্ধেয় হেঁটে শহরে গিয়ে ঢাকীর বাড়ির সামনে দিয়ে সে যায়। বহুবার ঢাকীর চোখে সে পড়ল। ঢাকী কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। একদিন লোকদের বলাবলি করতে সে শুনল, "কাল ঢাকীর বিয়ে।" কথাটা শুনে মনে মনে রাজকন্যে বলল, 'ওকে আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করব।'

বিয়ের উৎসবের প্রথম দিন আঙটিটা ঘুরিয়ে সে বলল, "এমন একটা পোশাক চাই সূর্যের মতো যেটা ঝক্‌ঝক্ করে।" সঙ্গে-সঙ্গে পোশাকটা তার সামনে এসে গেল—দেখে মনে হয় সেটা যেন সূর্যরশ্মি দিয়ে বোনা।

অতিথিরা এসে পৌঁছলে পর রাজকন্যে গেল হলঘরে। তার পোশাক দেখে সবাই হল মুগ্ধ, বিশেষ করে কনে। ভালো ভালো পোশাকের তার ছিল ভীষণ সখ। অচেনা মেয়েটির কাছে গিয়ে কনে জানতে চাইল গাউনটা সে বিক্রি করবে কি না।

রাজকন্যে উত্তরে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু টাকাকড়ির বিনিময়ে নয়। বর যে ঘরে ঘুমোবে সেই ঘরের দরজার পাশে অর্ধেক রাত কাটাতে দিলে খুশি মনেই পোশাকটা দেব।"

কনে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু বরের সরবতের সঙ্গে সে মিশিয়ে দিল ঘুমের কড়া ওষুধ। ফলে সে পড়ল অঘোরে ঘুমিয়ে।

বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে পড়লে চাকীর শোবার ঘরের দরজার সামনে নতজানু হয়ে বসে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সে বলতে লাগল:

"চাকী, চাকী, শোনো আমার কথা—
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?
আমার সঙ্গে পাহাড়ে থাক নি?
ডাইনির হাত থেকে তোমায় বাঁচাই নি?
চিরকাল ভালোবাসার কথা দাও নি?
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?
চাকী, চাকী, শোনো আমার কথা—"

কিন্তু কোনোই ফল হল না। চাকীর ঘুম ভাঙল না। বিফল হয়ে সকালে মনের দুঃখে রাজকন্যে চলে গেল।

দ্বিতীয় সন্ধেয় আঙটি ঘুরিয়ে রাজকন্যে বলল, "এমন একটা পোশাক চাই চাঁদের মতো যেটা চক্‌চক্‌ করে।"

চাঁদের আলোর মতো কোমল আর হালকা পোশাক পরে রাজকন্যেকে আসতে দেখে কনের আবার হিংসে হল। পোশাকটার বিনিময়ে চাকীর ঘরের দোরগোড়ায় আর-এক রাত কাটাবার অনুমতি রাজকন্যেকে সে দিল।

নিস্তব্ধ রাতে আবার রাজকন্যে গান গাইতে শুরু করল:

"চাকী, চাকী, শোনো আমার কথা—
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

আমার সঙ্গে পাহাড়ে থাক নি ?
ডাইনির হাত থেকে তোমায় বাঁচাই নি ?
চিরকাল ভালোবাসার কথা দাও নি ?
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে ?
ঢাকী, ঢাকী, শোনো আমার কথা—"

কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় ঢাকী অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ঘুম ভাঙল না। সকালে মনের দুঃখে রাজকন্যে ফিরে গেল তার বনের কুটিরে।

কিন্তু বাড়ির কয়েকজন ভৃত্য রাজকন্যের করুণ সুরের গানটা শুনেছিল। ঢাকীকে সে কথা তারা জানাল। তারা বলল, ঘুমের ওষুধ মেশানো সরবত না খেলে ঢাকী নিজের কানেই গানটা শুনতে পেত।

তৃতীয় সন্ধ্যেয় আঙটি ঘুরিয়ে রাজকন্যে বলল, "এমন একটা পোশাক চাই তারার মতো যেটা ঝল্‌মল্‌ করে।"

নাচের আসরে রাজকন্যে পৌঁছতে তার নতুন পোশাক দেখে কনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। আগের দুটো পোশাকের চেয়ে এটা তার অনেক বেশি ভালো লেগেছিল। কনে বলে উঠল, "এটা আমাকে নিতেই হবে।" আগেকার কড়ারে সেটা তাকে দিতে রাজি হল রাজকন্যে।

এবার ঢাকী সরবতটা খেল না। বিছানার নীচে ঢেলে দিল। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে উঠলে সে শুনল চাপা করুণ সুরে গান গেয়ে কে যেন তাকে বলছে :

"ঢাকী, ঢাকী, শোনো-আমার কথা—
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে ?
আমার সঙ্গে পাহাড়ে থাক নি ?
ডাইনির হাত থেকে তোমায় বাঁচাই নি ?
চিরকাল ভালোবাসার কথা দাও নি ?
আমাকে একেবারে ভুলে গেলে ?
ঢাকী, ঢাকী, শোনো আমার কথা—"

আর সঙ্গে-সঙ্গে অতীতের সব কথা মনে পড়ে গেল ঢাকীর। চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, "ভারি নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞের মতো কাজ করেছি।

কিন্তু এরজন্যে সত্যিই আমি দায়ী নই। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাবা-মার ডাম গালে চুমু খাবার জন্যে সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম।" লাফিয়ে দাঁড়িয়ে রাজকন্যের হাত ধরে তার বাবা মার বিছানার পাশে তাকে নিয়ে গিয়ে ঢাকী বলল, "এই মেয়েটিই আমার আসল বউ। অন্য মেয়েটিকে বিয়ে করলে এর প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে।"

সব কথা শুনে রাজকন্যেকে ছেলের বউ করতে সঙ্গে-সঙ্গে তারা রাজি হয়ে গেল।

আবার গোড়া থেকে শুরু হল বিয়ের উৎসব। ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রথম কনে পেল সেই তিনটে সুন্দর পোশাক। আর সে জানাল, তাতেই সে খুব খুশি হয়েছে।

মেড ম্যালিন

এক সময় এক রাজার ছেলে আর এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মেয়েটিকে লোকে ডাকত "মেড ম্যালিন" বলে ("মেড" মানে কুমারী)। মেয়েটি ছিল পরমা সুন্দরী। মেড ম্যালিনের বাবার ইচ্ছে ছিল অন্য আর একজনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার। তাই রাজার ছেলেকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু তারা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসত। তাই মেড ম্যালিন তার বাবাকে বলল, "বাবা, অন্য কাউকে বিয়ে করব না।"

মেয়ের কথা শুনে ভীষণ রেগে তার বাবা আদেশ দিলেন অন্ধকার এমন একটা মিনার বানাবার যার মধ্যে সূর্যের কোনো রশ্মি যেতে পারবে না। সেটা তৈরি হবার পর মেয়েকে তিনি বললেন, "এর মধ্যে তোকে সাতটা বছর কাটাতে হবে। তার পর এসে দেখব তোর একগুঁয়ে স্বভাব বদলেছে কি না।"

সাত বছরের মতো খাবার-দাবার সেই মিনারে রেখে রাজকন্যে আর তার দাসীকে সেখানে বন্দী করে রাখা হল। পৃথিবীর আকাশের সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক হল ছিন্ন। অন্ধকারের মধ্যে সেখানে তারা রইল। টের পায় না—কখন দিন, কখন রাত। সেই মিনারের চার পাশে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে রাজপুত্র তাদের নাম ধরে ডাকত। কিন্তু পুরু দেয়াল ভেদ করে কোনো শব্দ মিনারের মধ্যে পৌঁছত না। কান্নাকাটি করতে-করতে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কীই-বা তারা করতে পারে? এইভাবে দিন কাটে। তার পর খাবার-দাবারের পরিমাণ

কমে যেতে দেখে তারা বুঝতে পারে সাতটা বছর শেষ হয়ে এসেছে। তারা ভেবেছিল তাদের মুক্তির সময় এসে গেছে। কিন্তু হাতুড়ির বাড়ির কোনো শব্দ তারা শুনতে পেল না। দেয়ালের একটা পাথরও খসল না। মনে হল রাজকন্যের বাবা তাদের কথা একেবারে ভুলে গেছে। তখন আর মাত্র দিন কয়েকের মতো খাবার বাকি। তারা বুঝল তিলে-তিলে তাদের মৃত্যু হবে। মেড ম্যালিন তখন বলল, "শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক দেয়ালটা আমরা ভাঙতে পারি কি না।" এই-না বলে রুটি কাটার ছুরি দিয়ে একটা পাথরের চুণবালি খসাবার চেষ্টা করতে লাগল রাজকন্যে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পর দাসী তার জায়গা নিল। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার পর একটা পাথর তারা খসাতে পারল। তার পর আর একটা। তার পর আর একটা। এইভাবে তিনদিন কাটার পর সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে এল আলোর প্রথম রশ্মি আর তার পর ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে তারা দেখতে পেল বাইরের জগৎ। আকাশ তখন নীল, টাটকা বাতাস লুটিয়ে পড়ল তাদের চোখে-মুখে। কিন্তু তারা দেখে বাইরের সব-কিছুরই একেবারে ছন্নছাড়া চেহারা। রাজকন্যে দেখল তার বাবার প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, যতদূর দেখা যায় গ্রাম আর শহরগুলো পুড়ে ছারখার, কোনো ক্ষেতে ফসল ফলে নি, কোথাও নেই মানুষজন। গর্তটা যথেষ্ট বড়ো-সড়ো হবার পর তার মধ্যে দিয়ে বাইরে প্রথম লাফিয়ে পড়ল দাসী, তার পর মেড ম্যালিন। কিন্তু যায় তারা কোথায়? শত্রু এসে সমস্ত রাজত্ব ছারখার করে দিয়েছে, রাজাকে তাড়িয়েছে, প্রজাদের মেরে ফেলেছে। অন্য দেশের খোঁজে তারা চলল। কোথাও তারা আশ্রয় পায় না, কেউ তাদের এক টুকরো রুটি খেতে দেয় না। তাদের খিদে মেটাতে হয় বুনো বিছুটি-পাতা খেয়ে। বহু দূর হেঁটে অন্য এক দেশে তারা পৌঁছল। কাজের খোঁজে দোরে-দোরে তারা ঘোরে। কিন্তু সবাই তাদের তাড়িয়ে দেয়। কেউই করুণা দেখায় না। শেষটায় বড়ো একটা শহরে পৌঁছে সোজা তারা গেল রাজসভায়। সেখানেও সবাই তাদের তাড়িয়ে দিতে লাগল। শেষটায় রাঁধুনি বলল রান্নাঘরে ছাই ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার জন্যে তাদের সে রাখতে পারে।

ঘটনাচক্রে যে-দেশে তারা পৌঁচেছিল সে-দেশেরই রাজার ছেলে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেড ম্যালিনকে। রাজা তার জন্য পছন্দ করেছিল

আর এক কনে। মেয়েটার চেহারা যেমন কুচ্ছিত, মনটাও তেমনি কুচুটে। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গিয়েছিল। কনেও পৌঁচেছিল। কিন্তু নিজের কুচ্ছিত চেহারার জন্য সে ঘরে দোর দিয়ে থাকত, কারুর সামনে বেরুত না। রান্নাঘর থেকে তার জন্য খাবার নিয়ে যেতে হত মেড ম্যালিনকে। রাজপুত্রের সঙ্গে কনের যেদিন গির্জেয় যাবার কথা, কনের ভয় হল পথে বেরুলে তার কুচ্ছিত রূপ দেখে লোকে হাসাহাসি করে টিটকিরি দেবে। তাই মেড ম্যালিনকে সে বলল, "তোর কপাল খুব ভালো। আমার পা মচকেছে। পথে ভালো করে হাঁটতে পারব না। আমার বিয়ের পোশাকটা পরে আমার হয়ে তুই যা। এরকম সৌভাগ্য আর কোনোদিন তোর আসবে না।"

কিন্তু মেড ম্যালিন আপত্তি জানিয়ে বলল, "যে-সম্মান আমার প্রাপ্য নয় সেটা চাই না।"

অনেক মোহর দেবার লোভ দেখাল কনে কিন্তু মেড ম্যালিন কিছুতেই টলল না। শেষটায় ভীষণ রেগে কনে বলল, "আমার কথা না শুনলে তোকে মরতে হবে। আমার মুখ থেকে কথা খসলেই মাথাটা তোর পায়ের কাছে লুটবে।"

তাই বাধ্য হয়ে মেড ম্যালিনকে পরতে হল কনের সুন্দর বিয়ের পোশাক আর জড়োয়া গয়না। রাজসভায় পৌঁছতে তার চোখ-ধাঁধানো রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হল। রাজা তার ছেলেকে বললেন, "তোর জন্যে এই কনেকে পছন্দ করেছি। একে নিয়ে গির্জেয় যা।"

অবাক হয়ে রাজপুত্র ভাবল, 'কী আশ্চর্য! একে দেখতে হুবহু আমার মেড ম্যালিনের মতো। কিন্তু সে তো মিনারে বন্দী—এত দিনে হয়তো মরেই গেছে। নইলে ভাবতাম এই কনেই মেড ম্যালিন।' তার হাত ধরে রাজপুত্র গির্জেয় নিয়ে চলল। যেতে-যেতে পথে পড়ল একটা বিছুটি-ঝোপ। সেটা দেখে মেড ম্যালিন বলে উঠল :

"একলা কেন দাঁড়িয়ে রে
বিছুটি ওরে বিছুটি
কাঁচাই তোকে খেয়েছিলাম
পাই নি যেদিন কিচ্ছুটি।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কী বলছ ?"

সে বলল, "কিচ্ছু না। আমি শুধু ভাবছিলাম মেড ম্যালিনের কথা।

মেড ম্যালিনকে সে চেনে জানতে পেরে রাজপুত্র অবাক হল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। গির্জের সামনেকার ছোট্টো পথে পৌঁছে মেড ম্যালিন বলে উঠল :

"গির্জে-পথ, বোলো না—
আসল কনে ঠকায় না।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কী বলছ?"

সে বলল, "কিচ্ছু না। আমি শুধু ভাবছিলাম মেড ম্যালিনের কথা।"

"মেড ম্যালিনকে চেনো?"

সে বলল, "না। কী করে চিনব? তার কথাই শুধু শুনেছি।"

গির্জের দরজায় পৌঁছে আবার সে বলে উঠল :

"গির্জে-দোর, বোলো না—
আসল কনে ঠকায় না।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কী বলছ?"

সে বলল, "কিচ্ছু না, আমি শুধু ভাবছিলাম মেড ম্যালিনের কথা।"

রাজপুত্র তার পর দামী একটা হার বার করে তার গলায় পরিয়ে দিল আর তার পর একসঙ্গে তারা গেল গির্জের মধ্যে। পুজাবেদীর সামনে হাতে হাত মিলিয়ে যাজক তাদের বিয়ে দিয়ে দিল। রাজপুত্র তাকে নিয়ে ফিরে চলল রাজপুরীতে। কিন্তু সারা পথ একটি কথাও সে কইল না। রাজপুরীতে পৌঁছবার পর চট্‌পট্‌ কনের ঘরে গিয়ে সুন্দর পোশাকটা ছেড়ে, গয়নাগুলো খুলে সে পরল তার ছাই-রঙা পোশাকটা। তাকে যে-হার দিয়েছিল শুধু সেটাই রাখল নিজের কাছে।

রাত হতে কনেকে নিয়ে যাওয়া হল রাজপুত্রের শোবার ঘরে। রাজপুত্র যাতে তার মুখ দেখতে না পায় তাই ওড়না দিয়ে কনে তার মুখ ঢেকেছিল। সবাই চলে যাবার পর রাজপুত্র তাকে প্রশ্ন করল, "পথের পাশের বিছুটি-ঝোপকে কী বলছিলে?"

কনে প্রশ্ন করল, "কোন বিছুটি-ঝোপ? কোনো বিছুটি-ঝোপকে কোনো কথা আমি বলি নি।"

রাজপুত্র বলল, "না বলে থাকলে তুমি আসল কনে নও।"

তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য কনে বলল, "দাসীকে জিগেস করে আসি। কথাগুলো নিশ্চয়ই তার মনে আছে।"

এই-না বলে মেড ম্যালিনের কাছে হাজির হয়ে কনে বলল, "এই ছুঁড়ি! বিছুটি-ঝোপকে কী বলেছিলি?"

মেড ম্যালিন উত্তর দিল, "আমি শুধু বলেছিলাম:

"একলা কেন দাঁড়িয়ে রে
বিছুটি ওরে বিছুটি?
কাঁচাই তোকে খেয়েছিলাম
পাই নি যেদিন কিচ্ছুটি।"

শোবার ঘরে ছুটে এসে কনে বলল, "এখন মনে পড়েছে বিছুটি-ঝোপকে কী বলেছিলাম।" তার পর সবে শোনা ছড়াটা রাজপুত্রকে সে বলল।

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "কিন্তু গির্জের পথটাকে কী বলেছিলে—সেটার ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম?"

কনে বলল, "গির্জের পথকে? কোনো গির্জের পথকে কোনো কথা বলি নি।"

"তুমি তা হলে আসল কনে নও।"

কনে আবার বলল, "দাসীকে জিগেস করে আসি। কথাগুলো নিশ্চয়ই তার মনে আছে।"

এই-না বলে মেড ম্যালিনের কাছে হাজির হয়ে কনে বলল, "এই ছুঁড়ি! গির্জের পথকে কী বলেছিলি?"

"আমি শুধু বলেছিলাম:

"গির্জে-পথ, বোলো না—
আসল কনে ঠকায় না।"

চেঁচিয়ে কনে বলল, "এর জন্যে তোকে মরতে হবে।" কিন্তু শোবার ঘরে ছুটে এসে শোনা ছড়াটা রাজপুত্রকে সে বলল।

"কিন্তু গির্জের দরজাকে কী বলেছিলে?"

কনে বলল, "গির্জের দরজাকে? গির্জের দরজাকে কোনো কথা বলি নি।"

"তুমি তা হলে আসল কনে নও।"

কনে আবার মেড ম্যালিনের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "এই ছুঁড়ি! গির্জের দরজাকে কী বলেছিলি?"

"আমি শুধু বলেছিলাম :

"গির্জে-দোর, বোলো না—
আসল কনে ঠকায় না।"

চেঁচিয়ে কনে বলল, "এর জন্যে তোর ঘাড় মটকাব।" তার পর ভীষণ রেগে শোবার ঘরে ছুটে এসে বলল, "গির্জের দরজাকে কী বলেছিলাম এখন মনে পড়েছে।" তার পর সবে শোনা ছড়াটা রাজপুত্রকে সে বলল।

"কিন্তু দোর-গোড়ায় তোমাকে যে হারটা দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?"

কনে বলল, "কী রকম হার? তুমি তো আমায় কোনো গয়না দাও নি।"

"নিজে হাতে হারটা তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। কথাটা মনে না থাকলে তুমি আসল কনে নও।"

এই-না বলে রাজপুত্র তার মুখ থেকে ওড়নাটা ছিঁড়ে ফেলল আর তার হতকুচ্ছিত মুখ দেখে চমকে লাফিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, "এখানে এলে কী করে? কে তুমি?"

"আমিই আসল কনে। কিন্তু পথে বেরুলে আমায় দেখে লোকে হাসাহাসি করে টিটকিরি দিতে পারে ভেবে বাসন-মাজা ঝিকে বলেছিলাম আমার পোশাক পরে আমার বদলে গির্জেয় যেতে।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করল, "সে মেয়েটি কোথায়? তাকে আমি দেখতে চাই। তাকে নিয়ে এসো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে ভৃত্যদের কনে বলল—বাসন-মাজা ঝি জোচ্চর, আঙিনায় বার করে তার মুণ্ডু কেটে ফেলতে। কিন্তু চাকররা তাকে ধরতে মেড ম্যালিন সাহায্যের জন্য এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে তার স্বর পৌঁছল রাজপুত্রের কানে। নিজের ঘর থেকে সেখানে ছুটে গিয়ে রাজপুত্র আদেশ দিল মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে। লোকজন সেখানে বাতি নিয়ে এলে রাজপুত্র দেখল যে হার গির্জের দোর-গোড়ায় সে পরিয়ে ছিল মেয়েটির গলায় সেটা চক্‌চক্‌ করছে।

তাই দেখে রাজপুত্র বলল, "তুমিই আসল কনে। আমার সঙ্গে গির্জেয় তুমিই গিয়েছিলে।" লোকজন চলে যেতে তাকে রাজপুত্র বলল, "গির্জেয় যাবার সময় মেড ম্যালিনের নাম তুমি করেছিলে। সে-ই

আমার বাগ্‌দত্ত কনে। যদি জানতাম এটা সম্ভব, তা হলে বিশ্বাস করতাম মেড ম্যালিনই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখতে হুবহু তার মতো।"

সে উত্তর দিল, "আমিই মেড ম্যালিন। তোমার জন্যেই অন্ধকারে সাত-সাতটা বছর বন্দী হয়ে কাটিয়েছি, ক্ষিদে তেষ্টায় কষ্ট পেয়েছি। তোমার জন্যেই এতদিন অভাব-অনটনের মধ্যে রয়েছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সূর্যের আলো আবার আমার ওপর পড়েছে। গির্জেয় তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তাই আমিই তোমার আইন-সঙ্গত বউ।" তার পর তারা পরস্পরকে চুমু খেয়ে আজীবন কাটাল সুখে-শান্তিতে। আর শয়তানীর জন্য কনের মুণ্ডু কেটে ফেলা হল।

যে-মিনারে মেড ম্যালিন বন্দী জীবন কাটিয়েছিল বহুকাল খাড়া ছিল সেটা। তার পাশ দিয়ে ছেলেমেয়েরা যাবার সময় গান গাইত :

"খুটুং খটাং শব্দ হয়
মিনারেতে কে বসে রয় ?
ভেতরেতে রাজকন্যে
উঁকি মারছি তার জন্যে
পাঁচিলগুলো ভাঙবে না
কোনো পাথর ফাটবে না।
রঙ-বেরঙের পোশাক পরে
চল রে সবাই জলদি করে।"

সৈনিক আর শিকারী

এক সৈনিক ছিল বেজায় বেপরোয়া গোছের। ভয়-ডরের তার বালাই ছিল না। চাকরি ঘোচার পর সে দেখে, এমন কোনো পেশা জানা নেই যাতে দু পয়সা কামাতে পারে। তাই দোরে-দোরে সে ভিক্ষে করে ঘুরতে লাগল। তার কাঁধে ছিল পুরনো একটা বর্ষাতি আর পায়ে একজোড়া মোষ-চামড়ার বুট।

একদিন খানা-খন্দ ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে যেতে-যেতে সে পৌছল এক গহন বনে। তার ধারণাই ছিল না, কোথায় পৌচেছে। এমন সময় দেখে শিকারীদের সবুজ কোট পরে একটা লোক একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে। তার সঙ্গে হাত ঝাঁকিয়ে সৈনিক তার পাশে ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, "দেখছি তোমার পায়ে পালিশ-করা চমৎকার একজোড়া বুট রয়েছে। কিন্তু আমার মতো সব সময় তোমায় ঘোরাঘুরি করতে হলে ঐ বুটজোড়া বেশিদিন টিঁকবে না। আমারটা দেখো। মোষ-চামড়ায় তৈরি। অনেকদিন টিঁকেছে। আরো অনেক বছর টিঁকবে।" খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সৈনিক বলল, "আর এখানে থাকতে পারলাম না। ক্ষিদের জ্বালায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। ভায়া, বলে দাও তো কোনটা আসল পথ।"

শিকারী বলল, "নিজেই সে কথা জানি না। এই বনে আমিও পথ হারিয়ে ঘুরছি।"

সৈনিক বলল, "আমাদের দেখছি একই হাল। চলো, একসঙ্গে পথ খোঁজা যাক।"

শিকারীর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল। তার পর রাত না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে তারা হেঁটে চলল।

সৈনিক বলল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আজ রাতে বন পেরুতে পারব না। কিন্তু ওখানে দেখছি একটা বাতি জ্বলছে। তার মানে, ওখানে গেলে হয়তো রাতের খাবার জুটবে।"

আলোর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে তারা পৌছল পাথরের একটা বাড়িতে। তারা ধাক্কা দিতে এক বুড়ি দরজাটা খুলল।

সৈনিক বলল, "রাতের একটা আস্তানা আর খালি পেটগুলোর জন্যে কিছু খাবার-দাবার আমরা খুঁজছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি বলে উঠল, "এখানে থাকা চলবে না। এটা ডাকাতদের আস্তানা। ভালো চাও তো চট্‌পট্‌ সরে পড়। এখানে তারা তোমাদের দেখলে সঙ্গে-সঙ্গে খতম করে ফেলবে।"

সৈনিক বলল, "দুদিন ধরে দাঁতে কুটোটি কাটি নি। এখানেই কোতল হই কি বনে উপোস করে মরি—আমার কাছে দুইই সমান। আমি ভেতরে ঢুকলাম।"

ভিতরে যাবার ইচ্ছে শিকারীর ছিল না। কিন্তু সৈনিক তার জামার আস্তিনে টান দিয়ে বলল, "চলে এসো ভায়া। ডাকাতরা এক্ষুনি ধরছে না।"

তারা উপোস করে আছে শুনে বুড়ির করুণা হল। তাই সে বলল, "উনুনটার পেছনে লুকোও গে। ডাকাতরা খাবার-দাবার কিছু বাকি—রাখলে তোমাদের দেব।"

উনুনের পিছনে তারা লুকোতে-না-লুকোতেই হৈচৈ করে বারোটা ডাকাত বাড়ির মধ্যে এসে খাবার টেবিলের সামনে বসে পড়ল। টেবিলটা সাজানোই ছিল। তার পর তারা হম্বিতম্বি করে বলল খাবার দিতে। এক টুকরো প্রকাণ্ড ঝলসানো মাংস আনতে মহা ফুর্তিতে তারা খেতে শুরু করে দিল। মাংসর গন্ধটা নাকে যেতে শিকারীকে সৈনিক বলল, "আর সইতে পারছি না। ওদের সঙ্গে বসে আমাকে খেতেই হবে।"

তার হাত চেপে ধরে শিকারী বলল, "খবরদার! ওখানে তুমি গেলে আমাদের দুজনেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।"

সৈনিক কিন্তু সশব্দে হাঁচতে-কাশতে শুরু করে ছিল। আর তাই

না শুনে হাতের ছুরি-কাঁটা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে তাদের দুজনকে ডাকাতরা উনুনের পিছন থেকে টেনে বার করল।

তার পর হো হো করে হেসে উঠে তারা বলল, "মশাইরা! কোণে বসে কী করছেন? জানতে এসেছেন কেমন করে আমরা দিন কাটাই? খানিক সবুর করুন। এক্ষুনি শিখিয়ে দিচ্ছি গাছের পচা ডালেও গলায় ফাঁস দিয়ে কী করে ঝোলা যায়।"

সৈনিক বলে উঠল, "অসভ্যর মতো কথা বোলো না। আগে আমায় কিছু খেতে দাও। তার পর আমায় নিয়ে যা খুশি কোরো।"

তার শান্ত হাবভাব দেখে ডাকাতরা অবাক হল। তাদের সর্দার বলল, "দেখছি ভয়-ডর কাকে বলে তুমি জানো না। এসো, ভরপেট খেয়ে নাও। তার পর কিন্তু তোমায় মরতে হবে।"

সৈনিক বলল, "সেটা দেখা যাবে।" তার পর ডাকাতদের সঙ্গে টেবিলে গিয়ে পরম তৃপ্তি করে খেতে-খেতে শিকারীকে সে বলল, "ভায়া, খেতে এসো। আমার মতোই নিশ্চয় তোমারও ক্ষিদে পেয়েছে। এরকম ভালো মাংস বাড়িতে পাবে না।" শিকারী কিন্তু কিছুতেই খেতে রাজি হল না। সৈনিকের দুঃসাহস আর ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ডাকাতরা বলাবলি করতে লাগল, "লোকটা বেজায় বেহায়া তো!"

খাওয়া শেষ করে সৈনিক বলল, "এবার কিছু পান করতে দাও।"

ডাকাত-সর্দারের বেশ মজাই লাগছিল। তাই বুড়িকে বলল, "মাটির তলার ঘরে গিয়ে আঙুর-রসের সব চেয়ে ভালো এক বোতল মদ নিয়ে এসো।"

বুড়ি সেটা আনলে পর ছিপি খুলে বোতল নিয়ে শিকারীর কাছে গিয়ে সৈনিক বলল, "ভায়া, আমি একটা অবাক কাণ্ড করতে চলেছি, ভালো করে লক্ষ্য কর। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকাতদের স্বাস্থ্য কামনা করে আঙুর-রসের মদ আমি পান করব।" এই-না বলে ডাকাতদের মাথার উপর বোতলটা ঘুরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "সবাই তোমরা দীর্ঘজীবী হও। দয়া করে হাঁ করে ডান হাতটা শূন্যে তোলো।" তার পর বোতল থেকে এক ঢোক মদ সে খেল। আর কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরুতে-না-বেরুতে হাঁ করে হাত তুলে ডাকাতরা স্থির হয়ে এমন ভাবে বসে রইল, যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

সৈনিককে শিকারী বলল, "তুমি যে আরো অনেক ভেল্‌কি জানো তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চলো, এই সুযোগে আমরা পালাই।"

সৈনিক বলল, "ভায়া, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। দেখো, কী রকম অবাক হয়ে হাঁ করে ওরা তাকিয়ে রয়েছে। আমি না বললে ওরা নড়তে-চড়তে পারবে না। তাই আমার সঙ্গে নির্ভয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে এসো।"

বুড়ি আর-একটা বোতল নিয়ে এল। টেবিল ছেড়ে না উঠে সৈনিক এমন পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করল যাতে তিনদিন আর না খেলেও চলে। শেষটায় ভোর হয়ে আসতে সে বলল, "এবার যাবার সময় হয়েছে। ঠান্‌দি, শহরে যাবার সব চেয়ে ছোটো পথটা আমাদের বাত্‌লে দাও।"

শহরে পৌঁছে পুরনো বন্ধুদের কাছে গিয়ে সৈনিক বলল, "বনের মধ্যে ডাকাতদের একটা আস্তানার খোঁজ পেয়েছি। সবাই মিলে চলো, সেটা খতম করে দিয়ে আসি।" সৈন্যদলের সামনে সৈনিক চলল নিজে। শিকারীকে বলল সেও যেন তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে—কী ভাবে ডাকাতদের ধরা হয়। ডাকাতদের চার পাশে দলের লোকেদের দাঁড় করিয়ে বোতলটা থেকে আর-এক ঢোক মদ খেয়ে সেটা ডাকাতদের মাথার উপর ঘুরিয়ে সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, "এবার চাঙ্গা হয়ে ওঠো।" কথাগুলো বলার সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাতদের মোহগ্রস্ত অবস্থা কেটে গেল আর তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল তাদের হাত পা। তার পর এক-একটা বস্তার মতো গোরুর গাড়ির মধ্যে তাদের ভরে নিয়ে যাওয়া হল কয়েদখানায়। শিকারী তখন সৈন্যদলের একজনকে এক পাশে ডেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কয়েকটা নির্দেশ দিল।

সৈনিক তার পর শিকারীকে বলল, "ভায়া, ডাকাতগুলোকে ভালোয়-ভালোয় পাচার করা গেছে। চলো, ধীরে-সুস্থে এখন তাদের পেছন-পেছন যাওয়া যাক।"

শহরের সিংহদ্বারে পৌঁছতে তারা দেখে বহু লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনি করে গাছের সবুজ ডাল নাড়াচ্ছে। তার পর দেখা গেল রাজার দেহরক্ষীদের গোটা দলকে।

শিকারীকে সৈনিক প্রশ্ন করল, "ব্যাপারটা কী?"

শিকারী উত্তর দিল, "জানো না ? রাজা বহুদিন ধরে দেশ-বিদেশে বেড়াচ্ছিলেন, আজ তিনি ফিরছেন। তাই সবাই এসেছে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।"

সৈনিক বলল, "কিন্তু রাজা কোথায় ? তাঁকে তো দেখছি না।"

শিকারী বলল, "এই যে—এখানে। আমিই রাজা। আমার আসার খবর আগেই ঘোষণা করেছি।" এই-না বলে শিকারীর কোটের বোতাম খুলে তিনি দেখালেন তাঁর রাজ-পোশাক।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নতজানু হয়ে বসে সৈনিক বলল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মতো ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা করবেন।"

রাজা তাকে মাটি থেকে তুলে তার সঙ্গে হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, "তুমি খুব সাহসী। আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তোমার আর কখনো কোনো অভাব থাকবে না। সে ব্যবস্থা নিজে করব। ডাকাতদের টেবিলে যেরকম সুস্বাদু মাংস খেয়েছিলে সেরকম মাংস যখনই খাবার ইচ্ছে হবে—আমার রাজ-রান্নাঘরে গেলেই পাবে। কিন্তু বাপ, লোকের স্বাস্থ্য কামনা করে আঙুর-রসের মদ পান করার আগে তোমায় কিন্তু আমার অনুমতি নিতে হবে।"

শুঁটকি লিয়েজ

আলসে হেইনজ্‌ আর মুটকি ট্রাইন কখনো কোনো কাজ করত না। কিন্তু শুঁটকি লিয়েজ ছিল একেবারে অন্য ধাতে গড়া। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দুর্ভাবনার শেষ তার ছিল না। তার বর লম্বু লেন্‌জ্‌-এর ঘাড়ে এত কাজকর্মের বোঝা সে চাপাত যে, বেচারা বর কাজের ভারের চাপে গাধার মতো নুয়ে পড়ত। কিন্তু সেই-সব কাজ-ফাজ একেবারে বাজে। কারণ কিছুই তাদের ছিল না; দিনে দু পয়সাও তাদের রোজগার হত না।

এক রাতে ভাবতে-ভাবতে শুঁটকি লিয়েজের সর্বাঙ্গ কন্‌কনিয়ে উঠল। কিন্তু ভাবনা সে থামাল না। হঠাৎ বরকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে সে বলে উঠল, "শুনছ গো লেন্‌জ—কী ভাবছি? ধর আমি একটা মোহর পেয়ে গেলাম, ধর একজন আর-একটা মোহর আমায় দিল, ধর আর-একটা মোহর আমি ধার করলাম, আর ধর আরো একটা মোহর আমায় তুমি দিলে। তা হলে হল কী?—আমার কাছে তো তখন নগদ চার-চারটে মোহর! আর জানো, সেই চারটে মোহর দিয়ে কী করব? সেগুলো দিয়ে কিনব একটা বক্‌না বাছুর।

লম্ব লেন্‌জ বউয়ের কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বলল, "যে-মোহরটা আমায় দিতে বললে সেটা কোথা থেকে যে জোগাড় করব জানি না। তবে মোহর-টোহর জোগাড় করে একটা বক্‌না বাছুর যদি কিনতে পার তা হলে তো কথাই নেই। বক্‌না বাছুরটা বড়োসড়ো হবার পর তার একটা বাচ্চা হবে। আর বাচ্চা হবার পরেই দুধ দিতে শুরু

করবে। আর দুধ দিতে শুরু করলেই সেই দুধ খেয়ে যখন ইচ্ছে আমি গলা ভিজিয়ে নিতে পারব।

শুঁটকি লিয়েজ তার বর লম্বু লেন্‌জকে আবার কনুয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "না গো না—দুধটা তুমি খেতে পাবে না। গোরুটার যে বাছুর হবে সব দুধ সেই বাছুরটাই খাবে। সব দুধ খেতে খেতে বাছুরটা মোটাসোটা বড়োসড়ো হয়ে উঠবে। চড়া দরে হাটে বেচতে পারব।

লম্বু লেন্‌জ বলল অবশ্যই—তাতে আর কথা কী?—কিন্তু, ইয়ে একটু যদি দুধ-টুধ খাই তাতে তো কোনো ক্ষেতি নেই।

তার কথা শুনে চটে উঠে শুঁটকি লিয়েজ বলল, "গোরুদের ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে কে বলেছে শুনি? ক্ষেতি নেই, ক্ষেতি নেই বলে বক্‌বক্ কোরো না। ক্ষেতি থাকুক চাই না থাকুক—এক ফোঁটা দুধ তুমি পাবে না। তোমার খাঁইয়ের শেষ নেই দেখছি! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটা রোজগার করব, দেখছি খেয়েই সেটা তুমি উড়িয়ে দেবে!"

তার বর দারুণ চটে উঠে বলল, "বউ, বেশি বেশি বক্‌বক্ কোরো না। বক্‌বক্ করলে এমন এক চড় কষাব যে মুখে আর রা সরবে না।"

"কী বললে? চড় কষাবে?—আহাম্মক পেটুক, পাজি, বদমাশ কোথাকার!"

এই-না বলে শুঁটকি লিয়েজ তার বরের চুলের মুঠি ধরতে গেল। কিন্তু লম্বু লেন্‌জ লাফিয়ে উঠে বউয়ের মুখ গুঁজড়ে ধরল মাথার বালিশের উপর। আর সেই অবস্থায় বরকে গাল পাড়তে-পাড়তে এক সময় শুঁটকি লিয়েজ পড়ল ঘুমিয়ে।

পরদিন ভোরে উঠে বরের সঙ্গে আবার সে ঝগড়া জুড়ে ছিল কি না, নাকি সেই মোহরটার খোঁজে বেরিয়েছিল—সে খবর অবশ্য আমার জানা নেই।

ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন

এক সময় ছিল খুব খিট্‌খিটে মেজাজের এক দর্জি। তার বউ কিন্তু ছিল ধার্মিক, পরিশ্রমী আর খুব ভালো। বউয়ের কোনো কাজই দর্জির পছন্দ হত না। তাকে সে গালিগালাজ করত, মারধোরও করত।

তার দুর্ব্যবহারের কথা কানে আসতে হাকিম তাকে হাজতে পুরলেন। কয়েক সপ্তাহ তাকে শুধু জল আর রুটি ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হল না। বউকে আর মারধোর করবে না এবং 'ভালো মন্দ যাই ঘটুক না কেন' তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে বলে কথা দেবার পর সে পেল মুক্তি।

কিছুদিন ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু তার পর দর্জি আবার ধরল তার নিজ মূর্তি। সব সময় সে গজ্‌গজ্‌ করে, কথায় কথায় ঝগড়া বাধায় আর বউকে মারতে পারে না বলে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়। বউ একদিন বাগানে পালাল। গজকাঠি আর কাঁচি নিয়ে দর্জি করল তাকে তাড়া। হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে বউকে সে মারে। জিনিসগুলো বউয়ের গায়ে লাগলে সে হো-হো করে হেসে ওঠে, ফস্‌কালে হুংকার ছাড়ে। বহুক্ষণ এইভাবে কাটার পর প্রতিবেশীরা এসে তার বউকে উদ্ধার করল। আবার হাকিমের কাছে তাকে হাজির করা হলে হাকিম তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—সে কথা দিয়েছিল মিলেমিশে শান্তিতে থাকবে বলে।

হাকিমকে দর্জি বলল, "ধর্মাবতার। আমি আমার কথার খেলাপ

করি নি। বউকে মারধোর করি না—ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন তার সঙ্গে সব-কিছু আমি নিয়েছি ভাগাভাগি করে।"

হাকিম প্রশ্ন করলেন "তা কী করে সম্ভব? বউকে তো তুমি তাড়া করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিলে।'

দর্জি বলল, "ধর্মাবতার, তাকে আমি মারধোর করি না। আমি শুধু গিয়েছিলাম হাত দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দিতে। আমার হাত ছাড়িয়ে তখন সে ছুটে পালায়। আমি পিছু নিয়ে তাকে তার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতে থাকি। আমার কথায় জোর দেবার জন্যে হাতের কাছে যা পাই তাই তার দিকে ছুঁড়ি। জিনিসগুলো তার গায়ে লাগা মানেই তো আমার ভালো, তার মন্দ। ফসকালে মানেই তো তার ভালো, আমার মন্দ। তাই আমাদের শোধবোধ হয়ে গেছে।"

হাকিম কিন্তু তার কথা শুনে মোটেই খুশি হলেন না। তাকে জরিমানা করলেন।

সোল্‌মাছ

নিজের এলাকায় কোনো শৃঙ্খলা ছিল না বলে এক সময় মাছেরা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ কাউকে তখন পথ ছেড়ে দিত না, যার যেদিকে খুশি সাঁতরাত, দুজনে আলাপ করলে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যেত, এ ওকে দিত ঠেলেঠুলে সরিয়ে। জোয়ান মাছরা দুর্বলদের লেজের ঝাপ্‌টা মারত, না সরলে তাদের ফেলত খেয়ে। মাছরা তখন ভাবে, 'আমাদের শাসন করার এক রাজা থাকলে খুব ভালো হয়।' তাই শেষটা রাজা নির্বাচন করার জন্য এক সভায় তারা জমায়েত হয়ে স্থির করল সব চেয়ে জোরে যে সাঁতরাতে পারবে সে-ই হবে রাজা— কারণ সে-ই পারবে দুর্বল মাছদের কাছে গিয়ে সাহায্য করতে।

মাছরা তাই তীরের কাছে সার বেঁধে দাঁড়াল আর বানমাছ লেজ ঝাপ্‌টে স্টার্ট দিলে সবাই শুরু করল সাঁতরাতে। তীরের মতো ছুটল বানমাছ, তার পিছনে হেরিং, গাজ্‌ল্‌, পোনা, পার্চ আর সব মাছের দল। এমন-কি, রাজা হবার জন্য তাদের সঙ্গে ছুটল সোল্‌মাছও।

হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল, "হেরিং ফার্স্ট হয়েছে! হেরিং ফার্স্ট হয়েছে!"

চ্যাপ্টা চেহারার হিংসুটে সোল্‌মাছ প্রশ্ন করল, "কে ফার্স্ট হয়েছে?"

উত্তর এল, "হেরিং! হেরিং!"

"কে? ন্যাংটা হেরিং! বাঃ—ন্যাংটা হেরিং!" ঘৃণায় মুখ কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল সোল্‌মাছ। আর সেদিন থেকে অসভ্য স্বভাবের শাস্তি হিসেবে তার মুখটা গেল এক পাশে বেঁকে।

মাঝামাঝিই ভালো

এক রাখালকে এক বুড়ো একবার প্রশ্ন করেছিল, "কোথায় তোমার গোরুর পালকে চরাতে নিয়ে যেতে তুমি সব চেয়ে পছন্দ কর ?"

"এইখানে, মশাই—এখানকার ঘাস খুব ঘন নয়, খুব পাতলাও নয়। বেশি ঘন বা বেশি পাতলা ঘাস ভালো নয়।"

"কেন ?" বুড়ো প্রশ্ন করলেন।

রাখাল বলল, "মাঠের মধ্যে একটা চাপা-কান্না শুনতে পাচ্ছেন ? ওটা জল-মুরগির কান্না। এককালে সে রাখাল ছিল। সারসও এককালে ছিল রাখাল। তাদের গল্পটা বলি, শুনুন :

"জল-মুরগি তার গোরুর পাল চরাতে নিয়ে যেত ঘন সবুজ ঘাসের মাঠে। সেখানে ফুটে থাকত প্রচুর ফুল। ফলে তার গোরুগুলো হয়ে উঠল অবাধ্য আর বুনো। এদিকে সারস তার গোরুর পাল নিয়ে যেত পাহাড়ের রুক্ষ পাশে। ফলে তার গোরুগুলো হয়ে উঠল রোগা আর দুর্বল। সন্ধেয় রাখালদের যখন গোরু নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা জল-মুরগি তার গোরুদের বাগ মানাতে পারল না। তারা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে যে যে-দিকে পারল চলে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ছিট্‌ছিটে গাই, এদিকে আয় !' কিন্তু বৃথাই তার চীৎকার। এদিকে সারস তার গোরুদের খাড়া করতেই পারল না, এমনই সেগুলো দুর্বল আর নির্জীব হয়ে পড়েছিল। সে চেঁচাতে লাগল, 'ওঠ, ওঠ, ওঠ !' কিন্তু সেগুলো বালি থেকে উঠল না। তা হলেই দেখছেন—খুব ঘন বা খুব পাতলা ঘাসের জায়গায় গোরু চরাতে নিয়ে যাওয়া ভালো নয়। এখন ওরা আর গোরু চরায় না। জল-মুরগি এখনো চেঁচায়, এই ছিট্‌ছিটে, এদিকে আয় !' আর সারস চেঁচায়, 'ওঠ, ওঠ, ওঠ !' "

প্যাঁচা

প্রায় দুশো বছর আগে লোকে তখন এখানকার মতো এত সেয়ানা ছিল না। তখন ছোট্টো এক শহরে অদ্ভুত একটা প্যাঁচা কাছের বন থেকে এসে একজনের গোলা বাড়িতে রাত কাটাতে যায়। ভোর হতে অন্য পাখিদের ভয়ে দিনের আলোয় বেরুতে তার সাহস হয় না। গোলাবাড়ি থেকে খড় আনতে গিয়ে প্যাঁচাটাকে এক কোণে বসে থাকতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে সইস্ তার মনিবের কাছে ছুটে যায় প্যাঁচাটার কথা বলতে। বলে—সেরকম দানব জীবনে দেখে নি, গোলাবাড়ির মধ্যে ভাঁটার মতো তার চোখদুটো বন্‌বন্ করে ঘুরছে, কাছে গেলে সম্ভবত খেয়ে ফেলবে।

তার মনিব বলল, "তোর কথা ভালো করেই জানা আছে। মাঠে-ঘাটে কোকিলের পেছনে তাড়া করে যেতে পারিস, কিন্তু উঠোনে একটা মুরগি মরে পড়ে থাকলে লাঠি না নিয়ে সেটার কাছে যাবার সাহস তোর হয় না। চল, তোর সঙ্গে গিয়ে দানবটাকে দেখে আসি।"

বুক ফুলিয়ে গোলাবাড়িতে গিয়ে মনিব ভিতরে তাকাল। কিন্তু প্যাঁচাটার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে চাকরের মতো সেও পড়ল ঘাবড়ে। দৌড়তে-দৌড়তে পাড়া-পড়শির কাছে গিয়ে অজানা ভয়ঙ্কর জীবটাকে মারতে সাহায্য করার জন্য সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। বলল, জন্তুটা গোলাবাড়ি থেকে বেরুলে শহরের কারুরই নিস্তার নেই। তার কথা শুনে শহরের পথে-ঘাটে দারুন উত্তেজনা আর হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। কোদাল কুড়ুল, আঁকশি—হাতের কাছে যে যা পেল তাই নিয়ে

এল বেরিয়ে। সবশেষে বেরুল পৌর কর্মচারীরা আর মেয়র। যেখানে হাট বসে সেখান থেকে দল বেঁধে তারা পৌঁছল গোলাবাড়িতে। দলের মধ্যে সব চেয়ে যে সাহসী উঁকি মেরে দেখে তারস্বরে চীৎকার করে সে পিছিয়ে গেল। মুখ তখন তার মড়ার মতো ফ্যাকাশে। আরো দুজন সাহস করে এগোল। কিন্তু তাদেরও হল একই হাল।

তার পর এগিয়ে এল এক গাঁট্টাগোট্টা লম্বা-চওড়া জোয়ান। যুদ্ধে নানা দুঃসাহসী কাজ করার জন্য তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে বলল, "কেবল তাকিয়ে-তাকিয়ে জন্তুটাকে তোমরা তাড়াতে পারবে না। এখন দরকার কিছু একটা করা। দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সবাই মেয়েদের মতো ভীতু হয়ে গেছ।"

সে হুকুম করল তার জন্য বুকে পরবার বর্ম আর একটা তরোয়াল নিয়ে আসতে। সবাই তার সাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, যদিও অনেকেই ধরে নিয়ে ছিল লোকটা নির্ঘাৎ মরবে। গোলাবাড়ির দুটো দরজা খোলা হতে দেখা গেল প্যাঁচাটা কোণ থেকে বেরিয়ে একটা কড়িকাঠে গিয়ে বসেছে। দুঃসাহসী লোকটা তখন বলল একটা মই আনতে। মইটা খাটিয়ে সে যখন চড়তে যাবে প্রত্যেকে চেঁচিয়ে তাকে বলল মাথা ঠাণ্ডা রাখতে, মনে রাখতে বলল সেণ্ট জর্জ যেভাবে ড্রাগনটাকে মেরেছিলেন সেই কাহিনীটা। লোকটা যখন মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁচেছে লোকজনের ভীড় আর তাদের হৈ-হল্লা দেখেশুনে আর বীরপুরুষের মতলবটা বুঝতে পেরে প্যাঁচা তার চোখদুটো পাকিয়ে, ডানা ঝেড়ে ঠোঁট দিয়ে ছোবল মারার উপক্রম করে কান-ফাটান, হুংকার ছাড়ল।

ভীড়ের লোকরা চীৎকার করে উঠল, "তরোয়াল চালাও, তরোয়াল চালাও!"

বীরপুরুষ উত্তরে বলল, "আমি যেখানে আছি সেখানে কেউ এসে দাঁড়াক। বাজি ফেলে বলতে পারি 'তরোয়াল চালাও' বলে সে চেঁচাতে পারবে না।" এই-না বলে আর এক ধাপ সে উঠল, তার পর কাঁপতে-কাঁপতে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে টলতে-টলতে মই বেয়ে কোনোরকমে এল নেমে।

প্যাঁচার সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহসী তখন সেখানে আর কেউ রইল না। লোকে বলাবলি করতে লাগল, "আমাদের মধ্যে সব চেয়ে

জোয়ান লোককে দানব বিষাক্ত নিশ্বেস দিয়ে ঘায়েল করে ফেলেছে। আর কাউকে মরতে পাঠানো উচিত নয়।"

তখন তারা শলা-পরামর্শ করতে বসল—শহরটাকে বাঁচাবার জন্য আর কী করা যায়। বহুক্ষণ কেউ কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারল না। শেষটায় মেয়রের মাথায় একটা ফন্দি খেলল। তিনি বললেন :

"আমার মত—সবাইকার স্বার্থে গোলাবাড়ির মালিককে তার খড়, ঘাস আর শস্যদানার দাম দিয়ে বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া উচিত। দানব সমেত সেটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। গড়িমসি করে নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। এক্ষুনি আগুন ধরাও।"

মেয়রের প্রস্তাবে সবাই রাজি হল। গোলাবাড়ির চার কোণে আগুন ধরানো হল। ফলে প্যাঁচাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই কাহিনী যে না বিশ্বাস করবে সে সেই শহরে গিয়ে জিগেস করতে পারে—গল্পটা সত্যি কি না।

চাঁদ

অনেক-অনেক বছর আগে একটা দেশের রাতগুলো সব সময় অন্ধকার আর আকাশটা কালির মতো কালো হয়ে থাকত। চাঁদ তখন সেখানে উঠত না, আকাশে ফুটত না কোনো তারা। পৃথিবী সৃষ্টির সময় রাতের সব আলো খরচ হয়ে গিয়েছিল। সেই দেশের জন্য এতটুকু আলোও বাকি ছিল না। সেখান থেকে চারজন তরুণ একদিন বেরিয়ে পৌঁছল অন্য এক রাজত্বে। সেখানে তারা দেখে সন্ধেবেলায় পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যেতে একটা ওক্‌গাছের চুড়োয় রুপোর একটা প্রকাণ্ড বল উঠে চার দিকে মিষ্টি নরম আলো ছড়াচ্ছে। আলোটা সূর্যের আলোর মতো কট্‌কটে না হলেও তাতে সব-কিছুই দেখা যায়। পথ দিয়ে এক চাষী গোরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। বিদেশীরা তাকে প্রশ্ন করল—আলোটা কী।

চাষী বলল, "ওটা চাঁদ। আমাদের হাকিম তিনটে মোহর দিয়ে কিনে ওটাকে গাছটার চুড়োয় আটকে দিয়েছেন। প্রত্যেক দিন ওটাকে পরিষ্কার করে নতুন তেল ভরতে হয়—যাতে সব সময় জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলতে পারে। এ-কাজের জন্যে সপ্তাহে তাঁকে বেতন দেওয়া হয় একটা করে মোহর।"

চাষী চলে যেতে তাদের একজন বলল, "এই বাতিটা আমাদেরও কাজে লাগবে। আমাদের দেশেও এরকম লম্বা একটা ওক্‌গাছ আছে। এটাকে তার চুড়োয় ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রাতের অন্ধকারে তা হলে আর হোঁচট খেতে হবে না।"

দ্বিতীয়জন বলল, "কী করতে হবে বলি শোনো। একটা গাড়ি আর ঘোড়া এনে চাঁদটাকে আমরা নিয়ে যাব। এখনকার লোকেরা আর একটা চাঁদ কিনে নিতে পারবে।"

তৃতীয়জন বলল, "আমি গাছে চট্‌পট্‌ চড়তে পারি। চাঁদটা পেড়ে আনছি।"

চতুর্থজন একটা গাড়ি আর ঘোড়া ভাড়া করে আনলে তৃতীয়জন গাছে চড়ে, চাঁদের মধ্যে ফুটো করে দড়িতে ঝুলিয়ে সেটাকে নামিয়ে আনল। জ্বল্‌জ্বলে বলটা গাড়িতে রেখে কাপড় দিয়ে সেটা তারা ঢেকে দিল, যাতে তাদের চুরির কথা কেউ না টের পায়। তার পর সেটাকে সগর্বে নিজেদের দেশে এনে ঝুলিয়ে দিল একটা ওক্‌গাছের চুড়োয়। নতুন বাতির ছটা ছড়িয়ে পড়ল মাঠে-মাঠে। চিলে-কুঠরি আর বৈঠকখানাগুলো ভরে উঠল রুপোলি আলোয়। ফলে ছেলে-বুড়ো সবাই খুব খুশি হল। পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এল বামনের দল। সব চেয়ে ভালো লাল কোট পরে পরী-হুরিরা মাঠে-মাঠে শুরু করে দিল গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে।

সেই চার তরুণ চাঁদে তেল ভরে, সলতে ছাঁটে আর তার জন্য সপ্তাহে একটা করে মোহর বেতন পায়। কিন্তু যথা সময় তারা হয়ে পড়ল বুড়ো। তাদের একজন অসুখে পড়ে যখন বুঝল মৃত্যুর আর দেরি নেই তখন আদেশ দিল—চাঁদের চার ভাগের এক ভাগ তার সম্পত্তি তাই সেই অংশটাকে তার সঙ্গে যেন কবর দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর হাকিম গাছে চড়ে চাঁদটার চার ভাগের এক ভাগ কেটে তার কফিনের মধ্যে রাখল। ফলে চাঁদের আলো খুব না হলেও খানিকটা গেল কমে। তার পর সেই চারজনের মধ্যে দ্বিতীয়জনের মৃত্যু হলে বাকি চাঁদটার তিন ভাগের এক ভাগ কাটা হল। তৃতীয়জনের মৃত্যুর পর তার ভাগটা যখন কবরে গেল তখন চাঁদের আলো বাস্তবিকই ঝাপসা হয়ে গেল। তার পর চতুর্থজন কবরে যেতে—আগে যে অন্ধকার ছিল সেই অন্ধকার। রাতে লণ্ঠন না নিয়ে বেরুলে লোকেরা হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে।

কিন্তু পাতালে গিয়ে চাঁদের চারটে অংশ আবার জোড়া লাগল। আগে সেখানে সব সময়েই থাকত অন্ধকার। হঠাৎ এই অদ্ভুত আলোয় মৃতদের ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে সব-কিছু স্পষ্ট দেখতে

পেয়ে তারা গেল অবাক হয়ে। উঠে পড়ে তারা আবার হয়ে উঠল বেজায় চন্‌মনে। কেউ গেল নাচের আসরে, কেউ গেল থিয়েটারে, কেউ-কেউ সরাইখানায় গিয়ে বেদম মদটদ গিলে শুরু করে দিল ভীষণ হৈ-হল্লোড়। তাদের হৈ-হল্লোড়ের শব্দ ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে শেষটায় পৌঁছল স্বর্গে। স্বর্গের সিংহদ্বার পাহারা দেন সেন্ট পিটার। তিনি ভাবলেন পাতালে বিপ্লব শুরু হয়েছে। তাই স্বর্গের সৈন্যদলকে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু শত্রুরা না আসায় ঘোড়ায় চড়ে সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে তিনি গেলেন পাতালে। সেখানে মৃতদের তিনি সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। তাই আবার তারা ফিরে গেল তাদের কবরে। তখন তিনি চাঁদকে সঙ্গে করে এনে ঝুলিয়ে দিলেন স্বর্গে।

জীবনের দৈর্ঘ্য

পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর যখন স্থির করলেন প্রত্যেক জীব কতদিন বাঁচবে, গাধা তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "প্রভু, আমি কতদিন বাঁচব ?"

ঈশ্বর বললেন, "ত্রিশ বছর। এতে খুশি ?"

গাধা উত্তর দিল, "প্রভু, ত্রিশ বছরই যথেষ্ট। কিন্তু আমার কষ্টের জীবনটার কথা একবার ভাবুন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শস্য-ভরা ভারী ভারী দানাগুলো আমাকে নিয়ে যেতে হয় জাঁতাকলে—যাতে অন্যরা রুটি খেতে পায়। প্রতিদানে আমি শুধু পাই লাথি আর ঝাঁটা। আমার জীবন থেকে কয়েকটা বছর কমিয়ে দিন।"

তার কথা শুনে ঈশ্বরের করুণা হল। তাই তিনি ত্রিশের বদলে গাধার জীবন করে দিলেন আঠারো বছর। আশ্বস্ত হয়ে গাধা চলে যেতে কুকুর এসে হাজির হল।

সৃষ্টিকর্তা তাকে প্রশ্ন করলেন, "কত বছর বাঁচতে চাও ? গাধার মনে হয়েছিল ত্রিশ বছরের জীবন বড্ডো বড়ো। ত্রিশ বছরের জীবন নিয়ে তুমি খুশি হবে ?"

কুকুর বলল, "প্রভু, আশাকরি সত্যি-সত্যি আমাকে ত্রিশ বছরের জীবন দেবেন না, ভাবুন, আমাকে কত ছুটোছুটি করতে হয়। আমার পা এতদিন টিঁকবে না। তা ছাড়া ডাকবার স্বর আর কামড়াবার দাঁত হারালে এক কোণে শুয়ে গোঁ-গোঁ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না।"

ঈশ্বর তার অনুরোধের যুক্তি বুঝে তাকে দিলেন বারো বছরের জীবন। তার পর এল বাঁদর।

ঈশ্বর তাকে প্রশ্ন করলেন, "ত্রিশ বছর বাঁচতে চাও? গাধা আর কুকুরের মতো তোমায় খাটতে হয় না। তা ছাড়া তোমার জীবনটা তো মজাদার।"

বাঁদর উত্তর দিল, "প্রভু, দেখে মনে হয় আমার জীবনটা মজাদার, আসলে তা কিন্তু নয়। দুধ-বার্লি বৃষ্টি হলে সেটা খাবার চামচে আমার নেই। লোকদের হাসাবার জন্যে সব সময় আমাকে নানা অঙ্গভঙ্গি মুখভঙ্গি করতে হয়। কিন্তু তারা যে-আপেল দেয়, কামড়ে দেখি সেটা টক। যে-সব ইয়ার্কি-তামাশা করি প্রায়ই তার পেছনে থাকে কান্নার সুর—কেই-বা সেটা বোঝে। ত্রিশ বছরের এরকম জীবন আমি সইতে পারব না।"

যুক্তিটা বুঝে ঈশ্বর কমিয়ে তার জীবনটা করে দিলেন দশ বছরের। সব শেষে এল এক মানুষ। স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। ঈশ্বরকে সে প্রশ্ন করল—কত দিন বাঁচবে।

ঈশ্বর বললেন, "ত্রিশ বছর।—এটাই যথেষ্ট তো?"

হতাশ গলায় মানুষটি চেচিয়ে উঠল, "মাত্র ত্রিশ বছর। সবে আমি বাড়ি বানিয়েছি, আগুন জ্বলছে সেখানকার উনুনে। যে-গাছগুলো পুঁতেছিলাম তাতে ফুল ফুটেছে, কিছুদিনের মধ্যেই ফল ধরবে। আমার পরিশ্রমের ফল উপভোগ করার পর যেন আমি মরি। হে প্রভু, আমার আয়ু বাড়িয়ে দিন।"

ঈশ্বর বললেন, "গাধার আয়ুর আরো আঠারোটা বছর তোমায় দেব।"

মানুষ বলল, "সেটা যথেষ্ট নয়।"

"কুকুরের আয়ুর বারোটা বছরও পাবে।"

"তাও খুবই কম।"

ঈশ্বর তখন বললেন, "বেশ, বাঁদরের আয়ুর দশটা বছরও দিলাম, তার বেশি নয়।"

মানুষটি চলে গেল—কিন্তু তখনো সে পরিতৃপ্ত হয় নি।

মানুষ তাই বাঁচে সত্তর বছর। প্রথম ত্রিশটা বছর তার কৈশোর আর যৌবনের। চটপট্ সেটা খরচ হয়ে যায়। সেই সময় তার স্বাস্থ্য

থাকে ভালো, মনে থাকে স্ফূর্তি, কাজে থাকে উদ্যম, বাঁচার থাকে সুখ। তার পর আসে গাধার আঠারোটা বছর। একটার পর একটা বোঝা তাকে বইতে হয়। নিয়ে যেতে হয় ফসল। অন্যে সেটা খায়। প্রতিদানে সে পায় লাথি-ঝাঁটা। তার পরের বারোটা বছর কুকুরের জীবন। এক কোণে শুয়ে সে তখন গোঁ-গোঁ করে—না থাকে চেঁচাবার কণ্ঠস্বর, না থাকে কামড় দেবার দাঁত। তার শেষ জীবন বাঁদরের দশটা বছর। মানুষের তখন ভীমরতি—নানা এলোমেলো হাবিজাবি কাজ করে, যা দেখে শিশুরা তাকে ক্ষেপিয়ে মজা লোটে।

মৃত্যুর দূত

বহুকাল আগে একদিন এক দানব রাজপথ দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ অচেনা একটা মানুষ লাফিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "খবরদার, আর এক পা এগুবে না।"

দানব বলল, "কী বললি, পুঁচকে পিঁপড়ে কোথাকার! দু আঙুলে টিপে তোকে গুঁড়িয়ে দিতে পারি—জানিস? বড়ো আস্পর্ধা, আমার পথ আটকাতে এসেছিস। তুই কে রে?"

সে বলল, "আমি মৃত্যু। আমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমার আদেশ সবাইকে মানতে হয়।"

দানব কিন্তু তার কথা কানে তুলল না। মৃত্যুর সঙ্গে সে শুরু করে দিল কুস্তি লড়তে। শেষটায় এক ঘুষিতে মৃত্যুকে সে পেড়ে ফেলল। একটা পাথরে মৃত্যু আছড়ে পড়তে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে আবার হাঁটতে শুরু করে দিল দানব। অসহায় হয়ে পড়ে রইল মৃত্যু, উঠতে পারল না। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, 'এখানে আমি পড়ে থাকলে তো সর্বনাশ। পৃথিবীতে কেউই মরবে না। আর সবাই যদি বাঁচতে থাকে তা হলে তো সেখানে আর পা রাখার ঠাঁই হবে না।'

সেই মুহূর্তে সেখানে হাজির হল এক তরুণ। স্বাস্থ্য তার উপচে পড়ছে, খুশিতে জ্বলজ্বল্ করছে তার সারা মুখ। কখনো শিস্ দিতে দিতে, কখনো গুন্‌গুন্ করে গাইতে-গাইতে সে হাঁটছিল। পথের পাশে আধ-মরা লোকটাকে দেখে তার দয়া হল। লোকটার কাছে গিয়ে পকেট

থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে কয়েক ঢোক খাওয়াতে আধমরা লোকটা চোখ মেলে তাকাল।

উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে অচেনা লোকটা প্রশ্ন করল, "আমি কে জানো? কাকে বাঁচিয়েছ জানলে তুমি অবাক হবে।"

তরুণ বলল, "না, জানি না, কে তুমি?"

লোকটা বলল, "আমি মৃত্যু। কাউকে আমি ছেড়ে কথা বলি না। এমন-কি, তোমাকেও আমি রেহাই দিতে পারি না কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে কথা দিলাম, তোমাকে আচমকা নিয়ে যাব না। নিয়ে যাবার আগে তুমি যাতে প্রস্তুত হতে পার তার জন্যে আমার দূতদের পাঠাব।"

তরুণ বলল, "খুব ভালো কথা। যতদিন-না তোমার দূতরা আসে ততদিন বুঝব নিরাপদে আছি।" এই-না বলে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল।

জীবনে উন্নতি করতে লাগল তরুণ। মনে তার ফুর্তির কখনো অভাব হয় না। কিন্তু যৌবন আর ভালো স্বাস্থ্য তো চিরকাল টেকে না। যথাসময়ে সে বুড়ো হয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ভর করল নানা অসুখ আর হরেকরকম যন্ত্রণা। দিনে সে যন্ত্রণায় কাতরায় রাতে পারে না ঘুমোতে। মনে-মনে সে ভাবল, 'নিশ্চয়ই এখনো মরতে বসি নি। কারণ মৃত্যু কথা দিয়েছে মরবার আগে প্রস্তুত হবার জন্যে দূতদের পাঠাবে। এই বিশ্রী অসুখটা সারলে বাঁচি।' তার পর খানিক সুস্থ হলে তার মনে বাঁচবার আনন্দ আবার ফিরে এল।

কিছুকাল পর একদিন কে একজন তার কাঁধে টোকা দিল। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু।

মৃত্যু বলল, "আমার সঙ্গে চলে এসো। পৃথিবী থেকে তোমার বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে।"

অবাক হয়ে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "কী! তুমি তোমার কথার খেলাপ করবে নাকি? তুমি তো কথা দিয়েছিলে আগে তোমার দূতদের পাঠাবে। কিন্তু তাদের তো দেখি নি।"

ধমকে মৃত্যু বলল, "চুপ কর! তোমার কাছে কি দূতের পর দূত পাঠাই নি? জ্বর এসে তোমার গা কি পোড়ায় নি? মাথা-ঘুরনি ধরে নি? সর্বাঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে নি? কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ

শব্দ পাও নি? দাঁতগুলো কন্‌কন্‌ করে নি? চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় নি? এ-সব সংকেত ছাড়াও আমার শান্তস্বভাব ভাই ঘুম—সে কি প্রতি রাতে আমার কথা মনে পড়িয়ে দেয় নি? কখনো কি মৃত্যুর মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড় নি?"

লোকটির বলার আর কোনো কথা ছিল না। নিয়তির কাছে নতি স্বীকার করে মৃত্যুকে সে অনুসরণ করল।

ঈভের নানা ধরনের সন্তান

স্বর্গ থেকে আদম ও ঈভকে তাড়িয়ে দেবার পর এক অনুর্বর জমিতে কুটির বানিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতে তাঁরা বাধ্য হন। আদম কাজ করতেন ক্ষেতে, ঈভ সুতো কাটতেন পশম থেকে। প্রতি বছরেই ঈভের কোলে আসত একটি করে শিশু। কিন্তু শিশুদের কারুর সঙ্গেই কারুর মিল থাকত না। কারণ কেউ হত সুন্দর, কেউ হত কুৎসিত।

কিছুকাল পর আদম ও ঈভের কাছে এক দেবদূত মারফত ঈশ্বর খবর দিলেন—তাদের সংসার দেখতে তিনি আসছেন।

খবর পেয়ে খুব খুশি হয়ে নিজেদের কুটির পারিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফুল দিয়ে ঈভ সাজালেন। তার পর তাঁর যে সন্তানরা সুন্দর শুধু তাদের এনে স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে পরালেন পরিষ্কার পোশাক। তাদের বিশেষ করে উপদেশ দিয়ে বললেন ঈশ্বরের সামনে তারা যেন খুব সভ্যভব্য হয়ে থাকে, তারা যেন খুব নম্রভাবে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে এবং তাঁর সব প্রশ্নের যেন উত্তর দেয় অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং বুদ্ধিমানের মতো।

ঈভ স্থির করলেন কুৎসিত শিশুরা ঈশ্বরের সামনে বেরুবে না। প্রথম ছেলেকে তিনি লুকোলেন শুকনো ঘাসের গাদায়, দ্বিতীয়কে ছাতের নীচে, তৃতীয়কে খড়ের স্তূপে, চতুর্থকে উনুনের মধ্যে, পঞ্চমকে মাটির তলার ঘরে, ষষ্ঠকে টবের মধ্যে, সপ্তমকে মদের পিপেয়, অষ্টমকে পশুর পুরনো একটা লোমে-ঢাকা চামড়ার নীচে, নবম আর দশমকে

কাপড়ের মধ্যে—যেটা কেটে তাদের পোশাক তিনি বানাবেন এবং একাদশতম ও দ্বাদশতমকে চামড়ার নীচে—যেটা কেটে তাদের জন্য বানাতেন তিনি জুতো। তার পর দরজার ফাক দিয়ে আদম দেখেন ঈশ্বর এসেছেন। সসম্ভ্রমে তিনি দরজা খুলতে স্বর্গের অতিথি প্রবেশ করলেন।

সুন্দর শিশুরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। ঝুঁকে অভিবাদন করে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে নতজানু হয়ে তারা বসল। ঈশ্বর তখন তাদের আশীর্বাদ করতে শুরু করলেন। প্রথম শিশুর মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "তুমি হবে মহা পরাক্রান্ত রাজা ;" তার পর দ্বিতীয়কে বললেন, "তুমি হবে রাজপুত্র ;" তৃতীয়কে, "তুমি হবে কাউণ্ট ("য়ুরোপের অভিজাত লোকের বড়ো খেতাব) ;" চতুর্থকে, "তুমি হবে নাইট্ (ভদ্রবংশের সৈনিক) ;" পঞ্চমকে "তুমি হবে নোব্‌ল্‌ম্যান (বড়ো খেতাবধারী লোক) ;" ষষ্ঠকে, "তুমি হবে প্রজা ;" সপ্তমকে, "তুমি হবে বণিক ;" এবং অষ্টমকে, "তুমি হবে বিদ্বান।" এই ভাবে তার সব নামী-দামী আশীর্বাদগুলো তাদের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দিলেন।

ঈশ্বরের করুণা দেখে ঈভ ভাবলেন, 'এবার আমার কুৎসিত চেহারা শশুদের নিয়ে আসি। ঈশ্বর হয়তো তাদেরও আশীর্বাদ করবেন।'

এই-না ভেবে শুকনো ঘাস, খড়, উনুন ইত্যাদি জায়গা থেকে তাদের তনি বার করে আনলেন। নোংরা, কালিঝুলি-মাখা শিশুর দল হাজির হল ঈশ্বরের সামনে। তাদের দেখে হেসে ঈশ্বর বললেন, "এই-সব শিশুদেরও আমি আশীর্বাদ করব।" এই বলে প্রথম শিশুর মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "তুমি হবে চাষী ;" দ্বিতীয়কে, "তুমি হবে জেলে ;" তৃতীয়কে, "তুমি হবে কামার ;" চতুর্থকে, "তুমি হবে চামার ;" পঞ্চমকে, "তুমি হবে তাঁতি ;" ষষ্ঠকে, "তুমি হবে মুচি ;" সপ্তমকে, "তুমি হবে দর্জি ;" অষ্টমকে, "তুমি হবে কুমোর ;" নবমকে, "তুমি হবে গাড়োয়ান ;" দশমকে, "তুমি হবে নাবিক ;" একাদশতমকে, "তুমি হবে দূত ;" এবং দ্বাদশতমকে, "আজীবন তুমি হয়ে থাকবে চাকর।"

সব শুনে ঈশ্বরকে ঈভ বললেন, "প্রভু, আপনি মোটেই সমানভাবে আপনার আশীর্বাদ বিতরণ করেন নি। এরা সব আমারই সন্তান। অতএব এদেরও ভালো-ভালো আশীর্বাদ করা উচিত ছিল।"

উত্তরে ঈশ্বর বললেন, "ঈভ, তুমি বুঝছ না। তোমার সব সন্তান দিয়ে পৃথিবীকে ভরে তুলতে আমি চাই। সবাই রাজা-উজির হলে কে শস্য বুনবে, কে শস্য ঝাড়াই করবে, কে শস্য মাড়াই করবে, আর কে রুটি সেঁকবে? কে তাঁত চালাবে, কাঠ কাটবে, বাড়ি বানাবে, মাটি কোপাবে, গাছ কাটবে, সেলাই করবে? প্রত্যেকেরই থাকবে নিজের-নিজের পেশা, ফলে প্রত্যেককেই নির্ভর করতে হবে প্রত্যেকের ওপর।"

কথাগুলো শুনে ঈভ বললেন, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন। কামনা করি, আমার সন্তানরা আপনার আশীর্বাদমতো যেন কাজ করে যায়।"

বড়ো লোক আর গরিব লোক

সে আজ বহুকাল আগেকার কথা। স্বয়ং যিশুখৃস্ট তখন পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ছিলেন। একবার নিজের গন্তব্যস্থানে তিনি পৌঁছবার আগেই রাত হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে দুটো বাড়ির মাঝখানের এক পথে তিনি থামলেন। বাড়ি দুটোর একটা বিরাট সুন্দর প্রাসাদ। অন্যটা ছোট্টো কুঁড়েঘর। প্রাসাদটা ছিল এক বড়ো লোকের আর কুঁড়েঘরটা এক গরিব লোকের। যিশু ভাবলেন, 'রাতে আমাকে আশ্রয় দিতে বড়ো লোকের অসুবিধে হবে না।' তাই তিনি বড়ো লোকের বাড়ির দরজায় টোকা দিলেন। বড়ো লোক জানলা খুলে প্রশ্ন করল, তিনি কী চান। যিশু বললেন, "রাতের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজছি।"

বাড়ির মালিক পথিকের আগাপাস্তলা খুঁটিয়ে দেখল। যিশুর পরনে ছিল জীর্ণ পোশাক। দেখে মনে হল না পকেটে তাঁর বিশেষ টাকাকড়ি আছে। তাই সে মাথা নাড়িয়ে বলল, "তোমাকে আশ্রয় দিতে পারব না। আমার বাড়তি ঘরগুলোয় শস্যদানা আছে। দরজায় টোকা দিলেই লোকদের খাইয়ে-দাইয়ে রাখতে হলে শিগ্‌গিরই আমাকে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে বেরুতে হবে।" এই-না বলে সশব্দে সে জানলা বন্ধ করে দিল। যিশু দাঁড়িয়ে রইলেন পথে।

তার পর বড়ো লোকের বাড়ি থেকে যিশু গেলেন সেই ছোট্টো কুঁড়েঘরে। সেখানে দরজায় টোকা-দিতে-না-দিতেই দরজা খুলে গরিব লোক পথিককে বলল ভিতরে আসতে।

তার পর সে বলল, "আমার সঙ্গে থাকো। অন্ধকার হয়ে আসছে। বেশি দূর যেতে তুমি পারবে না।"

খুশি হয়ে যিশু গেলেন কুঁড়েঘরের মধ্যে। গরিব লোকের বউ তাঁকে স্বাগত জানাল। তাঁকে দেবার মতো বিশেষ খাবার-দাবার না থাকলেও সে বলল আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না। সেদ্ধ করার জন্য কিছু আলু উনুনে চড়িয়ে সে তাদের ছাগলের দুধ দুয়ে আনল। খাবার টেবিল সাজানো হবার পর গরিব লোক আর তার বউয়ের সঙ্গে বসে সেই সামান্য খাবার যিশু খেলেন। তাদের তৃপ্তি-ভরা সুখের জন্য সব-কিছুই সুস্বাদু হয়ে উঠল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর গরিব লোকের বউ স্বামীকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আজ রাতে আমরা খড়ের ওপর শোব। পথিককে শুতে

দেব আমাদের বিছানায়। সারাদিন হেঁটে-হেঁটে বেচারা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

স্বামী জানাল তার কোনোই আপত্তি নেই। তার পর যিশুর কাছে গিয়ে তাঁকে সে অনুরোধ করল তাদের বিছানায় ঘুমোতে। প্রথমটায় যিশু বুড়োবুড়ির কষ্ট হবে ভেবে তাদের বিছানায় শুতে রাজি হলেন না। কিন্তু শেষটায় তাঁদের আন্তরিক অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারলেন না। পরদিন খুব ভোরে খড়ের গাদা থেকে উঠে অতিথির জন্য তারা দুজন সকালের খাবার বানাল। জানলা দিয়ে রোদ আসার পর ঘুম থেকে যিশু উঠলেন তার পর খাবার খেয়ে জানালেন এবার তাঁকে যাত্রা করতে হবে।

যাত্রা করবার আগে দোরগোড়ায় থেকে তিনি বললেন, "তোমাদের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার কাছে তিনটে বর চাও।"

গরিব লোক বলল, "আমাদের বর দিন—যেন চির শান্তি আমরা পাই আর এখনকার মতো সুস্থ শরীরে যেন বেঁচে থাকি। কিন্তু তৃতীয় কী বর চাইব ভেবে পাচ্ছি না।"

যিশু বললেন, "এই পুরনো বাড়িটার বদলে একটা নতুন বাড়ি চাও না ?"

গরিব লোক বলল, "চাই বৈকি! নতুন একটা বাড়ি পেলে খুব ভালো হয়।"

যিশু তাদের কুঁড়েঘরকে নতুন বাড়ি করে দিয়ে, তাদের আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বড়ো লোকের যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখে পুরনো নড়বড়ে কুঁড়েঘরের জায়গায় রয়েছে লাল টালির ছাতওয়ালা একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নতুন বাড়ি। অবাক হয়ে চোখ গোল-গোল করে বউকে ডেকে সে বলল, "গতকাল সন্ধেয় ওখানে ছিল নড়বড়ে একটা কুঁড়েঘর। আজ সে-জায়গায় দেখছি সুন্দর নতুন একটা বাড়ি। কী ব্যাপার, গিয়ে খবর নিয়ে এসো তো।"

বড়ো লোকের বউ গরিব বুড়ো-বুড়ির কাছে ব্যাপারটা জানতে গেল। তারা জানাল গতকাল এক বিদেশী এসে তাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তাঁকে তারা আশ্রয় দেয়। আজ সকালে বিদায় নেবার সময় তাদের তিনি তিনটে বর দিয়ে গেছেন—পর-জগতে অনন্ত জীবন, ইহ-জগতে ভালো স্বাস্থ্য আর দৈনিক রুটি আর পুরনো বাড়ির বদলে নতুন একটা বাড়ি। খবরটা দেবার জন্য বড়ো লোকের বউ ছুটল তার স্বামীর কাছে।

বড়ো লোক চেঁচিয়ে উঠল, "ইচ্ছে করছে মাথার চুল ছিঁড়ি! যদি জানতাম! বিদেশী লোকটি প্রথমে এখানে এসেছিল। কিন্তু তাকে আমি আশ্রয় দিই নি।"

তার বউ বলল, "ঘোড়ায় চড়ে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়ো। পথে নিশ্চয়ই তার দেখা পাবে। তার কাছে তিনটে বর চেয়ে আনো।"

বউয়ের কথামতো সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল বড়ো লোক। যিশুর নাগাল ধরে তাঁকে আশ্রয় না দেবার জন্য বিনীত নম্র

গলায় ক্ষমা চেয়ে সে বলল, "আসলে আপনি যখন চলে যান তখন সদর-দরজার চাবিটা আমি খুঁজছিলাম। এ-পথে আবার এলে দয়া করে আমাদের বাড়িতে উঠবেন। আমরা খুব খুশি হব।"

যিশু বললেন, "এ-পথ দিয়ে ফিরলে নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়িতে উঠব।"

বড়ো লোক তখন প্রশ্ন করল, তার প্রতিবেশীকে যেরকম তিনটে বর তিনি দিয়েছেন সেরকম তিনটে বর তিনি তাকে দিতে পারেন কি না।

যিশু বললেন—তা পারেন; কিন্তু তার পক্ষে বর না চাওয়াই ভালো, কারণ তাতে সে লাভবান হবে না। বড়ো লোক কিন্তু নিঃসন্দেহ ছিল যে, এমন বর সে চাইতে পারবে যার ফলে আনন্দময় হয়ে উঠবে তার জীবন।

যিশু তখন বললেন, "বাড়ি ফিরে যাও। তোমার তিনটে ইচ্ছে পূর্ণ হবে।"

বড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভাবতে লাগল, কী-কী তিনটে বর চাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে তার লাগামটা ঘোড়ার গলায় খসে পড়তে সেটা উঠল দারুণ চমকে। ফলে তার ভাবনাগুলো এলো-মেলো হয়ে পড়ল। চাবুকটা ঘোড়ার মাথায় ঠেকিয়ে সে বলল, "শান্ত হয়ে চল, লিস্।" কিন্তু ঘোড়াটা আবার উঠল চমকে। বড়ো লোক তখন দারুণ রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার ইচ্ছে, ঘাড় মটকে তুই মরিস!" তার মুখ থেকে কথাগুলো খসতে-না-খসতেই ঘোড়াটা মরে মাটিতে পড়ে গেল। এইভাবে পূর্ণ হল তার প্রথম ইচ্ছে। কিন্তু লোকটা ছিল ভারি লোভী প্রকৃতির। তাই ঘোড়াটার জিন্ আর লাগাম সে ফেলে গেল না। সেগুলো খুলে নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে পায়ে হেঁটে সে চলতে শুরু করল।

বালির উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এই ভেবে সে সান্ত্বনা পেল, "এখনো তো আমার দুটো ইচ্ছে বাকি আছে!" দুপুরের রোদ চড়চড়ে হয়ে উঠতে সে গলদঘর্ম হয়ে পড়ল। তার মেজাজটাও হয়ে উঠল তিরিক্ষি। তার পিঠের উপর জিন্‌টা ক্রমশ যেন ভারী হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনো সে স্থির করতে পারল না কী সে চাইবে। সে ভাবল, 'সব ধনদৌলত এখন যদি চাই পরে নিশ্চয়ই আরো ভালো জিনিসের কথা মনে পড়ে যাবে। তাই ভেবে-ভেবে এমন কিছু চাওয়া

দরকার যেটা চাইলে চাইবার মতো আর কিছু বাকি থাকবে না। দীর্ঘ-নিশ্বেস ফেলতে-ফেলতে একবার সে ভাবে অমুক জিনিস চাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে মন বদলে ফেলে। তার পর তার মনে হল তার বউ বাড়িতে ঠাণ্ডা ঘরে বসে বরফ-জলে চুমুক দিচ্ছে আর তাকে কষ্ট করে হাঁটিতে হচ্ছে চড়চড়ে রোদের মধ্যে। কথাটা মনে হতে তার মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠল। কিছু না ভেবেই সে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলল, "ইচ্ছে করছে এই জিনে বউ বসে আর এটা যেন আমার পিঠে না থাকে।" কথাগুলো তার মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই জিন্‌টা অদৃশ্য হল আর সঙ্গে-সঙ্গে সে বুঝল তার দ্বিতীয় ইচ্ছেটাও পূর্ণ হয়েছে।

তখন সে দারুণ বেগে গলদঘর্ম হয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। কারণ সে চেয়েছিল বাড়ি ফিরে একলা ঘরে চার দিক বন্ধ করে ভেবে-ভেবে এমন একটা শেষ বর চাইবে যার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে বৈঠকখানার দরজা খুলতেই তাকে দেখে আর বউ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল। কারণ, জিনের সঙ্গে সে আটকে গিয়েছিল, কিছুতেই উঠতে পারছিল না। তার স্বামীও দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে বলল, "শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকো। তোমার জন্য পৃথিবীর সব ধনদৌলত ভেবে-ভেবে আমাকে চাইতে দাও।"

তার বউ কিন্তু তাকে গালাগালি করে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি একটা আস্ত পাঁঠা। এই জিন্‌ থেকে উঠতে না পারলে পৃথিবীর সব ধন-দৌলত আমার কোন্‌ কাজে লাগবে শুনি? এই জিন্‌ থেকে আমাকে তোলো।" জিন্‌ থেকে বউকে মুক্ত করার জন্য তাই বাধ্য হয়ে তাকে চাইতে হল তৃতীয় বরটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা পূর্ণ হয়ে গেল।

এইভাবে তিনটে বরের দরুণ বড়ো লোক পেল শুধু যন্ত্রণা আর গালিগালাজ আর ফাউ হিসেবে মরা একটা ঘোড়া। এদিকে রাস্তার ওপাশে সেই গরিব লোক আর তার স্ত্রী আমরণ রইল সুখে শান্তিতে।

ক্ষুদে মানুষদের উপহার

এক দর্জি আর এক সেকরা একসঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিল। এক সন্ধেয় পাহাড়ের পিছনে সূর্য যখন চলে পড়েছে, দূর থেকে তারা শুনতে পেল গান-বাজনার সুর। ক্রমশ সেই সুর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এমন অদ্ভুত সুন্দর সেই সুর যে পথ হাঁটার ক্লান্তি তারা ভুলে গেল। তাই তারা আরো জোরে-জোরে পা চালাল। হাঁটতে-হাঁটতে একটা ঢিবির কাছে তারা যখন পৌঁছল জ্যোৎস্নায় চার দিক তখন ভেসে গেছে। তারা দেখে সেখানে হাত ধরাধরি করে মনের আনন্দে নেচে চলেছে একদল ক্ষুদে-ক্ষুদে মানুষ—ছেলে আর মেয়ে। আর সেইসঙ্গে তারা গান গাইছে ভারি মিষ্টি সুরে। তাদের গানের সুরই দূর থেকে তারা শুনেছিল। তাদের মাঝখানে বসেছিল এক বুড়ো। লম্বা তার পাকা দাড়ি, গায়ে হরেক রঙের কোর্ট, অন্যদের চেয়ে খানিক লম্বা। পথিক দুজন ভারি অবাক হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত তাদের নাচ দেখল। নাচ শেষ হলে বুড়ো লোকটি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোল হয়ে যে-সব ক্ষুদে মানুষ দাঁড়িয়েছিল তারা খুশি হয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাদের ভিতরে যাবার পথ করে দিল। সেকরার পিঠে ছিল কুঁজ। আর কুঁজো লোকরা সব সময়েই হয় নির্লজ্জ আর উদ্ধত। সেকরা তাই বুক ফুলিয়ে চলল আগে-আগে। দর্জির প্রথমে খানিকটা বাধো-বাধো লাগছিল। তাই সে এগুলো না। কিন্তু সবাইকে ভারি হাসি-খুশি দেখে শেষপর্যন্ত সাহসে ভর করে সেও গেল সেকরার পিছন-পিছন। সঙ্গে-সঙ্গে আবার হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুদে-

মানুষগুলো শুরু করে দিল পাগলের মতো লাফাতে-ঝাঁপাতে-নাচতে। বুড়ো লোকটার কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছিল লম্বা একটা ছুরি। সে কিন্তু নাচে যোগ না দিয়ে ছুরিটা বার করে শানাতে লাগল। ছুরিটা চক্‌চক্‌ করে উঠতে সে তাকাল বিদেশীদের দিকে। তাই দেখে তাঁরা দুজন ভীষণ ঘাবড়ে পড়ল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় তারা পেল না। কারণ বুড়ো লোকটা সেকরাকে ধরে চক্ষের নিমেষে তার দাড়ি আর মাথার চুল দিল কামিয়ে। দর্জির বরাতেও ঘটল একই ব্যাপার। কিন্তু খানিক পরেই তাদের আতঙ্ক কেটে গেল। কারণ বুড়ো এমন ভাবে সস্নেহে তাদের কাঁধ চাপড়াতে লাগল যেন বলতে চায়—স্বেচ্ছায় আর কোনোরকম ধস্তাধস্তি না করে চুল-দাড়ি কামাতে দিয়ে তোমরা খুব ভালো করেছ। এক পাশে এক গাদা কয়লা পড়েছিল। বুড়ো সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ইশারায় তাদের বলল কয়লাগুলো দিয়ে পকেট ভরে নিতে। বুড়োর আদেশ তারা মানল কিন্তু বুঝতে পারল না কয়লার টুকরোগুলো তাদের কোন উপকারে লাগবে। তার পর সেখান থেকে বেরিয়ে তারা চলল রাতের জন্য একটা আস্তানা খুঁজতে।

তারা যখন উপত্যকায় পৌঁছল কাছের সন্ন্যাসীদের মঠে তখন ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজছে। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষুদে মানুষদের গান থেমে গেল আর সব-কিছু হল অদৃশ্য। জ্যোৎস্নার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রইল ফাঁকা ঢিবিটা। পথিকরা তার পর এক সরাইখানায় পৌঁছে খড়ের বিছানায় শুয়ে কোট দিয়ে ঢাকল নিজেদের শরীর। এমনই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, কয়লার টুকরোগুলো পকেট থেকে বার করার কথা তাদের মনেই পড়ে নি।

সর্বাঙ্গে একটা ভারী চাপ অনুভব করে খুব ভোরে তাদের ঘুম ভাঙল। সাধারণত অত ভোরে ঘুম থেকে তারা ওঠে না। পকেটে হাত দিয়ে কয়লা বার করতে গিয়ে খাঁটি সোনার তাল দেখে নিজেদের চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারল না। তাদের আরো আনন্দ হল নিজেদের দাড়ি আর মাথার চুল আরো ঘন হয়ে গজাতে দেখে।

তারা হয়ে উঠল খুবই ধনী। কিন্তু সেকরা ছিল লোভী। তাই দর্জির চেয়ে ডবল কয়লা সে পকেটে ভরেছিল।

যারা লোভী তাদের যথেষ্ট থাকলেও আরো চায়। তাই দর্জিকে সেকরা বলল আর একদিন থেকে সন্ধেয় সেই ঢিবিতে গিয়ে বুড়ো

লোকটার কাছ থেকে আরো সোনা আনার কথা।

দর্জির কিন্তু যাবার ইচ্ছে ছিল না। সে বলল, "আমার যথেষ্ট সোনা রয়েছে এতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি এখন একটা ভালো দোকান খুলতে পারব আর যে মেয়েটিকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করতে পারব।" তবু বন্ধুকে খুশি করার জন্য সে থেকে গেল আর-একটা দিন।

অনেক বেশি কয়লা ভরার জন্য দু কাঁধে বড়ো-বড়ো দুটো থলি ঝুলিয়ে সন্ধেয় সেকরা চলল সেই টিবিতে। আর গত রাতের মতোই ক্ষুদে-ক্ষুদে লোকদের সে দেখল নাচ-গান করতে। আগের মতোই বুড়ো তার মাথা কামিয়ে ইশারায় বলল কয়লা নিয়ে যেতে। কোনোরকম ইতস্তত না করে থলিগুলোয় যত পারল কয়লা ভরে মনের আনন্দে সরাইখানায় ফিরে খড়ের বিছানায় শুয়ে কোট দিয়ে নিজের শরীর ঢাকল সেকরা।

তার পর আপন মনে বলে উঠল, 'সোনার ভার খুব বেশি হলেও অনায়াসে সইতে পারব।' তন্দ্রার ঘোরে এই কথা ভেবে তার মন খুশি হয়ে উঠল—কাল যখন ঘুম ভাঙবে তখন আমি মস্ত ধনী।

পরদিন সকালে চোখ খুলেই চট্‌পট্‌ সে হাত চালাল তার থলিগুলোর মধ্যে। কিন্তু, হরি-হরি! যতই সে হাত বার করে, দেখে বেরিয়ে আসছে শুধুই কালো-কালো কয়লা! সে তখন ভাবল, 'যাক গে যাক —এর আগের রাতে যে সোনা এনেছিলাম সেটা তো আমার আছে!' কিন্তু সোনার তালগুলো আনতে গিয়ে আঁতকে সে দেখে সেগুলোও হয়ে গেছে কালো-কালো কয়লা! তার পর কয়লার গুঁড়োয় ভরা কালো-কালো হাত দিয়ে মাথা চাপড়াতে গিয়ে সে দেখে দুই গালের মতোই মাথাটাও তার মসৃণ হয়ে গেছে!

কিন্তু তখনো দুর্ভোগ তার শেষ হয় নি। তার চোখে পড়ল পিঠের কুঁজের মতো বড়োসড়ো আর-একটা কুঁজ গজিয়ে উঠেছে তার বুকে। তখন সে বুঝল লোভের জন্য কী রকম সাজা সে পেয়েছে। তাই সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

তার কান্না শুনে দর্জির ঘুম ভাঙল। সেকরাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, "তুমি ছিলে আমার ভ্রমণের সঙ্গী। এখনো তাই থাকবে। আমার সোনার তালগুলো তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেব।" দর্জি তার কথা রেখেছিল। সেকরা বেচারাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় দুটো কুঁজ আর টাক-মাথা ঢাকতে হয় কাপড়ের একটা টুপি দিয়ে।

দৈত্য আর দর্জি

এক সময় এক দর্জির মাথায় খেয়াল চাপল—দেশ-ভ্রমণে বেরুবে। লোকটা বড়াই করার ব্যাপারে যত দড় ছিল, কাজে তত নয়। যাই হোক, প্রথম সুযোগেই নিজের দোকান থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। আর তার পর :

নানা সেতু পেরিয়ে
দর্জি চলে এগিয়ে।
কখনো যায় এখানে
কখনো যায় ওখানে
নানা পথের উপর দিয়ে
দর্জি চলে এগিয়ে।

যেতে-যেতে সে দূরে দেখল খাড়া একটা পাহাড় আর সেই পাহাড়টার পিছনে আকাশ-ছোঁয়া একটা মিনার। মিনারটা উঠেছিল গহন এক বনের মধ্যে থেকে। দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা। ওটা কী?" তার পর কৌতূহলী হয়ে পা চালিয়ে এগোতে অবাক হয়ে সে দেখে মিনারটার পা আছে। এক লাফে পাহাড় ডিঙিয়ে সেটা তার সামনে হাজির হল আর দর্জি দেখল—সামনে দাঁড়িয়ে প্রবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য।

বজ্রের মতো গম্‌গমে গলায় দৈত্য প্রশ্ন করল, "ওরে পুঁচকে মাছির ঠ্যাং। এখানে কী করছিস?"

প্যান্‌পেনে কাঁদোকাঁদো গলায় দর্জি বলল, "দেখছি এই বনে এক টুকরো রুটি জোগাড় করা যায় কি না।"

দৈত্য বলল, "রুটি চাস তো আমার কাছে কাজ কর।"

"অন্য উপায় না থাকলে করতেই হবে। কিন্তু কত বেতন দেবে?"

"বেতন? শিগ্‌গিরই সেটা জানতে পারবি। বেতন পাবি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আর অধিবর্ষ হলে আর-একটা দিন বেশি। কেমন, পছন্দ?"

উত্তরে দর্জি বলল, "ঠিক আছে।" তার পর মনে-মনে ভাবল, 'প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে।'

দৈত্য বলল, "ওরে হাবাতে, আমার জন্যে এক জাগ্‌ জল নিয়ে আয়।"

জাগ্‌ নিয়ে জল আনতে যাবার সময় দর্জি বড়াই করে প্রশ্ন করল, "এক জাগ্‌ জলের বদলে ঝরনা-সমেত গোটা কুয়োটা নিয়ে আসলে ভালো হয় না?"

"কী বললি! ঝরনা-সমেত গোটা কুয়ো?" গর্জন করে উঠল দৈত্য। কিন্তু আসলে সে ছিল বোকাসোকা। তাই বেশ ঘাবড়ে পড়ল। তার পর মনে-মনে বলল, 'ছোঁড়াটা শুধুই যে আপেল সেঁকতে পারে তা নয়। এর গায়ে দেখছি বেজায় জোর। মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা দানব আছে। হান্‌স্‌, হান্‌স্‌—সাবধান! এ তোমার উপযুক্ত চাকর নয়।' [দৈত্যের নাম ছিল হান্‌স্‌]।

দর্জি জল আনলে পর দৈত্য তাকে বলল বনে গিয়ে গোটা দুই গাছ কেটে বাড়ি নিয়ে যেতে। ক্ষুদে দর্জি বলল, "মাত্র গোটা দুই গাছ? এক কোপে পুরো বনটা সাবাড় করে আনলে ভালো হয় না?" এই-না বলে সে গেল কাঠ কাটতে।

দাড়ির মধ্যে থেকে হুংকার ছেড়ে দানব বলে উঠল, "হতভাগাটা বলে কী!—ঝরনা-সমেত কুয়ো, এক কোপে গোটা বন?" তার পর আগের চেয়েও ঘাবড়ে মনে-মনে বলল, 'হুঁ! ছোঁড়াটা বাস্তবিকই শুধু যে আপেল সেঁকতে পারে তা নয়। ওর মধ্যে একটা দানব যে লুকিয়ে আছে তাতে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হান্‌স্‌, হান্‌স্‌—সাবধান! এ তোমার উপযুক্ত চাকর নয়।'

দর্জি কাঠ আনলে পর দৈত্য তাকে বলল রাতের রান্নার জন্য গোটা

দুই-তিন বুনো শুয়োর মেরে আনতে। দর্জি প্রশ্ন করল, "এক গুলিতে হাজারটা বুনো শুয়োর মেরে কেন আনব না বলতে পার ?"

দৈত্য ছিল এমনিতেই ভীরু। এবার রীতিমতো ঘাবড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী বললি।—থাক, আজ আর তোকে কিছু করতে হবে না। ঘুমো গে যা।"

দৈত্য এমন ভয় পেয়েছিল যে, সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। কেবলই তার মনে হতে লাগল চাকরটা সাংঘাতিক জাদুকর। মাথায় তার একমাত্র চিন্তা—কী করে তাকে চট্‌পট্‌ বিদেয় করা যায়।

পরদিন সকালে দৈত্য আর দর্জি গেল একটা হ্রদে। সেটার চার দিকে ছিল অনেক উইলোগাছ। দৈত্য বলল, "শোন দর্জি, উইলো-গাছের একটা ডালে গিয়ে বোস্‌। আমি দেখতে চাই তোর ভারে ডালটা নুয়ে পড়ে কি না।" ক্ষুদে দর্জি নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব ভারী করার জন্য বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে চট্‌পট্‌ গিয়ে বসল একটা উইলো-গাছের ডালে। তার ভারে ডালটা পড়ল নুয়ে। কিন্তু নিশ্বাস ছেড়ে যেই-না আবার সে নিশ্বেস নিতে যাবে, ডালটা সজোরে খাড়া হয়ে উঠে দর্জিকে ছুঁড়ে দিল আকাশের এমন উঁচুতে যে, কেউ আর কখনো তার দেখা পায় নি। ব্যাপারটা দেখে দৈত্যের আনন্দ আর ধরে না।

দর্জি আবার মাটিতে পড়ে না থাকলে নিশ্চয়ই এখনো শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পেরেক

এক সওদাগর হাটে গিয়ে সমস্ত সওদা বেচে তার থলিগুলো ভরল সোনা আর রুপোর মুদ্রায়। রাতের আগে বাড়ি ফেরার জন্য থলিগুলো নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সে যাত্রা করল।

দুপুরে এক শহরে খানিক সে বিশ্রাম নিল। সেখান থেকে আবার যাত্রা করার সময় আস্তাবলের ছোকরা চাকর ঘোড়াটা এনে তাকে বলল, "কর্তা, ঘোড়াটার পেছনকার বাঁ পায়ের ক্ষুরের নালের একটা পেরেক নেই।"

সওদাগর বলল, "যেতে দে! আর তো মাত্র ছ মাইল পথ। তার মধ্যে নালটা নিশ্চয়ই খসে পড়বে না। এখন আমার ভীষণ তাড়া।"

বিকেলে আর একটা সরাইখানায় সে থামল ঘোড়াটাকে খাওয়াবার জন্য। সেখানকার আস্তাবলের ছোকরা চাকর তার ঘরে গিয়ে বলল, "কর্তা, আপনার ঘোড়ার পেছনকার বাঁ পায়ের নালটা খসে পড়েছে। তাকে কি কামারের কাছে নিয়ে যাব?"

সওদাগর বলল, "যেতে দে! আর তো মাত্র দু মাইল পথ। নাল ছাড়াই ঘোড়াটা যেতে পারবে। এখন আমার ভীষণ তাড়া।" এই-না বলে ঘোড়ায় চড়ে সে যাত্রা করল। কিন্তু খানিক পরে ঘোড়াটা গেল খোঁড়া হয়ে। কিছু পথ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে যাবার পর সেটার একটা পা ভেঙে গেল।

সওদাগর কী আর করে। ঘোড়াটাকে সেখানে ফেলে থলিগুলো নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি পৌঁছল অনেক রাতে।

তার পর বলল, "এই হতচ্ছাড়া পেরেকটার জন্যেই যত ঝামেলা। যত তাড়া থাকে তত দেরি হয় যেতে।"

কবরে গরিব ছেলে

এক সময় ছিল এক গরিব রাখাল ছেলে। তার বাবা-মা মারা যাবার পর খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্য হাকিম তাকে পাঠালেন এক বড়োলোকের বাড়িতে। কিন্তু সেই বড়োলোক আর তার বউয়ের এক রত্তি মায়া-দয়া ছিল না। অনেক ধনদৌলত থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল হাড়-কৃপণ। অন্য কেউ তাদের একটা টুকরো রুটি খেলেও তারা চটে যেত। গরিব রাখাল ছেলে খেতে পেত খুব কম, মার খেত খুব বেশি। একদিন তারা তাকে বলল একটা মুরগি আর সেটার ছানাগুলোকে পাহারা দিতে। কিন্তু বেড়া-ঝোপের একটা ফাঁক দিয়ে সেগুলো পালিয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাজপাখি ছোঁ মেরে মুরগিটাকে নিয়ে উড়ল আকাশে।

গলা ছেড়ে ছেলেটি চেঁচাতে লাগল, "চোর, চোর!" কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। বাজপাখি ফিরিয়ে দিল না মুরগিটাকে।

হৈচৈ শুনে বাড়ির কর্তা ছুটে বেরিয়ে এল। মুরগিটা খোয়া গেছে শুনে ছেলেটিকে এমন মার সে মারল যে, বেচারা দিন দুই নড়তে-চড়তে পারল না। তার পর থেকে মুরগি ছাড়াই তাকে পাহারা দিতে হত ছানাগুলোকে। কাজটা আরো কঠিন, কারণ ছানাগুলো কেবলই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ছেলেটা তাই ভাবল সরু দড়ি দিয়ে ছানাগুলোকে বেঁধে রাখলে ভালো হয়, তা হলে বাজপাখি তাদের আর চুরি করে পালাতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল তার ভাবনাটা খুবই ভুল।

দিন কয়েক পরে খুব দৌড়-ঝাঁপ করার দরুন বেজায় ক্ষিদে, ক্লান্তি আর অবসাদে একেবারে জেরবার হয়ে সে পড়ল ঘুমিয়ে, বাজপাখিটা আবার এসে ছো মেরে একটা ছানাকে নিয়ে পালাল। কিন্তু অন্য ছানাগুলোও সেটার সঙ্গে বাঁধা ছিল বলে সেগুলোকেও যেতে হল বাজ-পাখিটার সঙ্গে। তার পর গাছের একটা ডালে বসে একে একে সব ছানাগুলোকেই সাবাড় করল বাজপাখি। কর্তা বাড়ি ফিরে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ্য করে এমন নিষ্ঠুরভাবে ছেলেটিকে মারল যে বেচারি অনেকদিন বিছানা থেকে উঠতে পারল না।

ছেলেটির খাড়া হয়ে দাঁড়াবার শক্তি ফিরে এলে কর্তা তাকে বলল, "তুই ভারি বোকা। তোকে দিয়ে আমার রাখালির কাজ চলবে না। তোকে ফাইফরমাশ খাটার কাজ দেব।" এই-না বলে এক ঝুড়ি আঙুর আর তার সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে তাকে সে পাঠাল হাকিমের বাড়িতে। যেতে-যেতে ছেলেটি ক্ষিদে আর তেষ্টায় নিজেকে সামলাতে না পেরে দু ছড়া আঙুর খেয়ে ফেলল।

ঝুড়িটা সে হাকিমকে দিতে চিঠি পড়ে আঙুরের ছড়াগুলো গুণে তিনি বললেন, "দু ছড়া আঙুর কম দেখছি।"

ছেলেটি তাকে সরলভাবে সত্যি কথাটাই জানাল: ক্ষিদে-তেষ্টার জ্বালায় সেগুলো সে খেয়ে ফেলেছে।

কর্তাকে হাকিম চিঠি লিখে আদেশ দিলেন আগেরবার যত ছড়া পাঠিয়েছিল আবার তত ছড়া আঙুর পাঠাতে। আঙুর আর তার সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে আবার হাকিমের কাছে ছেলেটিকে পাঠাল সেই বড়োলোক।

এবারেও ক্ষিদে-তেষ্টার জ্বালা সামলাতে না পেরে ছেলেটিকে আগের বারের মতো আবার দু ছড়া আঙুর খেয়ে ফেলল। কিন্তু তার আগে ঝুড়ি থেকে চিঠিটা বার করে সে লুকিয়ে রাখল একটা পাথরের তলায়। কিন্তু হাকিম আবার-প্রশ্ন করলেন: দু ছড়া আঙুর কম কেন?

ছেলেটি বলল, "কী করে জানতে পারলেন? আমি তো চিঠিটা একটা পাথরের তলায় লুকিয়ে রেখে এসেছি।"

ছেলেটির সরলতা দেখে হাকিম হো-হো করে হেসে উঠলেন। তার পর কর্তাকে একটা চিঠি লিখে আদেশ দিলেন আরো ভালো করে ছেলেটির দেখাশোনা করতে আর তাকে পেট ভরে খেতে দিতে। সেই-

সঙ্গে শেখাতে—কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

নিষ্ঠুর কর্তা বলল, "এক্ষুনি তোকে সমঝে দিচ্ছি ভালো আর মন্দর তফাতটা। খেতে হলে তোকে কাজ করতে হবে। আর কাজে ভুল হলে খেতে হবে চড়-চাপড়!"

পরদিন ছেলেটিকে সে দিল খুব পরিশ্রমের কাজ। কর্তা তাকে ঘোড়ার জন্য দু আঁটি খড় কাটতে দিয়ে বলল, "পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরব। তার মধ্যে কুচিকুচি করে খড় কাটা না হলে এমন ঠেঙান ঠেঙাব যে, হাত-পা নাড়তে পারবি না।"

চাকর, ঝি আর বউকে নিয়ে কর্তা গেল হাটে। ছেলেটির জন্য রেখে গেল ছোট্টো এক টুকরো রুটি। বেঞ্চিতে বাস প্রাণপণ শক্তিতে ছেলেটি কাজ শুরু করে দিল। কাজ করতে-করতে খুব গরম লাগায় সে তার ছোট্টো কোটটা ছুঁড়ে ফেলল খড়ের উপর। সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার আতঙ্কে ঘ্যাঁষ্‌ঘ্যাঁষ্‌ করে সে খড় কেটে চলল আর তাড়াহুড়োয় সেইসঙ্গে কেটে ফেলল তার ছোট্টো কোটটা। নিজের ভুলটা যখন সে ধরতে পারল তখন আর করার কিছু নেই। কাঁদতে -কাঁদতে আপন মনে সে বলে চলল, 'হায়-হায়! আমার আর নিস্তার নেই। কী করেছি ফিরে এসে দেখার পর কর্তা আমায় পিটিয়ে মেরে ফেলবেন। তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভালো।'

কর্তার বউকে ছেলেটি একদিন বলতে শুনেছিল, "আমার খাটের তলায় এক বোয়েম বিষ আছে।" কিন্তু কথাটা সে বলেছিল যাতে কেউ সেটা না খায়। আসলে বোয়েমটার মধ্যে ছিল মধু। ছেলেটি গুঁড়ি মেরে খাটের তলায় সেঁধিয়ে বোয়েম বার করে সব মধু খেয়ে ফেলল।

তার পর সে বলল, "লোকে বলে মৃত্যু ভারি তেতো। কিন্তু আমি তো দেখছি মৃত্যু ভারি মিষ্টি। এ-কারণেই নিশ্চয় গিন্নিমা প্রায়ই বলেন—তিনি মরতে চান।" এই-না বলে ছোট্টো একটা চেয়ারে বসে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। কিন্তু মধু খাবার ফলে দুর্বল বোধ করার বদলে সে টের পেল তার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে।

খানিক পরে ছেলেটি বলে উঠল, "নিশ্চয়ই এটা বিষ নয়। কিন্তু কর্তা একবার বলেছিলেন তাঁর কাপড়ের আলমারিতে ছোট্টো এক বোতল মাছি-মারা বিষ আছে। সেটা খেলে নিশ্চয়ই মরব।" কিন্তু আসলে

সেটা মাছি-মারা বিষ নয়। বোতলের মধ্যে ছিল হাঙ্গেরি দেশের মদ। ছেলেটি বোতলটা বার করে শেষ করল।

তার পর সে বলল, "এই মৃত্যুটাও মিষ্টি দেখছি!" কিন্তু খানিক বাদেই মদের নেশায় তার মাথা ঘুরতে শুরু করল, ভাবনাগুলো হয়ে যেতে লাগল এলোমেলো। তাই মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ভেবে সে বলে উঠল, "মরতেই যখন বসেছি তখন গির্জের আঙিনায় গিয়ে একটা কবর খুঁজে নেওয়া যাক।" এই-না বলে টলতে-টলতে গির্জের আঙিনায় গিয়ে কিছু আগে খোঁড়া একটা কবরের মধ্যে সে-শুয়ে পড়ল। তার পর ক্রমশ সব-কিছু তার যেতে লাগল গুলিয়ে।

কাছেই ছিল একটা সরাইখানা। সেখানে এক বিয়ের উৎসব চলছিল। গান-বাজনা শুনতে শুনতে ছেলেটির মনে হল সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে! তার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছেলেটির ঘুম আর ভাঙল না। তার দেহের মধ্যে ছিল মদের উত্তাপ আর বাইরে ছিল রাতের ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস। তাই সে মরে গেল—শুয়েই রইল কবরের মধ্যে।

ছেলেটির মৃত্যুর খবর পেয়ে কর্তা গেল ভীষণ ঘাবড়ে। কারণ সে ভেবেছিল তার বিচার হবে। ভীষণ ভয় পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। উনুনের সামনে তার বউ দাঁড়িয়েছিল হাতে এক বাটি মোম নিয়ে। বরকে উঠতে সাহায্য করার জন্য সে ছুটে গেল। কিন্তু সেই মোমের বাটিতে গেল আগুন ধরে আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে বাড়িটা পুড়ে হল ছাই। ফলে বাকি জীবন তারা শুধু তীব্র অনুতাপ করেই কাটাল না, কাটাল দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যেও।

সঙ্গে শেখাতে—কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

নিষ্ঠুর কর্তা বলল, "এক্ষুনি তোকে সমঝে দিচ্ছি ভালো আর মন্দর তফাতটা। খেতে হলে তোকে কাজ করতে হবে। আর কাজে ভুল হলে খেতে হবে চড়-চাপড়।"

পরদিন ছেলেটিকে সে দিল খুব পরিশ্রমের কাজ। কর্তা তাকে ঘোড়ার জন্য দু আঁটি খড় কাটতে দিয়ে বলল, "পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরব। তার মধ্যে কুচিকুচি করে খড় কাটা না হলে এমন ঠেঙান ঠেঙাব যে, হাত-পা নাড়তে পারবি না।"

চাকর, ঝি আর বউকে নিয়ে কর্তা গেল হাটে। ছেলেটির জন্য রেখে গেল ছোট্টো এক টুকরো রুটি। বেঞ্চিতে বসে প্রাণপণ শক্তিতে ছেলেটি কাজ শুরু করে দিল। কাজ করতে-করতে খুব গরম লাগায় সে তার ছোট্টো কোটটা ছুঁড়ে ফেলল খড়ের উপর। সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার আতঙ্কে ঘ্যাঁষ্‌ঘ্যাঁষ্‌ করে সে খড় কেটে চলল আর তাড়াহুড়োয় সেইসঙ্গে কেটে ফেলল তার ছোট্টো কোটটা। নিজের ভুলটা যখন সে ধরতে পারল তখন আর করার কিছু নেই। কাঁদতে-কাঁদতে আপন মনে সে বলে চলল, 'হায়-হায়! আমার আর নিস্তার নেই। কী করেছি ফিরে এসে দেখার পর কর্তা আমায় পিটিয়ে মেরে ফেলবেন। তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভালো।'

কর্তার বউকে ছেলেটি একদিন বলতে শুনেছিল, "আমার খাটের তলায় এক বোয়েম বিষ আছে।" কিন্তু কথাটা সে বলেছিল যাতে কেউ সেটা না খায়। আসলে বোয়েমটার মধ্যে ছিল মধু। ছেলেটি গুঁড়ি মেরে খাটের তলায় সেঁধিয়ে বোয়েম বার করে সব মধু খেয়ে ফেলল।

তার পর সে বলল, "লোকে বলে মৃত্যু ভারি তেতো। কিন্তু আমি তো দেখছি মৃত্যু ভারি মিষ্টি। এ-কারণেই নিশ্চয় গিন্নিমা প্রায়ই বলেন—তিনি মরতে চান।" এই-না বলে ছোট্টো একটা চেয়ারে বসে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। কিন্তু মধু খাবার ফলে দুর্বল বোধ করার বদলে সে টের পেল তার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে।

খানিক পরে ছেলেটি বলে উঠল, "নিশ্চয়ই এটা বিষ নয়। কিন্তু কর্তা একবার বলেছিলেন তাঁর কাপড়ের আলমারিতে ছোট্টো এক বোতল মাছি-মারা বিষ আছে। সেটা খেলে নিশ্চয়ই মরব।" কিন্তু আসলে

সেটা মাছি-মারা বিষ নয়। বোতলের মধ্যে ছিল হাঙেরি দেশের মদ। ছেলেটি বোতলটা বার করে শেষ করল।

তার পর সে বলল, "এই মৃত্যুটাও মিষ্টি দেখছি!" কিন্তু খানিক বাদেই মদের নেশায় তার মাথা ঘুরতে শুরু করল, ভাবনাগুলো হয়ে যেতে লাগল এলোমেলো। তাই মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ভেবে সে বলে উঠল, "মরতেই যখন বসেছি তখন গির্জের আঙিনায় গিয়ে একটা কবর খুঁজে নেওয়া যাক।" এই-না বলে টলতে-টলতে গির্জের আঙিনায় গিয়ে কিছু আগে খোঁড়া একটা কবরের মধ্যে সে-শুয়ে পড়ল। তার পর ক্রমশ সব-কিছু তার যেতে লাগল গুলিয়ে।

কাছেই ছিল একটা সরাইখানা। সেখানে এক বিয়ের উৎসব চলছিল। গান-বাজনা শুনতে শুনতে ছেলেটির মনে হল সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে! তার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছেলেটির ঘুম আর ভাঙল না। তার দেহের মধ্যে ছিল মদের উত্তাপ আর বাইরে ছিল রাতের ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস। তাই সে মরে গেল—শুয়েই রইল কবরের মধ্যে।

ছেলেটির মৃত্যুর খবর পেয়ে কর্তা গেল ভীষণ ঘাবড়ে। কারণ সে ভেবেছিল তার বিচার হবে। ভীষণ ভয় পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। উনুনের সামনে তার বউ দাঁড়িয়েছিল হাতে এক বাটি মোম নিয়ে। বরকে উঠতে সাহায্য করার জন্য সে ছুটে গেল। কিন্তু সেই মোমের বাটিতে গেল আগুন ধরে আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে বাড়িটা পুড়ে হল ছাই। ফলে বাকি জীবন তারা শুধু তীব্র অনুতাপ করেই কাটাল না, কাটাল দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যেও।

টাকু, মাকু আর ছুঁচ

এক তরুণী খুব ছেলেবেলায় তার-মাকে হারিয়েছিল। গ্রামের শেষ প্রান্তে ছোটো এক কুঁড়েঘরে সে থাকত তার ধর্মমার সঙ্গে। সেই ভালোমানুষ বুড়ি সংসার চালাত তার টাকু, মাকু আর ছুঁচের সাহায্যে। অনাথা মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে এনে সে মানুষ করেছিল। তাকে কাজ শিখিয়েছিল আর শিখিয়েছিল ঈশ্বরকে ভয়-ভক্তি করতে।

মেয়েটির যখন বছর পনেরো বয়েস তার বুড়ি ধর্মমা অসুখে পড়ে মেয়েটিকে তার বিছানার পাশে ডেকে বলল, "বাছা, বুঝতে পারছি আমার আর বেশিক্ষণ নেই। এই কুঁড়েঘরটাই তোকে দিয়ে গেলাম। ঝড়বৃষ্টি থেকে এটা তোকে বাঁচাবে। তোকে আরো দিয়ে গেলাম আমার টাকু, মাকু আর ছুঁচ। তাদের সাহায্যে তুই রোজগার করতে পারবি।" তার পর মেয়েটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে সে বলল, "সব সময় সৎপথে থাকিস। তা হলেই জীবনে আনন্দ পাবি।" কথাগুলো বলে বুড়ি চিরকালের মতো চোখ বুজল। ধর্মমার কফিনের পাশে বসে মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে তার শেষ কর্তব্য কাজগুলো করে গেল।

তার পর থেকে সে একা থাকে। কাপড় বোনে, সুতো কাটে আর সেলাই করে। ভালোমানুষ বুড়ির আশীর্বাদে তার কোনো আপদ-বিপদ ঘটে না। দেখে মনে হত যেন তার মজুত শণ আর তুলোর শেষ নেই। জামা-কাপড় বানাবার সঙ্গে-সঙ্গেই খদ্দের এসে ভালো দাম দিয়ে সেগুলো কিনে নিত। তাই কখনো সে অভাবে তো পড়তই না, উপরন্তু গরিব-দুঃখীকে দেবার মতো বাড়তি পয়সাকড়ি সব সময়েই

তার হাতে থাকত।

সেই সময় রাজপুত্র বেরুল কনের খোঁজে। গরিব মেয়েকে পছন্দ করা তার নিষেধ, এদিকে ধনী মেয়ে তার পছন্দ নয় তাই সে ঘোষণা করল এমন মেয়েকে বিয়ে করবে—যে সব চেয়ে গরিব আর সব চেয়ে ধনী। যে-গ্রামে তরুণী মেয়েটি থাকত সেখানে পৌঁছে যথারীতি সে বলল সেখানকার সব চেয়ে গরিব আর সব চেয়ে ধনী মেয়ের কাছে তাকে নিয়ে যেতে। সব চেয়ে ধনী মেয়েকে চট্‌পট্‌ খুঁজে পাওয়া গেল। আর লোকে জানাল গ্রামের শেষপ্রান্তে কুঁড়েঘরে যে-মেয়েটি থাকে নিঃসন্দেহে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে গরিব।

রাজপুত্র পথ দিয়ে যাবার সময় ধনী মেয়ে সব চেয়ে ভালো পোশাক পরে বসেছিল তার দোড়গোড়ায়। রাজপুত্রকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ধনী মেয়ে তাকে অভিবাদন করল। কিন্তু তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে কোনো কথা না বলে রাজপুত্র চলে গেল। তার পর সে পৌঁছল গরিব মেয়ের কুঁড়েঘরে। মেয়েটি দোরগোড়ায় ছিল না। নিজের ঘরে দোর দিয়ে সে কাজ করছিল। রাজপুত্র জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাল। এক-ফালি রোদ তখন সেই ঘর আলো করে ছিল। রাজপুত্র দেখল চরকার সামনে এক মনে মেয়েটি সুতো কেটে চলেছে। মেয়েটি কিন্তু আড়-চোখে লক্ষ্য করেছিল রাজপুত্র তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাই লজ্জায় টুকটুকে হয়ে হয়ে উঠল তার মুখ। কিন্তু সুতো কাটা সে থামাল না। মুখ নিচু করে সে চলল চরকা কেটে—অবশ্য এ কথা হলফ করে বলতে পারব না যে, তখন যে সুতো সে কাটছিল সেগুলো সরু-মোটা হচ্ছিল না। রাজপুত্র যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে সুতো কেটে চলল আর রাজপুত্র চলে যেতেই দৌড়ে গিয়ে জানলা খুলে মেয়েটি বলল, "উঃ, কী গরম!" আর তার পর রাজপুত্রের টুপির পালকটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেটার দিকে রইল তাকিয়ে।

তার পর আবার সে গিয়ে বসল সুতো কাটতে। কিন্তু বুড়ি ধর্মমাকে প্রায়ই যে-ছড়াটা গুন্‌গুন্‌ করতে সে শুনেছিল সেটা মনে পড়ে যেতে সে গাইতে শুরু করে দিল:

"টাকু, ঘুর্‌ঘুর্‌ ঘুরে যা।
মনের মানুষ আন গে যা!"

আর তার পর হল কী, জানো? হঠাৎ তার হাত থেকে লাফিয়ে উঠে এক ছুটে টাকু বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। ভীষণ অবাক হয়ে মেয়েটি তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। নাচতে-নাচতে ছুটতে-ছুটতে টাকু চলল মাঠের মধ্যে দিয়ে। তার পিছনে পড়ে রইল সোনার সুতো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা চলে গেল মেয়েটির দৃষ্টির বাইরে। টাকু না থাকায় মেয়েটি তার মাকু নিয়ে কাপড় বুনতে বসল।

ছুটতে-ছুটতে সব সুতো খুলে যেতে রাজপুত্রের নাগাল ধরে ফেলল টাকু। রাজপুত্র অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কী কাণ্ড! টাকু দেখছি আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চায়! এই-না বলে সোনার সুতো ছড়ানো পথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে সে ফিরে চলল। মেয়েটি কাজ করতে করতে তখন গেয়ে চলেছে:

"ছোট্ রে মাকু ছোট্ রে,
বন্ধুকে নিয়ে আয় রে।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাকু তার হাত থেকে লাফিয়ে তুড়ি-লাফ দিতে-দিতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। কিন্তু চৌকাঠ পেরিয়েই সেটা বুনতে শুরু করে দিল এমন সুন্দর একটা গালচে যা কেউ কখনো দেখে নি। সেই গালচের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল নানা বিচিত্র নক্শা—পাতার মধ্যে খরগোশ লাফাচ্ছে, পাতার আড়াল থেকে হরিণ আর কাঠবিল্লি তাকাচ্ছে, গাছের ডালে ডালে হাজার রঙের পাখি বসে আছে। মাকু ছুটে চলল আর চোখের নিমেষে গালচেটাও হয়ে উঠতে লাগল লম্বা।

মাকুকে হারিয়ে মেয়েটি তার ছুঁচ বার করে গাইতে শুরু করল:

"দ্যাখ রে ছুঁচ আসছে সে,
ঘর-দুয়োর নিকিয়ে দে।"

মেয়েটির আঙুলের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুঁচটা ঘরময় ছুটোছুটি করতে শুরু করে দিল। মনে হল ক্ষুদে-ক্ষুদে অদৃশ্য পরীর দল যেন ঘর সাজাবার ভার নিয়েছে! দেখতে-দেখতে টেবিল আর বেঞ্চি ঢেকে গেল নানা কারুকাজ-করা কাপড়ে, চেয়ার ঢাকা পড়ল মখমলে আর দেয়ালে-দেয়ালে ঝুলতে লাগল রেশমের পরদা।

ছুঁচটা শেষ-ফোঁড় দিতে-না-দিতেই রাজপুত্রের টুপির সাদা পালকটা

জানলার পাশ দিয়ে যেতে দেখল মেয়েটি। রাজপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিল সোনার সুতো। গালচেটার উপর দিয়ে ঘরের মধ্যে এল রাজপুত্র। আর তার পর মেয়েটিকে দেখল—তখনো তার পরনে গরিব লোকের পোশাক। কিন্তু ঘরের সুন্দর-সুন্দর জিনিসগুলোর মধ্যে, ঝোপের বুনো-গোলাপের মতোই মেয়েটি তখন ঝল্‌মল্‌ করছে।

রাজপুত্র চেঁচিয়ে উঠল, "তুমিই আসলে সব চেয়ে গরিব আর সব চেয়ে ধনী। এসো, তুমিই হবে আমার বউ। কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মেয়েটিকে চুমু খেয়ে রাজপুত্র তুলে নিল নিজের ঘোড়ায়। তার পর তাকে নিয়ে পৌঁছল রাজসভায়। আর তার পর? তার পর তাদের বিয়ে হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে।

আর সেই টাকু, মাকু আর ছুঁচ?—তারা সযত্নে আছে রাজার খাজাঞ্চি খানায়।

ওল্ড রিংকর‍্যাংক

এক সময় এক রাজার এক মেয়ে ছিল। ফরমাশ দিয়ে একটা কাঁচের পাহাড় বানিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "পাহাড়টায় যে হেঁটে উঠতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব।"

এক অমাত্যকে রাজকন্যের খুব পছন্দ ছিল। রাজার কাছে গিয়ে সে জানাল, রাজকন্যেকে বিয়ে করতে চায়।

রাজা বললেন, "কাঁচের পাহাড়টায় হেঁটে উঠতে পারলে নিশ্চয়ই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

রাজকন্যে বলল তার সঙ্গে সেও যাবে, অমাত্য পিছলে পড়লে তাকে সে ঠেলে তুলবে।

একসঙ্গে তারা শুরু করল পাহাড়ে চড়তে। পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে রাজকন্যে পা হড়কে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কাঁচের পাহাড় ফাঁক হয়ে গেল আর রাজকন্যে হল অদৃশ্য।

ভাবী বর সর্বত্র রাজকন্যেকে খুঁজল। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। পাহাড়ের যেখানটা ফাঁক হয়ে ছিল সেখানটা সে দেখতে পেল না। কারণ সঙ্গে-সঙ্গে জায়গাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাজা আর ভাবী বর রাজকন্যের জন্য খুব কান্নাকাটি করল। রাজা আদেশ দিলেন পাহাড়টাকে সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে ফেলতে। তাঁর আশা ছিল তা হলে হয়তো রাজকন্যের খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু পাহাড়ের তলায় রাজকন্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

এদিকে রাজকন্যে গিয়ে পড়েছিল খুব গভীর একটা খাদে।

সেখানে তার সঙ্গে এক বুড়োর দেখা। বুড়োর মস্ত লম্বা পাকা দাড়ি।

রাজকন্যেকে সে বলল, "আমার দাসী হয়ে মুখ বুজে কাজ করতে রাজি থাকলে তবেই তুমি বাঁচবে। নইলে মরবে।"

রাজকন্যে রাজি হয়ে গেল। হাসিমুখে করতে লাগল তার সব কাজ—রান্না করা, বাসন মাজা, বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া, ইত্যাদি।

রাতে রাশিরাশি সোনা-রুপো নিয়ে বুড়ো বাড়ি ফিরত।

বেশ কয়েক বছর তার কাছে চাকরি করার পর বুড়ো একদিন রাজকন্যেকে বলল, "তোমাকে আমি ডাকব মাদাম রোজি-চিক (গোলাপী-গাল), আমাকে তুমি ডেকো ওল্ড রিংকর‍্যাংক বলে।"

একদিন বুড়ো যখন বেরিয়েছে রাজকন্যে বাসন-কোসন মেজে, বিছানা পেতে একটা ছোট্টো চোরা-দরজা ছাড়া আর সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিল।

ওল্ড রিংকর‍্যাংক ফিরে দরজা ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "মাদাম রোজি-চিক, দরজা খোলো!" রাজকন্যে বলল, "না ওল্ড রিংকর‍্যাংক দরজা খুলব না!"

তাই শুনে বুড়ো ছড়া কেটে চেঁচিয়ে উঠল :

"সোনার পায়ে ভর দিয়ে
ওল্ড রিংকর‍্যাংক দাঁড়িয়ে।
মাদাম রোজি-চিক, আমার বাসন-কোসন মেজেছ?

রাজকন্যে বলল, "হ্যাঁ, মেজেছি।"

বুড়ো আবার ছড়া কেটে চেঁচিয়ে উঠল :

"সোনার পায়ে ভর দিয়ে
ওল্ড রিংকর‍্যাংক দাঁড়িয়ে।
মাদাম রোজি-চিক, আমার বিছানা পেতেছ?"

রাজকন্যে বলল, "হ্যাঁ, পেতেছি।"

বুড়ো আবার ছড়া কেটে চেঁচিয়ে উঠল :

"সোনার পায়ে ভর দিয়ে
ওল্ড রিংকর‍্যাংক দাঁড়িয়ে।

মাদাম রোজি-চিক, দরজা খোলো।"

ছোট্টো চোরা-দরজাটা খোলা আছে কি না দেখার জন্য তার পর সে গেল বাড়ির পিছন দিকে আর দরজাটা খোলা দেখে সে ঢোকাল তার লম্বা পাকা দাড়ি।

তাই-না দেখে পা টিপে-টিপে গিয়ে খুট্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল রাজকন্যে। দাড়ি আটকাতে বুড়ো রিংকর‍্যাংক হাউমাউ করে চেঁচাতে-চেঁচাতে দরজাটা খুলে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল।

রাজকন্যে বলল, "এক শর্তে খুলে দেব—যে-মই বেয়ে পৃথিবীতে ওঠো সেটা কোথায় রেখেছ যদি বল।"

বুড়ো প্রথমে কিছুতেই বলতে চাইল না। কিন্তু চোরা-দরজা থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় নেই দেখে শেষটায় বলতে বাধ্য হল।

বুড়ো রিংকর‍্যাংকের দাড়ি শক্ত করে চোরা-দরজার সঙ্গে বেঁধে মইটা এনে যে-গর্ত দিয়ে নীচে এসেছিল সেই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে রাজকন্যে ফিরে গেল তার বাবার কাছে।

তাকে দেখে তার বাবা আর ভাবী বর খুব খুশি হল। রাজার আদেশে সেই খাদের গর্তটা খুঁড়ে বুড়ো রিংকর‍্যাংককে মেরে নিয়ে আসা হল তার সমস্ত সোনা আর রুপো।

আর তার পর মহা সমারোহে রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে হল সেই অমাত্যের। আর তার পর থেকে তারা রইল সুখে-শান্তিতে।

চাষী আর শয়তান

এক সময় এক ক্ষুদে চাষী ছিল। ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। তার সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো চলতি গল্পটা হচ্ছে—বুদ্ধির জোরে স্বয়ং শয়তানকে একবার সে বোকা বানিয়েছিল।

গল্পটা এই :

একদিন চাষী তার ক্ষেতের কাজ সেরে গোধূলির সময় বাড়ি যাবার তোড়জোড় করছে এমন সময় তার একটা ক্ষেতের মাঝখানে দেখে এক গাদা গরম গন্‌গনে লাল কয়লা।

ভীষণ অবাক হয়ে ব্যাপারটা কী জানার জন্য সেখানে গিয়ে সে দেখে ছোট্টো কালো একটা শয়তান কয়লাগুলোর মধ্যে বসে রয়েছে। চাষী মন্তব্য করল, "তুমি যে দেখছি ধনদৌলতের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসে।"

শয়তান উত্তর দিল, "তাইতো আছিই। এই কয়লাগুলোর নীচে এত সোনা রুপো আছে যা জীবনে তুমি দেখ নি।"

চাষী বলল, "সোনা-রুপো যখন আমার ক্ষেতে, তখন সেগুলো আমার।"

শয়তান বলল, "তোমার ক্ষেতের দু বছরের ফসলের অর্ধেকটা আমায় দিলে ওগুলো তোমার হবে। আমার টাকাকড়ির অভাব নেই। কিন্তু আমি চাই মাটির তাজা-তাজা ফসল।"

তার কড়ারে ক্ষুদে চাষী রাজি হয়ে গেল। কিন্তু এইটুকু যোগ করে দিল, "যাতে ভাগাভাগি নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো ঝামেলা না বাধে তাই

বলে রাখি—জমির উপরে যেটা জন্মাবে সেটা তোমার। জমির নীচেকার ফসল নেব আমি।"

এই বন্দোবস্তয় শয়তান রাজি হয়ে গেল। কিন্তু ধূর্ত চাষী পুঁতেছিল শালগম।

ফসল কাটার সময় হতে শয়তান এল তার ফসল নিতে। কিন্তু এসে দেখে ক্ষেতে রয়েছে শুকনো হলদেটে কতগুলো পাতা। ক্ষুদে চাষী মনের আনন্দে মাটি খুঁড়ে তার ভাগের শালগমগুলো তুলে নিল। শয়তান বলল, "এবার তুমি জিতলে বটে। কিন্তু দ্বিতীয়বার এটা ঘটতে দেব না। ভবিষ্যতে তুমি পাবে মাটির ওপর যেটা জন্মায়, আমি নেব মাটির তলা-কার ফসল।"

চাষী বলল, "খুব ভালো কথা।" কিন্তু ফসল বোনবার সময় আসতে শালগমের বদলে চাষী বুনল জই।

আবার ফসল কাটার সময় আসতে চাষী গিয়ে গোড়া পর্যন্ত তার জই কেটে নিল। শয়তান এসে যখন দেখল কাটা-জইয়ের শেকড় ছাড়া তার ভাগে আর কিছু নেই তখন ভীষণ রেগে দৌড়ে সে চলে গেল পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে। আর চাষী গিয়ে বার করে নিল তার ধনদৌলত।

রুটির টুকরো

মোরগ তার সোহাগের মুরগিকে বলল "গিন্নিমা পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন। চলো, খাবার ঘরের টেবিল থেকে রুটির টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে খাওয়া যাক।"

মুরগি বলল, "না, আমি যাব না। তুমি তো জানো বাড়ির মধ্যে আমাদের যাওয়া মোটেই তিনি পছন্দ করেন না।"

মোরগ বলল, "আমরা যে ভেতরে গিয়েছিলাম তা তিনি টেরই পাবেন না। গিন্নিমা তো কখনোই আমাদের ভালো-ভালো টুকরো-টাকরা দেন না। কাজটা যে খুব খারাপ করেন তা তো তুমি মানবে।" মুরগি মাথা নাড়িয়ে বলল, "না-না, গিন্নিমা বেরিয়েছেন বটে। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ফিরতে পারেন। ফলে আমরা ধরা পড়ে যাব।"

কিন্তু মোরগ খুব ঝুলোঝুলি করতে শেষটায় মুরগি রাজি হল। খাবার ঘরে গিয়ে টেবিল থেকে তারা খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করল রুটির টুকরোগুলো। ঐ সময় বলা নেই কওয়া নেই গিন্নিমা ফিরলেন। তাদের খেতে দেখে ভীষণ রেগে একটা লাঠি নিয়ে তাদের তিনি ঘর থেকে তাড়ালেন।

বাইরে উঠোনে পৌঁছে মোরগকে মুরগি বলল, "কেমন, বলি নি?"

কিন্তু দুষ্টু মোরগ হেসে বলল, "কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ।"

ফসলের শীষ

বহুকাল আগে ভগবান যিশু যখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতেন এখন-কার চেয়ে তখন দশগুণ বেশি ফসল ফলত। তখন ফসলের গাছে শীষ ধরত শেকড় থেকে চুড়ো পর্যন্ত। গাছের মতোই দীর্ঘ হত শীষগুলো। ঐরকম প্রাচুর্যের মধ্যে থাকার সময় ঈশ্বরের করুণার কথা মানুষের মনে ছিল না। মূর্খের মতো প্রায়ই তখন তারা নানা কাজ করত।

একদিন এক মা তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে গমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে-যেতে একটা খোঁদলে পড়ে মেয়েটির ফ্রক কাদা মাখামাখি হয়ে গেল। মেয়ের মা একমুঠো সুন্দর গমের শীষ ছিঁড়ে সেটা দিয়ে ঘষে ঘষে ফ্রকটা পরিষ্কার করতে শুরু করল।

ভগবান যিশু তখন সেদিকে আসছিলেন ব্যাপারটা দেখে ভীষণ রেগে তিনি বললেন, "এর পর থেকে ফসল-গাছে শীষ ধরবে না। মানুষ আর স্বর্গের অকৃপণ দানের যোগ্য নয়।"

আশপাশের লোক তাঁর কথা শুনে ভীষণ ভয় পেল। নতজানু হয়ে বসে মিনতি করে তারা বলল—তিনি যেন আদেশ দেন মানুষের জন্য না হলেও অন্তত অসহায় মুরগি-ছানাদের জন্য ফসল গাছের চুড়োয় যেন শীষ ধরে।

ভগবান যিশু তাদের কাতর আবেদনের যুক্তি মেনে করুণা করে সেই আদেশ দিলেন। তাই এখনকার মতো সেদিন থেকে ফসল গাছের শুধু চুড়োয় শীষ ধরে আসছে।

স্ফটিকের বল

এক সময় এক ডাইনির ছিল তিন ছেলে। তিন ভাইয়েরই খুব ভাব। বুড়ি কিন্তু তাদের মোটেই বিশ্বাস করত না। ভাবত, তারা তার তুক্‌তাক্‌ শিখে ফেলবে। ফলে তার আর ডাইনির ক্ষমতা থাকবে না। তাই বড়ো ছেলেকে সে করে দিল ঈগল। সে থাকত একটা পাহাড়ে। মাঝে মাঝে তাকে দেখা যেত আকাশের অনেক উঁচুতে অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ঘুরতে। মেজো ছেলেকে সে করে দিল তিমি। গভীর সমুদ্রে সে থাকত। মাঝে মাঝে তাকে দেখা যেত দারুণ তোড়ে ফোয়ারার মতো করে আকাশে জল ছুঁড়তে। তারা প্রত্যেকে দিনে মাত্র দু ঘণ্টার জন্য ফিরে পেত মানুষের শরীর। ছোটো ছেলের ভয় হল তার ডাইনি-মা তাকে হয়তো ভালুক বা নেকড়ের মতো কোনো জন্তু করে দিতে পারে। তাই চুপিচুপি সে বাড়ি থেকে পালাল। সে শুনেছিল স্বর্ণ-সূর্য-কেল্লায় এক জাদুমুগ্ধ রাজকন্যে মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু তাকে মুক্তি দিতে গেলে প্রাণ হারবার ভয়। সে-চেষ্টা করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই তেইশজন তরুণ অকালে মারা পড়েছে, মাত্র আর একজনকে চেষ্টা করতে দেওয়া হবে। ছোটো ছেলের ভয়-ডর বলে কিছু ছিল না। তাই সে স্থির করল স্বর্ণ-সূর্য-কেল্লা খুঁজে বার করবে। বহুকাল সে নানা জায়গায় ঘুরল। কিন্তু কেল্লাটা খুঁজে পেল না। শেষটায় সে পৌঁছল গহন এক বনে আর সেখানে গিয়ে বেরুবার পথ সে ফেলল হারিয়ে। হঠাৎ সে দেখে দূর থেকে দুই দৈত্য হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। তাদের কাছে পৌঁছতে তারা বলল, "একটা টুপি নিয়ে আমরা

মারামারি করছি। কিন্তু আমাদের দুজনের গায়েই সমান শক্তি। তাই কেউ কাউকে হারাতে পারছি না। আমাদের চেয়ে ক্ষুদে মানুষরা অনেক চালাক। তাই ব্যাপারটার মীমাংসার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।"

তরুণ প্রশ্ন করল, "তুচ্ছ একটা টুপি নিয়ে মারামারি করছ কেন?"

"এই টুপিটার গুণ তুমি জানো না। এটা মাথায় দিয়ে যেখানে যেতে ইচ্ছে করবে সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যাবে।"

তরুণ বলল, "টুপিটা আমাকে দাও। সেটা নিয়ে আমি খানিক দূরে যাচ্ছি। আমি যখন বলব দুজনেই তোমরা যত জোরে পার ছুটো। আগে যে আমার কাছে পৌঁছবে সে-ই টুপিটা পাবে।" এই-না বলে টুপিটা মাথায় দিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু রাজকন্যের কথা ভাবতে-ভাবতে দৈত্যদের কথা একেবারে ভুলে সে হেঁটেই চলল। শেষটায় গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে বলে উঠল, "স্বর্ণ-সূর্য-কেল্লায় যদি পৌঁছতে পারতাম!" আর কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরুতে-না-বেরুতে সে দেখে উঁচু একটা পাহাড়ের উপর একটা কেল্লার সিংহদ্বারের সামনে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেল্লাটার মধ্যে গিয়ে সব ঘর খুঁজতে-খুঁজতে শেষ ঘরটায় সে দেখে রাজকন্যে রয়েছে। কিন্তু রাজকন্যেকে দেখে সে আঁতকে উঠল। তার মুখের রঙ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, তাতে অসংখ্য রেখা, চোখদুটো নিষ্প্রভ আর চুলগুলো লাল। চেঁচিয়ে সে প্রশ্ন করল, "তুমিই সেই রাজকন্যে দেশবিদেশে যার রূপের খ্যাতি?"

রাজকন্যে বলল, "এটা আমার আসল চেহারা নয়। মানুষের চোখে আমি এইরকমই কুৎসিত। কিন্তু ঐ আয়নাটার মধ্যে আমার চেহারা দেখো। আয়নাটা কখনো ভুল করে না। তাতে আমার আসল চেহারা দেখতে পাবে।" তরুণের হাতে আয়নাটা সে দিল। তাতে তরুণ দেখে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে রূপসী মেয়ের প্রতিচ্ছায়া, মনের দুঃখে তার দু গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

তরুণ বলল, "তোমাকে কী করে জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়। মনে রেখো সবরকম চেষ্টাই আমি করব। কোনো বিপদকে আমি ভয় করি না।"

রাজকন্যে বলল, "স্ফটিকের একটা বল আছে। সেই বলটা জাদুকরের সামনে ধরলেই তার জাদুর প্রভাব মিলিয়ে যাবে আর আমি

ফিরে পাব আমার আসল চেহারা। অনেকেই স্ফটিকের সেই বলটা আনতে গিয়ে মারা পড়েছে। তরুণ, তুমি সে-চেষ্টা করলে ভীষণ বিপদে পড়বে। তখন অনুশোচনায় তোমার মন ভরে উঠবে।"

তরুণ বলল, "কোনোরকম বিপদের ভয়ে আমি পিছব না। শুধু বলো আমাকে কী করতে হবে।"

রাজকন্যে বলে চলল, "এই পাহাড়টার আরো ওপরে উঠলে সব-কিছু জানতে পারবে। দেখবে নীচেকার ঝরনার মধ্যে একটা বুনো ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। সেটার সঙ্গে তোমায় লড়তে হবে। কপালজোরে সেটাকে মেরে ফেলতে পারলে তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে আগুনের একটা পাখি। পাখিটার শরীরের মধ্যে আছে একটা গন্‌গনে গরম ডিম। সেই ডিমের কুসুমটাই স্ফটিকের বল। নেহাত বাধ্য না হলে পাখি কিন্তু ডিমটা ফেলবে না আর ডিমটা মাটিতে পড়লেই জ্বলে উঠে আশেপাশের সব-কিছু পুড়িয়ে ফেলবে। সেইসঙ্গে ডিমটাও যাবে গলে, তার মধ্যেকার স্ফটিকের বলটাও। ফলে তোমার বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটাই সার হবে।"

ঝরনাটার কাছে তরুণ পৌঁছতে হুংকার ছেড়ে ষাঁড়টা তেড়ে এল। অনেকক্ষণ লড়াই করার পর শেষপর্যন্ত তরুণ ষাঁড়ের পেটের মধ্যে তার তরোয়াল ফেলল গেঁথে। ফলে সেটা মরে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীর থেকে আগুনের পাখি বেরিয়ে উড়ে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার যে-ভাই ঈগল সে তখন উড়ছিল মেঘের মধ্যে। মেঘের মধ্যে থেকে ঈগল সোঁ করে পাখিটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সমুদ্রে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে তাকে ক্রমাগত চলল ঠুকরে। শেষে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আগুনের পাখি তার ডিমটা দিল ফেলে। ডিমটা কিন্তু সমুদ্রে না পড়ে পড়ল গিয়ে তীরে, এক জেলের কুটিরে। সঙ্গে-সঙ্গে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। আর একটু হলেই আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল। তরুণের যে-ভাই তিমি, তীরের দিকে সাঁতরে এসে জল ছিটিয়ে সে-ই তুলেছিল বড়ো-বড়ো ঢেউগুলো। আগুন নিভতে ডিমটা খুঁজে বার করল তরুণ। ডিমটা তখনো গলে যায় নি। কিন্তু ঠাণ্ডা জল পড়ায় হঠাৎ জুড়িয়ে যেতে সেটার খোলা গিয়েছিল ফেটে। তাই অনায়াসে সে বার করে নিতে পারল স্ফটিকের বলটা।

তরুণ গিয়ে স্ফটিকের বলটা জাদুকরের সামনে ধরতে সে বলে উঠল, “আমার জাদুর ক্ষমতা ধ্বংস হল। এখন থেকে স্বর্ণ-সূর্য-কেল্লার তুমিই রাজা। স্ফটিকের এই বলটা দিয়ে তোমার ভাইদেরও মানুষের রূপ তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে।”

সেখান থেকে তরুণ চট্‌পট্‌ রাজকন্যের ঘরে পৌঁছে দেখল পরমা সুন্দরী মেয়ে হয়ে তার জন্য সে অপেক্ষা করছে। তাই আর দেরি না করে দুজনে মনের আনন্দে বদল করে নিল নিজেদের আংটি।

সোনার চাবি

তখন শীতকাল। মাঠ-ঘাট বরফে ঢাকা। কাঠকুটো কুড়োবার জন্য গরিব একটি ছেলেকে স্লেজে চড়ে বেরুতে হয়েছিল। কাঠকুটো সংগ্রহ করে স্লেজে তোলার পর ঠাণ্ডায় জমে এসেছিল তার শরীর। তাই সে ভাবল বাড়ি ফেরার আগে আগুন জ্বালিয়ে শরীরটা সেঁকে নেবে। আগুন জ্বালাবার জন্য তুষার সরিয়ে মাটি বার করার পর সে দেখল ছোট্টো একটা সোনার চাবি। যে-তালায় চাবিটা লাগে সেটা খোঁজার জন্য মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে সে দেখতে পেল লোহার একটা সিন্দুক। সেটা দেখে ছেলেটি ভাবল, 'চাবিটা লাগলে সিন্দুকের মধ্যে নিশ্চয়ই দামী-দামী হীরে-জহরত পাব।' সিন্দুকটার চার দিক খুঁজে শেষটায় সে দেখতে পেল চাবি ঢোকাবার ছোট্টো একটা গর্ত। চাবিটা সেটার মধ্যে ঢোকাতে ঠিক-ঠিক লেগে গেল। তার পর চাবিটা সে ঘোরাল। সে যতক্ষণ-না সিন্দুকটার ডালা তুলে দেখছে ভিতরে কী-কী আশ্চর্য সুন্দর জিনিস-পত্র আছে আমাদের কিন্তু ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

নেকড়ে আর শিয়াল

শেয়াল ছিল নেকড়ের কাছে। নেকড়ে যা হুকুম করে শেয়াল বাধ্য হয়ে সেটা তামিল করত। কারণ নেকড়ের চেয়ে শক্তি তার কম। নেকড়ের আওতা থেকে পালাতে পারলে শেয়াল বাঁচে।

বনের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে নেকড়ে বলল, "শেয়াল ভায়া, আমার জন্যে কিছু খাবার জোগাড় কর। নইলে তোমায় খেয়ে ফেলব।"

শেয়াল বলল, "আমি একটা গোলাবাড়ির উঠোনের কথা জানি। সেখানে ভেড়ার একজোড়া ছানা আছে। বলো তো তোমার জন্য নিয়ে আসি গে।"

নেকড়ে যেতে বলতে শেয়াল গিয়ে ভেড়ার একটা ছানা চুরি করে এনে নেকড়েকে দিয়ে সরে পড়ল। ছানাটাকে খেয়ে নেকড়ের পেট ভরল না। তার ইচ্ছে হল অন্য ছানাটাকেও খেতে। কিন্তু হড়্‌বড়্‌ করে চুরি করতে যেতে মা-ভেড়া শুরু করে দিল দারুণ চেঁচামেচি। তাই-না শুনে দৌড়ে এসে নেকড়েকে দারুণ ঠেঙান ঠেঙাল চাষী।

তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শেয়ালের কাছে ফিরে গিয়ে নেকড়ে বলল, "তোমার কথা শুনে অন্য ছানাটা আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু চাষী আমাকে বেদম পিটিয়েছে।"

শেয়াল বলল, "কখনো তোমার আশ মেটে না—এটাই তো তোমার দোষ।"

পরদিন তারা বেরুল ক্ষেতের মধ্যে বেড়াতে। পেটুক নেকড়ে

আবার বলল, "শেয়াল ভায়া, আমার জন্যে কিছু খাবার জোগাড় কর। নইলে তোমায় খেয়ে ফেলব।"

শেয়াল বলল, "আমি একটা গোলাবাড়ির কথা জানি। চাষীর বউ সেখানে পিঠে বানাচ্ছে। চলো গিয়ে কিছু পিঠে নিয়ে আসি গে।"

গোলাবাড়িতে গিয়ে চুপিচুপি ঘোরাঘুরি শোঁকাশুঁকি করে পিঠের বাটিটা শেয়াল খুঁজে বার করল। তার পর সেটা থেকে ছটা পিঠে নিয়ে এসে নেকড়েকে দিয়ে বলল, "এই নাও তোমার খাবার।" এই-না বলে শেয়াল সরে পড়ল।

চক্ষের নিমেষে পিঠেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে নেকড়ের ইচ্ছে হল আরো পিঠে খাবার। পিঠে চুরি করতে গিয়ে বাটিটা তার হাত থেকে পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেল।

শব্দ শুনে ছুটে এল চাষীর বউ। তার পর নেকড়ে দেখে শুরু করে দিল দারুণ চেঁচামেচি। তাই-না শুনে চাকর-বাকররা ছুটে এসে নেকড়েকে দারুণ ঠেঙান ঠেঙাল। ফলে তার আর-একটা ঠ্যাঙ খোঁড়া হয়ে গেল।

তারস্বরে চেঁচাতে-চেঁচাতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বনের মধ্যে শেয়ালের কাছে ফিরে গিয়ে নেকড়ে বলল, "তোমার কথা শুনে আরো পিঠে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেদম পিটিয়ে ওরা প্রায় আমার দফা রফা করে দিয়েছে।

শেয়াল বলল, "কখনো তোমার আশ মেটে না—এটাই তো তোমার দোষ।"

তৃতীয় দিনে আবার তারা বেরুল বেড়াতে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে-যেতে নেকড়ে বলল, "শেয়াল ভায়া, আমার জন্যে কিছু খাবার জোগাড় কর। নইলে তোমায় খেয়ে ফেলব।"

শেয়াল বলল, "আমি একটা লোকের কথা জানি। আজ সে একটা বলদ কেটেছে। মাটির তলার ঘরে নুনে জারিয়ে মাংসটা তারা রেখেছে। তোমার জন্যে খানিকটা মাংস নিয়ে আসি গে।"

নেকড়ে বলল সাহায্য করার জন্য শেয়ালের সঙ্গে সে যাবে। নানা গর্ত-টর্ত দিয়ে পথ দেখিয়ে নেকড়েকে নিয়ে শেয়াল পৌঁছাল মাটির তলার ঘরে।

সেখানে ছিল প্রচুর মাংস, নেকড়ে ভাবল, পেটভরে খাওয়া যাক। সময়ের অভাব নেই।

শেয়ালও খেল। কিন্তু খাবার সময় বার বার চার দিকে তাকাতে লাগল সতর্ক দৃষ্টিতে। যে গর্ত দিয়ে এসেছিল মাঝে মাঝে সেখানে দেখতে লাগল সেখান দিয়ে গলে বেরুবার মতো শরীরটা তার ছিপ্‌ছিপে আছে কি না।

শেষটায় নেকড়ে বলে উঠল, "শেয়াল ভায়া, অস্থির হয়ে অমন ছোটাছুটি করছ কেন?"

ধূর্তের মতো শেয়াল জবাব দিল, "যতক্ষণ-না গামলাটা খালি হয় ততক্ষণ দেখছি কেউ আসছে কি না।"

নেকড়ে বলল, "এখান থেকে নড়ছি না।"

গর্তগুলোর মধ্যে দিয়ে শেয়ালের যাতায়াতের শব্দ সেই মুহূর্তে শুনতে পেল চাষী। কী ঘটছে দেখার জন্যে সে গেল মাটির তলার ঘরে। তাকে দেখেই এক লাফে দৌড়ে পালাল শেয়াল। নেকড়েও চেষ্টা করল পালাতে। কিন্তু খেয়ে-খেয়ে পেটটা তখন তার জয়ঢাক। তাই গর্ত দিয়ে সে গলতে পারল না। চাষী তাকে মুগুর-পেটা করে মেরে ফেলল। আর অত্যাচারী নেকড়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বনের মধ্যে শেয়াল লাগল নাচতে।

হান্‌সের বিয়ে

এক সময় হান্‌স্ নামে এক তরুণ চাষী ছিল। তার ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল হান্‌সের জন্য এক বড়োলোকের মেয়েকে বউ করে আনতে, হান্‌স্‌কে উনুনের পিছনে বসিয়ে সে জ্বালাল প্রকাণ্ড আগুন। তার পর দুধ আর রুটি এনে হান্‌সের হাতে চক্‌চকে নতুন একটা পয়সা দিয়ে বলল, "চক্‌চকে পয়সাটা শক্ত করে ধরে রাখবি। দুধের মধ্যে সাদা রুটিটা ভেজা আর যতক্ষণ না আসছি ততক্ষণ যেখানে বসে আছিস সেইখানেই বসে থাকবি।"

হান্‌স্ বলল, "দাদা যা-যা বললে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

হান্‌সের ভাই তালি মারা পুরনো প্যান্টটা চড়িয়ে পাশের গ্রামের তরুণী আর ধনী এক মেয়ের কাছে গিয়ে বলল, "আমার ভাই হান্‌সকে বিয়ে করবে? হান্‌স্ লোক খুব ভালো, খুব চালাক-চতুর।"

মেয়ের বাপ ছিল খুবই কৃপণ। তাই সে শুধোল, "বড়োলোক মানে কী? ব্যাঙ্কে কত আছে শুনি?"

হান্‌সের ভাই বলল, "দোস্ত, আমার ভায়া যেখানে থাকে সে-জায়গাটা ভারি গরমের। ঠাণ্ডা নেই, বেশ গরম-গরম। হাতে তার চক্‌চকে পয়সা। আমার প্যান্টে যত তালি তত বিঘে তার জমি। আমার সঙ্গে গেলেই সব-কিছু নিজের চক্ষে দেখতে পাবে।"

এরকম দাঁও মারার লোভ কৃপণ লোকটা ছাড়তে পারল না। বলল, "তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম হান্‌সের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবই।"

হাঁসের দল আর শেয়াল

একদিন মাঠে এসে শেয়াল দেখে সেখানে এক ঝাঁক মোটাসোটা সুন্দর হাঁস বসে আছে। হেসে শেয়াল বলল, "তোমরা আমায় ডেকেছ বলেই এসেছি। সার বেঁধে তোমরা চমৎকার বসেছ। তাই একের পর এক তোমাদের খেয়ে ফেলতে পারব। কোনো অসুবিধে হবে না।"

আঁৎকে লাফিয়ে উঠে প্যাক্‌প্যাক্ করে হাঁসরা অনুনয় করে বলল তাদের সে যেন না খায়।

তাদের কাকুতি-মিনতিতে কান না দিয়ে শেয়াল বলল, "কোনো উপায় নেই। তোমাদের মরতেই হবে।"

শেষটায় একটা হাঁস সাহস করে বলল, "এই তরুণ বয়সে আমাদের যদি মরতেই হয় তা হলে প্রথমে অন্তত ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা সেরে নিতে দাও। তার পর আবার আমরা এমনভাবে সার বেঁধে বসব যে, আমাদের মধ্যে সব চেয়ে মোটাসোটা হাঁসকে অনায়াসে বেছে নিয়ে তুমি ভোজ শুরু করতে পারবে।"

শেয়াল বলল, "তোমাদের এই সাধু অনুরোধ মেনে নিলাম। প্রার্থনা করতে শুরু করে দাও। শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"

তখন প্রথম হাঁস "প্যাক্‌প্যাক্" করে শুরু করল দীর্ঘ এক প্রার্থনা। তার পর "প্যাক্‌প্যাক্" করে উঠল দ্বিতীয় হাঁস। তার পর তৃতীয় জন, তার পর চতুর্থ জন। এইভাবে শেষটায় সমস্বরে তারা চলল প্যাক্‌প্যাক্ করে। (তাদের প্রার্থনা শেষ হলে এ-গল্পটাও শেষ হবে। কিন্তু এখনো তারা প্রার্থনা করে চলেছে)।

মিষ্টি স্যুপ্

এক সময় ছোটো একটি মেয়ে ছিল। খুব গরিব, কিন্তু খুব ভালো। মা ছাড়া আর কেউ তার ছিল না। একদিন তাদের খাবার-দাবার কিছুই নেই। মেয়েটি তখন গেল বনে। সেখানে এক বুড়ির সঙ্গে তার দেখা। বুড়ি তাকে একটা মাটির হাঁড়ি দিয়ে বলল, "এটাকে যদি তুমি বল, 'ছোট্টো হাঁড়ি, ফুটতে থাকো', তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠবে মিষ্টি স্যুপ্। যদি বল, 'ছোট্টো হাঁড়ি, থামো,' তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ফোটা বন্ধ হবে।" হাঁড়িটা নিয়ে মেয়েটি গেল তার মায়ের কাছে। আর সেদিন থেকে তাদের সংসারে আর কোনো অভাব-অনটন রইল না। কারণ যখনই চায় তখনই পায় মিষ্টি স্যুপ্। কিন্তু একদিন ছোট্টো মেয়েটি যখন বেরিয়েছে তার মা বলল, "ছোট্টো হাঁড়ি, ফুটতে থাকো।" আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা লাগল টগ্‌বগ্ করে ফুটতে। পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে হাঁড়ির ফোটানো বন্ধ করার কথাগুলো কিন্তু কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। হাঁড়িটা ফুটে চলল। দেখতে দেখতে হাঁড়ির কানা উপচে পড়ল স্যুপ্। কিন্তু ফোটা বন্ধ না হওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যে স্যুপে ভেসে গেল রান্নাঘর। তার পর গোটা বাড়ি। তার পর পাশের বাড়ি। তার পর সারা পথ। মনে হল পৃথিবীর সব মানুষকে খাওয়াবার মতো যথেষ্ট স্যুপ্ আছে। হাঁড়িটার ফোটানো বন্ধ করা অনেক আগেই দরকার ছিল। কিন্তু কেউ জানত না কী করে সেটা করতে হয়। শেষটায় সেই গ্রামের মধ্যে রইল একটিমাত্র কুঁড়েঘর স্যুপে যেটা ভরে ওঠে নি। এমন সময় ছোট্টো মেয়েটি বাড়ি ফিরে বলে উঠল, "ছোট্টো হাঁড়ি, থামো!" সঙ্গে-সঙ্গে ফোটা বন্ধ হল। কিন্তু এখন যে-ই চাইবে সেই গ্রামে যেতে তাকেই স্যুপ্ খেয়ে পথ করে এগোতে হবে।

কয়েকটি চালাক লোক

একদিন এক চাষী ঘরের কোণ থেকে ছড়িটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার আগে তার বউকে বলল, "ট্রিড, তিনদিনের জন্যে আমি গাঁ ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে গোরু-ব্যবসায়ী এলে আমাদের তিনটে গোরু বিক্রি কোরো অন্তত দুশো টাকায়। তার কমে খবরদার বিক্রি করবে না।"

তার বউ বলল, "নিশ্চিন্ত মনে যাও। ঠিক দরেই বিক্রি করব।"

চাষী বলল, "বলছ বটে। কিন্তু ছেলেবেলায় কার যেন কোল থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলে। তখন মাথায় খুব চোট লাগে। এখনো মাঝে মাঝে সেই দুর্ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি। কোনোরকম বোকামি করলে এই ছড়িটা তোমার পিঠে ভাঙব। এক বছরেও ব্যথা যাবে না। কথাটা মনে রেখো।"

পরদিন গোরু-ব্যবসায়ী আসতে দরদস্তুর সঙ্গে-সঙ্গে ঠিকঠাক হয়ে গেল। গোরুগুলো দেখে আর দাম শুনে লোকটা রাজি হল তক্ষুনি সেগুলো নিয়ে যেতে।

শেকল খুলে গোরুগুলোকে সে বার করল গোয়াল থেকে। কিন্তু ফটকের কাছে পৌঁছতে চাষীর বউ লোকটার জামার আস্তিন চেপে ধরে বলল, "আগে দুশো টাকা দাও। নইলে গোরুগুলো নিতে দেব না।"

লোকটা বলল, "তা তো ঠিকই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো—টাকার থলিটা আনতে ভুলে গেছি। আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। দুটো গোরু এখন নিয়ে যাই। তৃতীয়টা জামিন থাকুক।"

চাষীর বউ ভাবল লোকটার প্রস্তাবে কোনো গলদ নেই। তাই

তাকে গোরু দুটো নিয়ে যেতে দিয়ে মনে-মনে ভাবল 'পাকা কাজ করেছি। হান্‌স্‌ কী খুশিই-না হবে!'

তিনদিন বাদে বাড়ি ফিরেই চাষী-প্রশ্ন করল, "বউ, গোরুগুলো বিক্রি হয়েছে?"

একমুখ হেসে তার বউ বলল, "হ্যাঁ গো, হয়েছে। তোমার কথা-মতো দুশো টাকাতেই বিক্রি করেছি। ওগুলোর অত দাম হবার কথা নয়। কিন্তু লোকটা কোনোরকম আপত্তি না করে তাইতেই কিনেছে।"

"টাকাগুলো কোথায়?" চাষী প্রশ্ন করল।

তার বউ বলল, "টাকা আমার কাছে নেই।"

লোকটা তার টাকার থলি আনতে ভুলে গিয়েছিল। শিগ্‌গিরই নিয়ে আসবে। জামিন রেখে গেছে।"

চাষী প্রশ্ন করল, "কী জামিন?"

তার বউ বলল, "তিনটে গোরুর একটা। দাম না দিলে সেটা পাবে না! আমি খুব চালাকি করেছি। সব চেয়ে ছোটো গোরুটাকে রেখেছি, কারণ সেটা খায় সব চেয়ে কম।"

তার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল চাষী। ছড়িটা শূন্যে তুলে বউকে মারতে গিয়ে সে থেমে গেল। তার পর বলল, "তোমার মতো আহাম্মক দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মায়া হচ্ছে। আমি রাজপথে বেরিয়ে তিনদিন অপেক্ষা করে দেখি তোমার চেয়েও বোকা আর কারুর দেখা পাওয়া যায় কি না। সেরকম কারুর দেখা পেলে তোমাকে পেটাব না। না পেলে প্রাপ্য পুরস্কারটা পাবে।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজপথের পাশের এক পাথরের উপর সে গিয়ে বসল। খানিক পরেই তার চোখে পড়ল লম্বাটে একটা গোরুর গাড়ি। দেখে সেটার মধ্যেকার খড়ের আঁটির উপর বসে-বসে বলদগুলোকে না চালিয়ে গাড়িটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্ত্রীলোক। চাষী মনে মনে বলে উঠল, এরকম একজনেরই খোঁজ করছিলাম! তার পর পাথর থেকে উঠে গাড়িটার সামনে এমনভাবে সে ছুটে গেল, যেন তার মাথার ঠিক নেই।

স্ত্রীলোকটি বলল, "বুড়োকত্তা, কী চাও? তোমাকে তো চিনলাম না। কোত্থেকে আসছ?"

চাষী বলল, "স্বর্গ থেকে আমি পড়ে গেছি। সেখানে কী করে ফিরে যাব জানি না; তুমি আমাকে তোমার গাড়ি করে সেখানে নিয়ে যেতে পার?"

স্ত্রীলোকটি বলল, "না, পথটা আমার জানা নেই। কিন্তু স্বর্গ থেকে এসে থাকলে নিশ্চয়ই আমার স্বামীর খবর বলতে পারবে। স্বর্গে তিনি আছেন তিন বছর। নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।"

চাষী বলল, "হ্যাঁ, তাকে আমি দেখেছি। কিন্তু স্বর্গেও সবাইকার অবস্থা ভালো নয়। সেখানে সে ভেড়া চরায়। কিন্তু ভেড়াগুলো তাকে জ্বালিয়ে মারে। থেকে থেকেই সেগুলো বনের মধ্যে যায় হারিয়ে। এ-সব সময় তাদের পেছনে তাকে ছুটতে হয়। তার পোশাক-আশাকও ছিঁড়ে ধুলধুলে হয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই তার গা থেকে খসে পড়বে। স্বর্গে কোনো দর্জি নেই। তুমি তো রূপকথার গল্প থেকেই জানো— সেন্ট-পিটার স্বর্গে দর্জিদের ঢুকতে দেন না।"

স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "এমনটা হবে কে জানত? শোনো বলি কী করব। বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাঁর সব চেয়ে ভালো কোটটা নিয়ে আসছি। এখনো সেটা পোশাকের আলমারিতে ঝুলছে। তুমি সেটা দয়া করে তাঁর কাছে নিয়ে যেয়ো।"

চাষী বলল, "অসম্ভব। স্বর্গে কোনো পোশাক নিয়ে যাওয়া যায় না। সিংহদ্বারে সব রেখে যেতে হয়।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "শোনো, গতকাল আমার সব জমি বিক্রি করে বেশ কিছু টাকাকড়ি পেয়েছি। সেটা তাঁকে পাঠাব। থলিটা তোমার পকেটে রেখো। কেউ দেখতে পাবে না।"

চাষী বলল, "তাই যদি তুমি মনে-মনে স্থির করে থাকো তা হলে সানন্দেই সেটা নিয়ে যাব।"

"তা হলে এক মিনিট সবুর কর। এক দৌড়ে সেটা নিয়ে আসছি।"

এই-না বলে স্ত্রীলোকটি বলদগুলো ছুটিয়ে চলে গেল। চাষী মনে-মনে বলল, 'এ যে দেখি আরো বোকা। বাস্তবিকই টাকার থলিটা এ যদি নিয়ে আসে তা হলে বউকে আর ঠ্যাঙাব না।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাকার থলিটা এনে নিজে হাতে স্ত্রীলোকটি সেটা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে চাষীকে জানাল অশেষ ধন্যবাদ।

তার পর বাড়ি ফিরে সে দেখে তার ছেলে সবে ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরেছে। সকালের আশ্চর্য ঘটনার সব কথা তাকে জানিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "স্বামীকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছি, কে ভেবেছিল স্বর্গে গিয়ে তিনি অভাবে পড়বেন।"

ছেলে তার কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে বলল, "মা, স্বর্গ থেকে লোকে রোজ পড়ে না। এক্ষুনি বেরিয়ে দেখছি তার নাগাল ধরতে পারি কি না। আমি আরো কয়েকটা খুঁটিনাটি খবর জানতে চাই।" এই-না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলে গেল। যেতে-যেতে এক গাছতলায় সে দেখে, চাষী বসে-বসে টাকাগুলো গুণছে।

তাকে সে প্রশ্ন করল, "যে-লোকটা স্বর্গ থেকে পড়েছিল তাকে দেখেছ?"

চাষী বলল, "হ্যাঁ, একটু আগে দেখেছি লোকটাকে পাহাড়ে চড়তে। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে তার দেখা পেতে পার।"

সে বলল, "সকাল থেকে ফসল কেটে বেজায় আমি ক্লান্ত। লোকটাকে তুমি চেনো। দয়া করে আমার ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে বুঝিয়ে সঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনো।"

চাষী হাসি চেপে মনে-মনে বলল, 'আরে! এ যে দেখছি আর-একটা লোক যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই।'

তার পর তাকে চেঁচিয়ে বলল, "তোমার এই উপকারটা নিশ্চয়ই করব।" এই-না বলে তার ঘোড়ায় চড়ে চট্‌পট্‌ সে সরে পড়ল।

রাত পর্যন্ত সেই গাছতলায় ছেলেটি অপেক্ষা করল। কিন্তু চাষীকে ফিরতে না দেখে ভাবল, 'খুব সম্ভব স্বর্গের লোকটির খুব তাড়া ছিল। তাই তাকে ঘোড়াটা দিয়ে চাষী বলেছে আমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে।' তার পর বাড়ি ফিরে তার মাকে বলল, "মা, ঘোড়াটা বাবাকে পাঠিয়ে দিলাম। এখন আর তাঁকে পায়ে হেঁটে ভেড়া খুঁজতে যেতে হবে না।"

তার মা বলল, "ঠিকই করেছিস। তোর বয়েস কম। ঘোড়া না হলেও চলবে।"

বাড়ি ফিরে গোয়ালে গোরুটার কাছে ঘোড়াকে রেখে বউয়ের কাছে গিয়ে চাষী বলল, "ট্রুড, তোমার কপাল ভালো—তোমার চেয়েও দুজন বোকার দেখা পেয়েছি। তাই এবার আর তোমাকে লাঠি পেটা করব না। ভবিষ্যতের জন্যে সেটা তোলা রইল।" তার পর পাইপ ধরিয়ে

তার ঠাকুরদার আমলের আরাম-কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে সে ভাবতে লাগল, 'আমার কপাল খুব ভালো। দুটো হাড্ডিসার গোরুর বদলে একটা তাগড়া ঘোড়া আর এক থলি মোহর! বোকামির দরুণ সব সময় এমন লাভ হলে বোকা লোককে খুব সমীহ করাই উচিত।' এটা কিন্তু চাষীর ধারণা। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমরা একমত হব না।

কোলা ব্যাঙের গল্প

এক

এক সময় ছোট্টো একটা মেয়ে ছিল। তার মা রোজ বিকেলে তাকে দিত ছোট্টো এক বাটি দুধ। সেটা নিয়ে মেয়েটি গিয়ে বসত আঙিনায়। সেই দুধ মেয়েটি খেতে শুরু করলে দেয়ালের ফোকর থেকে পোষা একটা কোলা ব্যাঙ গুটিগুটি বেরিয়ে এসে সেই বাটি থেকে মেয়েটির সঙ্গে দুধ খেত। মেয়েটির এটা খুব ভালো লাগত। দুধের ছোট্টো বাটিটা নিয়ে বসার পর কোলা ব্যাঙ সঙ্গে-সঙ্গে হাজির না হলে গুন্‌গুন্ করে মেয়েটি গেয়ে উঠত :

"কোলা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ,
এসো আমার কাছে ;
তোমার জন্যে দুধ-রুটি
সাজিয়ে রাখা আছে।"

গান শুনে কোলা ব্যাঙ ছুটে আসত তার কাছে আর খুব খুশি হয়ে তার সঙ্গে খেত দুধ। মেয়েটির জন্যে তার গুপ্ত ভাঁড়ার থেকে কোলা ব্যাঙ নিয়ে আসত ঝক্‌মকে নানা পাথর, মুক্ত আর সোনার খেলনা।

কিন্তু কোলা ব্যাঙ খেত শুধুই দুধ। রুটির টুকরোগুলো ছুঁতো না। একদিন মেয়েটি তার ছোট্টো চামচে দিয়ে তার মাথায় আলতো-ভাবে টোকা মেরে বলল, "কোলা ব্যাঙ রুটির টুকরোগুলোও খেয়ে ফেলো।"

তার মা রান্নাঘরে ছিল। মেয়ের কথা শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোলা ব্যাঙকে দেখে তাকে সে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

আর সেই দিন থেকে মেয়েটির মধ্যে দেখা গেল একটা পরিবর্তন। কোলা ব্যাঙ যতদিন তার সঙ্গে খেত মেয়েটি সুস্থ সবল হয়ে বড়ো হয়ে উঠছিল। কিন্তু কোলা ব্যাঙকে মেরে ফেলার পর মেয়েটির গোলাপী গাল ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তার শোকে ক্রমশ শুকিয়ে উঠতে-উঠতে একদিন মেয়েটি মরে গেল। আর তার পরেই মৃত্যু-পাখি রাতেরবেলায় লাগল তীক্ষ্নস্বরে আর্তনাদ করতে, রবিন্ পাখিটি শুরু করল কাঠকুটো সংগ্রহ করতে আর মেয়েটিকে শোয়ানো হল শবযানে।

দুই

এক অনাথ ছোট্টো মেয়ে শহরের পাঁচিলের পাশে বসে সুতো কাটছিল। এমন সময় সে দেখল পাচিলের তলার গর্ত থেকে একটা কোলা ব্যাঙকে বেরিয়ে আসতে। তাকে দেখেই মেয়েটি তার নীল সিল্কের রুমালটা বিছিয়ে দিল। সিল্কের নীল রুমাল কোলা ব্যাঙরা খুব ভালোবাসে। রুমালটা দেখেই কোলা ব্যাঙ ফিরে গিয়ে নিয়ে এল সোনার সুন্দর ছোট্টো একটা মুকুট। সেটা রুমালের উপর রেখে আবার সে চলে গেল। সূক্ষ্ম কাজ-করা সোনার মুকুটটা মেয়েটি তুলে নিতে সেটা ঝল্‌মল্ করে উঠল। খানিক পরে কোলা ব্যাঙ আবার ফিরল। কিন্তু মুকুটটা দেখতে না পেয়ে পাঁচিলে মাথা কুটে-কুটে মরল সে। সিল্কের নীল রুমালের উপর মুকুটটা মেয়েটি যদি রেখে দিত নিশ্চয়ই তা হলে কোলা ব্যাঙ গর্ত থেকে, তার জন্য নিয়ে আসত দামী দামী আরো অনেক উপহার।

তিন

কোলাব্যাঙ ডেকে উঠল, "মক্‌মক্, মক্‌মক্।"

শিশু বলল, "বেরিয়ে এসো।"

কোলাব্যাঙ এগিয়ে এল। শিশু তার ছোট্টো বোনের কথা তাকে জিগেস করল, "তাকে তুমি দেখ নি?"

কোলাব্যাঙ বলল, "না, আমি দেখি নি। তুমি দেখ নি? মক্‌মক্, মক্‌মক্, মক্‌মক্।"

সাদা চাদর

এক মায়ের ছিল ছোট্টো একটি সাত বছরের আদুরে ছেলে। ভারি সুন্দর আর মিষ্টি তার চেহারা। যে দেখত সেই তাকে ভালোবাসত। ছেলেটির চেয়ে প্রিয় পৃথিবীতে আর কিছুই তার ছিল না। ছেলেটিই ছিল তার যথাসর্বস্ব হঠাৎ একদিন ছেলেটি অসুখে পড়ল আর ভগবান তাকে নিয়ে নিলেন। মা তার ছেলের শোক কিছুতেই ভুলতে পারল না। দিন-রাত তার জন্যে চোখের জল ফেলে। কবর দেবার পর যেখানে বেঁচে থাকার সময় সে খেলাধুলো করত রাতের বেলায় সেখানে আসত ছেলেটি। কিন্তু সকাল হলেই অদৃশ্য হত।

মায়ের কান্না থামে না দেখে এক রাতে ছেলেটি এল যে-কাপড় ঢাকা দিয়ে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেই কাপড় জড়িয়ে। মাথায় তার ফুলের মুকুট।

মায়ের বিছানার পায়ের দিকে বসে সে বলল, "মা কেঁদো না। তুমি কাঁদলে কফিনে আমি বিশ্রাম করতে পারি না এই দেখো তোমার চোখের জলে আমার গায়ের চাদর ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।"

ছেলের কথা শুনে তার মা ভয় পেয়ে কান্না বন্ধ করল। পরের রাতে ছোট্টো একটা বাতি নিয়ে তার ছেলে আবার এসে বলল, "এই দেখো মা, চাদরটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এখন আমি কবরের মধ্যে ঘুমোতে পারব।"

তার পর থেকে ছেলেটির মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলত তার মনে শান্তি দিতে, শোক-তাপ দূর করতে। ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে ধৈর্য ধরে সে দিন কাটাতে লাগল।

ছেলেটি আর দেখা দিল না শান্তিতে ঘুমোতে লাগল তার ছোট্টো কবরের মধ্যে।

শস্য-মাড়াই কল

একবার এক চাষী ক্ষেতে লাঙল চষার জন্য দুটো বলদ নিয়ে গিয়েছিল। ক্ষেতে পৌঁছবার পর বলদ দুটোর শিঙ প্রতি ঘণ্টাতেই বাড়তে লাগল। শেষটায় সেগুলো এমন প্রকাণ্ড হয়ে উঠল যে বাড়ি ফিরে ফটকের ভিতর দিয়ে তাদের সে নিয়ে যেতে পারল না। তার কপাল ভালো, কারণ এক কসাই তখন যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। বলদ-গুলোকে সে ধরল। কসাই বলল চাষী তাকে এক থলি সরষে-দানা এনে দিলে দানা পিছু সে দেবে একটা করে রুপোর টাকা।

চাষী বাড়ি গেল সরষে-দানা আনতে। সেগুলো নিয়ে কসাইয়ের বাড়ি যাবার সময় একটা সরষে-দানা মাটিতে পড়ে। ফলে তার হল একটা টাকা লোকসান। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় সে দেখে যে দানাটা তার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল সেটা প্রকাণ্ড একটা গাছ হয়ে উঠেছে। এমনই প্রকাণ্ড যে প্রায় আকাশ ছোঁয়। চাষী ভাবল, 'দেবদূতরা কী করছে সেটা দেখার এটাই সুযোগ।'

গাছে উঠে সে দেখল দেবদূতরা জই মাড়াই করছে। তাদের সে দেখছে এমন সময় যে-ডালে সে বসেছিল সেটা শুরু করল ভীষণ-ভাবে দুলতে। নীচে তাকিয়ে সে দেখে, কে একজন কুপিয়ে গাছটা কেটে ফেলছে'।

চাষী ভাবল, 'নীচের দিকে মাথা করে হুমড়ি খেয়ে পড়া খুব সুখের হবে না।'

তাই স্বর্গের মেঝে থেকে একমুঠো তুষ নিয়ে নীচে নামার জন্য

সেটা পাকিয়ে একটা দড়ি সে বানাল। স্বর্গ থেকে সে নিল একটা মাড়াই কল আর একটা নিড়ানি।

সে নেমে এল একটা খুব গভীর গর্তের মধ্যে। কিন্তু নিড়ানিটা সঙ্গে থাকায় তার খুব উপকার হল। কারণ সেটা দিয়ে একটা সিঁড়ি বানিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে আসতে পারল। তার কাহিনী যে সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্যে সেই মাড়াই কলটাও সে এনেছিল সঙ্গে করে।

চালাক ছোট্টো দর্জি

এক সময় এক রাজকন্যের দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না। তাকে কেউ বিয়ে করতে এলে সে একটা ধাঁধা বলত। উত্তর দিতে না পারলে তাকে সে দিত অপমান করে তাড়িয়ে। এ কথাও সে ঘোষণা করেছিল —যে তার ধাঁধার উত্তর বলতে পারবে তাকেই বিয়ে করবে।

সে সময় ছিল তিনজন দর্জি। তারা থাকত একসঙ্গে। বড়ো দুজন বানিয়েছিল অনেক সুন্দর-সুন্দর পোশাক। তারা ভাবল রাজকন্যের ধাঁধার উত্তর নিশ্চয়ই দিতে পারবে। তাদের মধ্যে তৃতীয়জন হল ছোট্টোখাট্টো বোকাসোকা গোছের মানুষ। এমন-কি, দর্জির কাজও জানত না। কিন্তু সে ভাবল ভাগ্য নিশ্চয়ই তার সহায় হবে। কারণ নিজের ভাগ্য ছাড়া নির্ভর করার মতো তার কিছু ছিল না। অন্য দুজন তাকে বলল, "তুই বাড়িতে থাক। তোর ঘটে যা বুদ্ধি তাতে বেশি দূর এগুতে পারবি না।" কিন্তু ছোট্টো চেহারার দর্জি তাদের কথায় না চটে জানাল সে মনস্থির করে ফেলেছে, যেমন করেই হোক একটা সুরাহা সে করে নেবে। তাই সে এমন ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল যেন গোটা পৃথিবীটাই তার।

তিনজনেই তার পর রাজকন্যের কাছে হাজির হয়ে জানতে চাইল ধাঁধাটা। বলল তাদের বুদ্ধি এমন সূক্ষ্ম যে ছুঁচ পরিয়ে নেওয়া যায়।

রাজকন্যে প্রশ্ন করল, "আমার মাথায় দুরকম চুল আছে। সেগুলোর রঙ কী?"

প্রথম দর্জি বলল, "নিশ্চয়ই কালো আর সাদা মেশানো।"

রাজকন্যে বলল, "হল না।"

দ্বিতীয় দর্জি বলল, "সাদা আর কালো না হলে নিশ্চয়ই বাদামী আর লাল।"

রাজকন্যে বলল, "হল না।"

তখন তৃতীয় দর্জি এগিয়ে এসে বলল, "রাজকন্যের মাথায় রুপোলী আর সোনালী রঙের চুল।"

তার কথা শুনে রাজকন্যে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আর-একটু হলেই ভয়ের চোটে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়ত। কারণ ছোট্টো দর্জি সঠিক উত্তর দিয়েছিল তার ধাঁধার। একটু পরে খানিক ধাতস্থ হয়ে রাজকন্যে বলল, "এখনো তোমাকে বিয়ে করছি না। আস্তাবলে একটা ভালুক আছে। তার সঙ্গে তোমায় রাত কাটাতে হবে। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি তখনো তুমি বেঁচে থাকলে তোমায় বিয়ে করব।

রাজকন্যে ভেবেছিল এইভাবে ছোট্টো দর্জির হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ ভালুকটা তার খাবার নাগালে পেলে কাউকেই বেঁচে ফিরতে দিত না। ছোট্টো দর্জি কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। হাসিমুখে বলল, "মনে পাপ না থাকলে ভয়টা কিসের?"

সন্ধেয় ছোট্টো দর্জিকে ভালুকের আস্তাবলে নিয়ে যেতেই থাবা উঁচিয়ে সেটা তেড়ে এল। তাই দেখে ছোট্টো দর্জি চেঁচিয়ে উঠল, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে! এক্ষুনি তোমায় ঠাণ্ডা করছি।"

এই-না বলে পকেট থেকে কতকগুলো আখরোট বার করে দাঁতে ভেঙে শাঁসটা সে খেলো। তাই দেখে ভালুকটাও কয়েকটা আখরোট খেতে চাইল। ছোট্টো দর্জি আখরোটের বদলে এক মুঠো নুড়ি বার করে তাকে দিল খেতে।

সেগুলো ভালুক তার বিরাট মুখের মধ্যে ফেলল। কিন্তু, প্রাণপণে কামড়ে একটা নুড়িও ভাঙতে পারল না। তাই সে ভাবল, "নিশ্চয়ই আমি ভারি বোকা। নইলে একটা আখরোট ভাঙতে পারি না।" ছোট্টো দর্জিকে সে বলল, "আমার জন্যে আখরোটগুলো ভেঙে দাও।"

দর্জি পাথরগুলো নিয়ে হাত-সাফাই করে একটা আখরোট মুখে পুরে ভাঙল কটাস্ করে। তাই দেখে ভালুক বলল, "আর-এক বার চেষ্টা করে দেখি। তুমি কী করে ভাঙলে দেখে মনে হচ্ছে আমিও পারব।"

ছোট্টো দর্জি তখন তাকে দিল আরো কতকগুলো নুড়ি। কিন্তু প্রাণপণ জোরে কামড়েও ভালুক সেগুলো ভাঙতে পারল না। তার পর ছোট্টো দর্জি তার কোটের ভিতর থেকে একটা বেহালা বার করে একটা গৎ বাজাতে শুরু করল। বাজনা শুনে ভালুক আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তালে তালে নাচতে লাগল। খানিক নাচবার পর ছোট্টো দর্জিকে সে প্রশ্ন করল, "ওহে, বলি শোনো, বেহালা বাজানো কি খুব কঠিন?"

"এটা তো নেহাত ছেলেখেলা। একটা হাতে তারগুলো চাপো, অন্য হাতে ছড় টানো। অমনি বেজে উঠবে: লা-লা-লাল্‌লা—লা, লা-লা লাল্‌লা-লা!'

ভালুক বলল, "বেহালা বাজানো শিখতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। তা হলে যখন খুশি নাচতে পারব। তুমি আমায় শেখাতে পারবে?"

ছোট্টো দর্জি বলল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রথমে তোমার থাবা দুটো দেখাও।—দেখছ তো, তোমার নখগুলো বেজায় বড়ো-বড়ো। আগে সেগুলো কেটে ছোটো করে ফেলা দরকার।"

তার পর সে তার 'বাইস্‌' (পাক দিয়ে এঁটে ধরার একরকম যন্ত্র) বার করে ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলো তাতে শক্ত করে এঁটে দিয়ে বলল, "সবুর কর। কাঁচিটা আনছি।" এই-না বলে সেখান থেকে সরে এসে কোণের এক খড়ের গাদায় শুয়ে ছোট্টো দর্জি পড়ল অঘোরে ঘুমিয়ে। ভালুকটা বিরক্ত হয়ে করে চলল গোঁ গোঁ।

রাতে তার চীৎকার শুনে রাজকন্যে ভাবল ছোট্টো দর্জিকে খতম করে ভালুকটা মনের আনন্দে চেঁচাচ্ছে। ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন আনন্দে তার মন ভরপুর। কিন্তু আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে সে দেখল একমুখ হাসি নিয়ে ছোট্টো দর্জি দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। সবাইকার সামনে সে কথা দিয়েছিল ছোট্টো দর্জিকে বিয়ে করবে। তাই আর সে আপত্তি করতে পারল্‌ না। রাজা আদেশ দিলেন সোনার একটা জুড়িগাড়ি আনতে যাতে চেপে ছোট্টো দর্জির সঙ্গে তাকে গির্জে যেতে হবে বিয়ে করতে।

অন্য দুজন দর্জি ছিল পাজি। তাদের বন্ধুর সৌভাগ্য দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাই যেই-না রাজকন্যের সঙ্গে ছোট্টো দর্জি জুড়িগাড়িতে উঠতে যাবে আস্তাবলে গিয়ে ভালুকের স্ক্রুগুলো তারা ঢিলে করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ রেগে ভালুকটা ছুটতে লাগল জুড়িগাড়ির পিছনে। ভালুকের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল। "ভালুকটা তেড়ে আসছে। আমাদের খেয়ে ফেলবে।"

কিন্তু ছোটো দর্জির ছিল খুব উপস্থিত-বুদ্ধি। জুড়িগাড়ির মধ্যে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠ্যাঙ-দুটো জানলা দিয়ে বার করে ভালুককে সে চেঁচিয়ে বলল, "বাইস্‌টা দেখছ? এক্ষুনি কোট না পড়লে আবার তোমায় স্ক্রু দিয়ে আঁটব।"

আর সেটা দেখা মাত্রই ভালুকটা উলটো দিকে মুখ করে ভোঁ দৌড় দিল। তার পর গির্জেয় গিয়ে রাজকন্যেকে বিয়ে করে ছোট্টো দর্জি মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

এ-গল্প যে না বিশ্বাস করবে তাকে জরিমানা দিতে হবে আড়াই টাকা।

পাপের সাজা

কাজের খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াত ভবঘুরে এক দর্জি। কিন্তু কোনো কাজ সে পেত না। শেষটায় একেবারেই গরিব হয়ে পড়ল সে। কাণাকড়িও তার রইল না। আর তখনই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক সুদখোরের। দর্জি ভাবল, 'এ-লোকটার নিশ্চয়ই অঢেল টাকাকড়ি আছে।' তাই তাকে সে বলল, "তোমার সব টাকাকড়ি দাও। নইলে আমার হাতে মরবে।"

সুদখোর বলল, "আমায় মেরো না। আটটা পয়সা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো টাকাকড়ি নেই।"

দর্জি বলল, "নিশ্চয়ই আছে। তোমার কাছ থেকে সেগুলো আদায় করছি।" এই-না বলে পেটাতে-পেটাতে সুদখোরকে সে মেরে ফেলল। মরবার সময় সুদখোর বলে গেল, "সূর্য এ-ঘটনার কথা প্রকাশ করে দেবে। পাপের সাজা তুমি পাবে।"

দর্জি তার পকেট হাতড়ে দেখে সুদখোর সত্যি কথাই বলেছিল—কারণ তার পকেটে ছিল মাত্র আটটা পয়সা। দর্জি তখন সুদখোরের মৃতদেহ একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

যেতে যেতে সে পৌঁছল এক শহরে। সেখানকার প্রধান দর্জির কাছে সে কাজ পেল। সেই দর্জির ছিল সুন্দরী এক মেয়ে। ভবঘুরে দর্জি তাকে বিয়ে করে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

ভবঘুরে দর্জির দুটি ছেলেমেয়ে জন্মাবার পর তার শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেল। সে আর তার বউ পেল তাদের বাড়িটা। এক সকালে খাবার

টেবিলের সামনে দর্জি খেতে বসেছে। তার জন্য কফি নিয়ে এলে খানিকটা কফি পিরিচে ঢেলে সে খেতে যাবে। এমন সময় তার উপর রোদ ঝল্‌সে উঠে দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে মিলিয়ে গেল। তাই দেখে বিড়্‌বিড়্‌ করে সে বলে উঠল, "সব কথা ফাঁস করে দেবে—তাই-না? কিন্তু পারবে না!"

তার বউ প্রশ্ন করল, "কী বলছ গো?"

দর্জি বলল, "তোমাকে না বলাই ভালো।"

তার বউ বলল, "আমাকে যদি ভালোবাস তা হলে কথাটা আমায় বলতেই হবে। কাউকে সে কথা বলব না।" প্রশ্ন করে-করে বউ তাকে উত্ত্যক্ত করে তুললে শেষটায় দর্জি তাকে বলল, "বহু বছর আগে-কার কথা। আমি তখন ভবঘুরে। পকেটে কাণাকড়িও নেই। এমন সময় একদিন এক সুদখোরের সঙ্গে দেখা। তাকে খুন করে তার পকেটে যা কিছু ছিল নিয়ে নিই। মরবার সময় লোকটা বলে 'সূর্য এ-ঘটনার কথা প্রকাশ করে দেবে। পাপের সাজা তুমি পাবে'। সূর্য সে-চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেয়ালের উপর রোদ শুধু ঝিক্‌মিক্‌ করেই উঠেছে—কোনো কথা ফাঁস হয় নি।"

তার পর বউকে সে কড়া আদেশ দিল কথাটা যেন কক্ষনো কাউকে না বলে। বউ কিন্তু কথাটা চেপে রাখতে পারল না। তার ধর্মবাবার কাছে গিয়ে সেটা সে বলে ফেলল, তার পর তাকে অনুরোধ করল কথাটা কাউকে সে যেন না বলে। কিন্তু তিনদিন যেতে না যেতেই শহরের সবাই জানতে পারল কথাটা।

ফলে দর্জিকে ধরে হাকিমের সামনে হাজির করা হল। হাকিম তার মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সুদখোরের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল—কারণ সূর্যই প্রকাশ করে দিয়েছিল সব কথা।

একগুঁয়ে মেয়ে

এক সময় ভারি একগুঁয়ে ছোট্রো একটি মেয়ে ছিল। মায়ের কোনো কথা সে শুনত না। ভগবান তার উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাই সে অসুখে পড়ল, কোনো ডাক্তার তাকে দেখতে এল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল। তাকে কবর দিয়ে কবরের উপর মাটি ছড়ানো হল। কিন্তু তার একটা হাত রইল কবর থেকে উঁচিয়ে। কবরের উপর আরো মাটি ছড়ানো হল। কিন্তু হাতটা ঢাকা পড়ল না। তখন তার মা কবরের কাছে গিয়ে কাস্তে দিয়ে ছোট্রো হাতটা কেটে ফেললেন আর তার পর থেকে মেয়েটি লাগল মাটির তলায় শান্তিতে ঘুমোতে।

সোনার ছেলে

এক সময় এক গরিব লোক তার বউকে নিয়ে ছোট্টো একটা কুঁড়ে ঘরে থাকত। লোকটি যে-মাছ ধরত সেটা ছাড়া তাদের কপালে আর কোনো খাবার জুটত না। আর মাছও পেত সে সামান্যই। একদিন নদী থেকে জাল টেনে তুলে সে দেখে তাতে ধরা পড়েছে সোনার সুন্দর একটা মাছ। অবাক হয়ে সেটার দিকে সে তাকাতে মাছ বলে উঠল, "জেলে, আমাকে জলে ছেড়ে দাও। তোমার কুঁড়েঘরকে তা হলে সুন্দর প্রাসাদ করে দেব।"

জেলে বলল, "আমাদের খাবার-দাবার নেই। প্রাসাদ নিয়ে কী করব?"

সোনার মাছ বলল, "সে-ব্যবস্থাও হবে। সেই প্রাসাদে থাকবে খাবারের একটা আলমারি। সেটা খুললেই দেখবে ডিশ্‌-ভরা ভালো ভালো খাবার থরে-থরে সাজানো। যত ইচ্ছে খেয়ো।"

জেলে বলল, "তাই যদি হয় তা হলে তোমাকে খুশি মনেই জলে ছেড়ে দিচ্ছি।"

মাছ বলল, "কিন্তু একটা শর্ত আছে। কে তোমার অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে সে কথা কাউকে বলতে পাবে না। বললেই সব-কিছু মিলিয়ে যাবে।"

সোনার মাছকে জলে ছেড়ে দিয়ে জেলে বাড়ি ফিরল। ফিরে দেখে তার কুঁড়েঘরের জায়গায় রয়েছে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ। আর তার মধ্যেকার সাজানো-গোছানো বৈঠকখানায় সুন্দর আর দামী পোশাক পরে বসে আছে তার বউ।

এক মুখ হেসে তার বউ বলল, "হঠাৎ এমনটা হল কী করে? বাড়িটা কিন্তু আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।"

জেলে বলল, "আমারও খুব পছন্দ। কিন্তু ভারি ক্ষিদে পেয়ে গেছে কিছু খেতে দাও।"

তার বউ বলল, "খাবার-দাবার কিছুই নেই। এই নতুন বাড়িতে কোথায় খাবার আছে জানি না।"

জেলে বলল, "ওখানে দেখছি খাবারের বড়ো একটা আলমারি রয়েছে খুলে দেখো তো।"

আলমারিটা খুলে জেলের বউ দেখে তার মধ্যে থরে-থরে সাজানো রয়েছে কেক, মাংস, ফল আর আঙুর-রস।

ভারি খুশি হয়ে তার বউ চেঁচিয়ে উঠল, "কী খাবে গো, বল।"

খেতে বসে জেলের বউ প্রশ্ন করল, "এত সব খাবার-দাবার জিনিস-পত্র কোথা থেকে এল?"

জেলে বলল, "এই প্রশ্ন কোরো না। কথাটা কাউকে বললেই সব-কিছু মিলিয়ে যাবে।"

বউ বলল, "বেশ। আমাকে বলা বারণ থাকলে ও-প্রশ্ন আর করব না।"

কিন্তু জেলের বউ শেষপর্যন্ত তার কৌতূহল দমন করতে পারল না। রাত-দিন একই প্রশ্ন করে জেলেকে সে অতিষ্ঠ করে তুলল। শেষটায় একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে জেলে তার বউকে বলে ফেলল সেই সোনার সুন্দর মাছটা ধরা আর সেটাকে জলে ছেড়ে দেবার কথা। আর বলবার সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই প্রাসাদ আর খাবারের আলমারিটা। দেখল, তারা বসে রয়েছে তাদের সেই ছোট্টো কুঁড়েঘরে।

জেলে কী আর করে। বাধ্য হয়ে আবার সে বেরুল মাছ ধরতে। কিন্তু তার কপাল ভালো। আবার সে ধরল সোনার সেই মাছটাকে।

মাছ বলল, "শোনো, আমাকে জলে ছেড়ে দিলে আবার সেই প্রাসাদ আর খাবার-দাবার ভরা আলমারিটা ফিরিয়ে দেব। কিন্তু সাবধান, এবার আর কথাটা কাউকে বোলো না।"

"এবার আর বলব না", বলে কথা দিয়ে সোনার মাছকে জলে সে ছেড়ে দিল। বাড়ি ফিরে সে দেখে আবার সেই প্রাসাদ, আসবাবপত্র আর খাবারের আলমারিটা ফিরে এসেছে আর সুন্দর পোশাক পরে বসে

রয়েছে তার বউ। কিন্তু এবারও সে তার কৌতূহল চাপতে পারল না। প্রশ্ন করে করে সে অতিষ্ঠ করে তুলল জেলেকে। শেষটায় আবার তিতিবিরক্ত হয়ে বউকে সে জানাল সব কথা। আর সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে গেল সব-কিছু। তারা দেখে আবার তারা বসে রয়েছে তাদের সেই ছোট্টো কুঁড়েঘরে।

জেলে বলল, "দেখলে তো—আবার আমাদের দৈন্যদশা শুরু হল।"

তার বউ বলল, "ধনদৌলত কোত্থেকে আসছে যদি জানতেই না পারি তা হলে সে ধনদৌলতে আমার কোনো দরকার নেই।"

জেলে আগের মতো বেরুল আবার মাছ ধরতে। আর কিছুদিন পর আবার ধরল সেই সোনার মাছকে।

মাছ বলল, "শোনো। তোমার হাতে ধরা পড়াই দেখছি আমার বরাতে আছে। আমাকে ছ টুকরো করে ফেলো। দু টুকরো তোমার বউ আর দু টুকরো ঘোড়াকে খেতে দিয়ো। বাকি দু টুকরো মাটিতে পুঁতো। পুঁতে তোমার মঙ্গল হবে।"

মাছটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যা-যা সে বলেছিল তাই করল জেলে। মাছের যে টুকরো দুটো সে মাটিতে পুঁতে ছিল সেখানে ফুটল সোনার দুটি পদ্মফুলের গাছ। ঘোড়ার হল সোনার দুটো বাচ্ছা। আর জেলের বউয়ের কোলে এল সোনার দুটি ছেলে।

ছেলে দুটি লম্বা-চওড়া আর সুন্দর হয়ে বড়ো হল। সেইসঙ্গে বড়ো হয়ে উঠল পদ্মফুলের গাছ দুটি আর ঘোড়ার বাচ্ছা দুটো। একদিন বাবাকে তারা বলল, "আমাদের সোনার ঘোড়ায় চড়ে আমরা দেশ ভ্রমণে বেরুব।"

বিষণ্ণ মুখে তাদের বাবা বলল, "তোরা কোথায় কেমন আছিস জানতে না পারলে আমার যে ভারি দুর্ভাবনা হবে।"

তারা বলল, "সোনার পদ্মফুলের গাছ দুটো এখানে রইল। তাদের দেখে জানতে পারবে আমরা কেমন আছি। এরা তাজা থাকলে বুঝবে আমরা ভালো আছি; নেতিয়ে পড়লে বুঝবে অসুখে পড়েছি; আর শুকিয়ে গেলে বুঝবে মারা গেছি।"

সোনার ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে তারা পৌঁছল এক সরাইখানায়। সেখানে ছিল অনেক লোকজন। সোনার ছেলেদের দেখে তারা হাসাহাসি আর ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। ছেলেদের একজন এই বিদ্রূপ সহ্য

করতে পারল না। দেশ ভ্রমণের কল্পনা ছেড়ে সে ফিরে গেল তার বাবার কাছে। অন্যজন আবার যাত্রা করে পৌঁছল এক গহন বনে। তার মধ্যে যাবার আগে লোকে তাকে বলল, সেটা ডাকাতদের আস্তানা। তার আর তার ঘোড়ার শরীর সোনা দিয়ে তৈরি বলে ডাকাতরা নির্ঘাত তাকে খুন করে ফেলবে।

কিন্তু তাদের কথায় ভয় না পেয়ে সে বলল, "বনের মধ্যে দিয়ে আমি এগিয়ে যাবই।" এই-না বলে ভালুকের চামড়া দিয়ে নিজেকে আর ঘোড়াকে সে ঢেকে নিল। খানিকটা যেতেই এক পাশ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "একটা লোক এসেছে।" অন্য পাশ থেকে কে যেন হাঁক ছাড়ল, "লোকটাকে যেতে দাও। দেখছ না ভালুকের চামড়া ছাড়িয়ে ও দিন গুজরান করে। লোকটা ভারি গরিব। ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।"

তাই সোনার ছেলে পারল বনের মধ্যে দিয়ে অক্ষত শরীরে চলে যেতে।

একদিন সে পৌঁছল এক গ্রামে। সেখানে দেখে একটি মেয়েকে। অমন সুন্দরী মেয়ে সে দেখে নি। দেখেই মেয়েটিকে সে ভালোবেসে ফেলল। তাই তার কাছে গিয়ে সে বলল, "তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমাকে বিয়ে করবে?"

সোনার ছেলেকে মেয়েটিরও খুব পছন্দ হয়ে গেল। তাই সঙ্গে-সঙ্গে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করতে রাজি। চিরকাল তোমাকে খুব ভালোবাসব।"

তাই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কনের বাবা ছিল বিদেশে। বাড়ি ফিরে সে দেখে বিয়ের ভোজ শুরু হয়ে গেছে। তাই অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল, "বর কে?" লোকে দেখিয়ে দিল সেই সোনার ছেলেকে। তার গায়ে তখনো ছিল ভালুকের চামড়া। তাই-না দেখে কনের বাবা ভীষণ রেগে বলল, "সাধারণ এক ভালুক-শিকারীর সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেব না।"

মেয়েটি তার বাবাকে বলল, "আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ওকে আমি খুব ভালোবাসি।"

কিন্তু মেয়েটির বাবার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেল—তার জামাই হয়েছে এক ভবঘুরে ভিখিরি। পরদিন খুব ভোরে উঠে আবার তাকে সে দেখতে এল। ভারি অবাক হয়ে সে দেখে—বিছানায় ঘুমোচ্ছে এক অপরূপ

সুন্দর সোনার একটি মানুষ আর মেঝেয় পড়ে রয়েছে ভালুকের চামড়াটা। চুপিচুপি সেখান থেকে সরে এসে আপন মনে সে বলে উঠল, 'ভাগ্যিস রাগ চেপে ছিলাম—নইলে হয়তো খুনখারাপি করে বসতাম।'

সোনার ছেলে স্বপ্ন দেখল, ভারি সুন্দর এক হরিণকে সে তাড়া করে চলেছে। তাই ঘুম ভাঙতে বউকে সে বলল, "আমি শিকারে বেরুচ্ছি।"

মেয়েটি খুব ভয় পেয়ে বলে উঠল, "দোহাই তোমার, যেয়ো না, বিপদ ঘটতে পারে।"

কিন্তু সে বলল, "আমি যাবই।" এই-না বলে শিকার করতে বনে গিয়েই তার নজরে পড়ল সুন্দর একটা হরিণ—স্বপ্নে যেমন দেখেছিল হুবহু সেইরকম। তাক করে সে গুলি ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় এক লাফে পালাল সেই হরিণ। খানা-খন্দ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সারাদিন হরিণকে সে তাড়া করে চলল। কিন্তু সন্ধেয় তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল হরিণটা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোনার ছেলের নজরে পড়ল একটা কুঁড়েঘর। সেখানে থাকত এক ডাইনি।

দরজায় টোকা দিতেই বুড়ি ডাইনি দোরগোড়ায় এসে প্রশ্ন করল, "বনের মধ্যে রাতে কি করছ?"

সে বলল, "ঠান্‌দি, একটা হরিণ দেখেছ?"

বুড়ি বললে, "দেখেছি। হরিণটাকে চিনি।" কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ির পায়ের কাছের ছোট্টো কুকুরটা তারস্বরে শুরু করল চেঁচাতে।

সোনার ছেলে বলে উঠল, "হতচ্ছাড়া, চুপ কর। নইলে গুলি করে মেরে ফেলব।"

তার কথা শুনে বুড়ি ডাইনি বলল, "কী বললে? আমার বাচ্চা কুকুরটাকে মেরে ফেলবে?" এই-না বলে সোনার ছেলেকে সঙ্গে-সঙ্গে সে করে দিল পাথর। এদিকে সোনার ছেলের বউ বৃথাই অপেক্ষা করে রইল তার বাড়ি ফেরার পথ চেয়ে।

শেষটায় মেয়েটি ভাবল, 'যা ভয় করেছিলাম নিশ্চয়ই তাই হয়েছে—ও বিপদে পড়েছে। তাই এমন উতলা লাগছে।'

এদিকে তখন অন্য ভাই দাঁড়িয়েছিল পদ্মফুলের সোনার গাছ দুটোর পাশে। সে দেখল, হঠাৎ মুষড়ে পড়েছে একটা গাছ।

তাই-না দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় হায়! ভাই নিশ্চয়ই ভীষণ

বিপদে পড়েছে। এক্ষুনি বেরিয়ে দেখি তাকে সাহায্য করতে পারি কি না।"

এই-না বলে ঘোড়া চড়ে সোজা সে চলে এল সেই বনে, যেখানে ভাই তার পাথর হয়ে পড়েছিল।

বুড়ি ডাইনি তার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে তাকে ডাকল নিজের কাছে। সে কিন্তু ডাইনির কাছে না গিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "আমার ভাইকে এক্ষুনি বাঁচিয়ে না দিলে তোমায় আমি গুলি করে মারব।"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আঙুলের ডগা দিয়ে ডাইনি ছুঁলো সেই পাথরটা আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই সোনার ছেলে ফিরে পেল তার মানুষের দেহ।

তার পর সোনার দুই ভাই ঘোড়ায় চড়ে বেরুল বন থেকে। একজন ফিরল তার বউয়ের কাছে আর অন্যজন তার বাবার বাড়িতে।

তার বাবা বলল, "ভাইকে তুমি যে বাঁচিয়ে তুলেছ সে কথা আগেই জানতে পেরেছি। কারণ হঠাৎ দেখি পদ্মফুলের সোনার গাছটা তাজা হয়ে উঠেছে, আর তাতে ফুটেছে সোনার পদ্ম।"

তার পর থেকে আজীবন তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে রইল।

রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে

বহু বছর আগে এক রাজপুত্তুরের কুষ্ঠিতে ছিল, ষোলো বছর বয়সে এক ছেলে-হরিণ তাকে মেরে ফেলবে। বড়ো হবার পর একদিন বনে শিকার করতে গিয়ে সে পথ হারাল। হঠাৎ সে দেখে প্রকাণ্ড একটা ছেলে-হরিণ। বন্দুক তুলে টিপ্ করে সেটার দিকে বার কয়েক সে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু কোনো গুলিই হরিণের গায়ে লাগল না। রাজপুত্তুর ছুটল হরিণটার পিছন-পিছন। বনের বাইরে পৌঁছলে পর হঠাৎ হরিণটা সুস্থ সবল লোক হয়ে উঠে বলল, "তোমার খোঁজে ছ জোড়া কাঁচের স্কেট ক্ষইয়ে ফেলেছি। এতদিন পরে আজ তোমায় বাগে পেলাম।"

জাদুর মায়ায় এক রাজা এই ছেলে-হরিণ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি থাকতেন মস্ত এক কেল্লায়। হ্রদের মধ্যে দিয়ে সেই কেল্লায় রাজপুত্তুরকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন। রাজার সঙ্গে রাজপুত্তুর খাওয়া-দাওয়া করবার পর রাজা তাকে বললেন, "আমার তিনটি মেয়ে আছে। রাত নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত আমার বড়ো মেয়েকে তুমি পাহারা দেবে। প্রত্যেকবার ঘড়ি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার নাম ধরে ডাকব। উত্তর না দিলে তোমায় মরতে হবে। কিন্তু উত্তর দিলে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

রাজপুত্তুর যখন রাজার আদেশ পালন করার জন্য উপরতলায় চলেছে, বড়ো রাজকন্যে তখন এক পাথরের মূর্তিকে বলল, "আমার বাবার ডাকে রাজপুত্তুর সাড়া দিতে ভুলে গেলে তার হয়ে তুমি উত্তর দেবে।"

পাথরের মূর্তি প্রথমে জোরে-জোরে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। আর তার পর ক্রমশ তার মাথা হেলানো কমে আসতে-আসতে শেষটায় একেবারে গেল থেমে।

বড়ো রাজকন্যের ঘরের বাইরেকার পাপোষের উপর ঘুমোবার জন্যে রাজপুত্তুর শুয়ে পড়ল।

রাজপুত্তুর ভালো করে তার কর্তব্য করেছে বলে পরদিন সকালে সন্তোষ প্রকাশ করে রাজা বললেন, "আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার আগে আমাকে আরো খানিক ভেবে দেখতে হবে। আজ রাতে তুমি পাহারা দেবে আমার মেজো মেয়েকে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় তোমায় ডাকব। উত্তর না দিলে তোমায় মরতে হবে।"

আবার উপরতলায় যাবার সময় একটা পাথরের মূর্তির পাশ দিয়ে তারা গেল। এটা আগেকার মূর্তির চেয়ে বড়ো। মেজো রাজকন্যে তাকে বলল, "রাজা ডাকলে তুমি সাড়া দিয়ো।"

পাথরের মূর্তি প্রথমে তাড়াতাড়ি মাথা হেলাল। তার পর ক্রমশ তার মাথা হেলানো কমে আসতে-আসতে শেষটায় একেবারে থেমে গেল।

মেজো রাজকন্যের ঘরের সামনেকার পাপোষে রাজপুত্তুর পড়ল ঘুমিয়ে।

রাজপুত্তুর ভালো করে তার কর্তব্য করেছে বলে পরদিন সকালে আবার সন্তোষ প্রকাশ করে রাজা বললেন, "মেজো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত আমায় ভেবে দেখতে হবে। আজ রাতে আমার ছোটো মেয়েকে পাহারা দিয়ো। আমি ডাকলে যদি সাড়া না পাই তা হলে তোমায় মরতে হবে।"

এবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল আরো বড়ো একটা পাথরের মূর্তি। ছোটো রাজকন্যে তাকে বলল, "বাবা ডাকলে সাড়া দিয়ো।" এ-মূর্তিটাও প্রথমে চট্‌পট্‌ পরে ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে শেষটায় থেমে গেল।

আর ছোটো রাজকন্যের দোরগোড়ার পাপোষে শুয়ে রাজপুত্তুর পড়ল ঘুমিয়ে। পরদিন সকালে রাজা বললেন :

"পাহারা তুমি খুব ভালোই দিয়েছ স্বীকার করছি। কিন্তু কাছেই যে বড়ো বন রয়েছে সেটার সব গাছ তুমি কেটে ফেলতে না পারলে ছোটো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারব না। আজ সন্ধে ছটার মধ্যে গাছগুলো কেটে বিরাট গাদা করে তোমায় রাখতে হবে।" তার পর

রাজা তাকে দিলেন কিছু যন্ত্রপাতি, একটা বালি-ঘড়ি আর কাঁচের একটা করাত।

বনে পৌঁছে রাজপুত্র কুড়ুলের প্রথম কোপ বসাতেই সেটা খান্-খান্ হয়ে গেল। এটা দেখে একেবারে হতাশ হয়ে বসে রাজপুত্তুর শুরু করে দিল কাঁদতে।

দুপুরে রাজা তাঁর মেয়েদের বললেন, "তোমাদের কেউ একজন রাজপুত্তুরের জন্যে খাবার নিয়ে যাও।"

বড়ো দুজন রাজি হল না। বলল, "ছোটো বোন খাবার নিয়ে যাক।"

ছোটো বোন তাই খাবার নিয়ে বেরুল। রাজপুত্তুরের কাছে পৌঁছে সে প্রশ্ন করল, "কাজ কী রকম এগুচ্ছে?"

রাজপুত্তুর বলল, "আমার অবস্থা সঙ্গীন।"

ছোটো রাজকন্যে তাকে অনেক করে বলল, খাবারটা খেয়ে নিলে সে ভালো বোধ করবে।

রাজপুত্তুর বলল, "আমার কোনো আশা-ভরসা দেখছি না। এ অবস্থায় খাই কী করে?"

রাজকন্যে কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাবার খাওয়াল। তার পর বলল, "এবার তোমাকে গান শোনাচ্ছি। তা হলে তোমার মন ভালো হবে।"

এই-না বলে রাজকন্যে ভারি মিষ্টি সুরে গান গাইতে শুরু করল। আর গান শুনতে-শুনতে রাজপুত্তুর পড়ল অঘোরে ঘুমিয়ে।

রাজকন্যে তখন তার সাদা রুমাল বার করে গিঁট বেঁধে মাটিতে

তিন বার আছড়ে বলে উঠল, "কারিগরের দল, বেরিয়ে এসো।" আর সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে বামন হাজির হয়ে প্রশ্ন করল, রাজকন্যে কী চায়।

সে বলল, "বনের সব গাছ কেটে কাঠগুলো গাদা করে সাজিয়ে রাখতে হবে। তিন ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ হওয়া দরকার।"

সাহায্য করার জন্য বামনরা ডেকে পাঠাল তাদের সব আত্মীয়-বন্ধুদের। তিন ঘণ্টা পরে রাজকন্যেকে তারা জানাল, কাজ শেষ হয়েছে। রাজকন্যে তখন মাটিতে আবার তিনবার রুমাল আছড়ে বলল, "কারিগরের দল, বাড়ি যাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে তারা হল অদৃশ্য। রাজপুত্তুর জেগে উঠে কাজ শেষ দেখে স্বস্তির নিশ্বেস ফেলল।

রাজকন্যে বলল, "ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ছটা বাজলে বাড়ি ফিরো।"

রাজপুত্তুর কেল্লায় ফিরলে রাজা প্রশ্ন করলেন, "গাছগুলো কেটেছ?" সে বলল, "হ্যাঁ।"

ডিনার খাবার সময় রাজা বললেন, "এখনো আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব না। আমার একটা প্রকাণ্ড পুকুর আছে। সেটার জল আয়নার মতো তোমায় পরিষ্কার করে ফেলতে হবে যাতে তার মধ্যেকার ভালো-ভালো মাছদের দেখা যায়।"

পরদিন সকালে রাজা তাকে একটা কাঁচের কোদাল দিয়ে বললেন, "সন্ধে ছটার মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।"

রাজপুত্তুর কোদাল চালাতেই কাদায় সেটা আটকে গেল আর তার হাতলটা হয়ে গেল খান্-খান্। আবার গভীর হতাশায় ভরে উঠল রাজপুত্তুরের মন।

খাবার নিয়ে এসে ছোটো রাজকন্যে আগের মতো আবার প্রশ্ন করল, "কাজ কী রকম এগুচ্ছে?" রাজপুত্তুর জানাল—সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই সে দেখছে না। তাকে আবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজকন্যে খাবার খাওয়াল তার পর তার গান শুনতে-শুনতে রাজপুত্তুর আবার পড়ল ঘুমিয়ে।

রাজকন্যে তখন আবার তার সাদা রুমাল বার করে গিঁট বেঁধে মাটিতে তিনবার আছড়ে বলে উঠল, "কারিগরের দল, বেরিয়ে এসো।"

সঙ্গে-সঙ্গে বামনরা হাজির হয়ে প্রশ্ন করল, "কী চাই?"

"তিন ঘণ্টার মধ্যে পুকুরটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আয়নার মতো জল যেন পরিষ্কার হয় যাতে তার মধ্যেকার ভালো-ভালো মাছদের দেখা যায় সাঁতার কাটতে।"

আবার সাহায্য করার জন্য বামনরা তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে পাঠাল আর তিন ঘণ্টার মধ্যে তারা শেষ করে ফেলল কাজটা।

রাজকন্যে তখন মাটিতে রুমাল আছড়ে বলল, "কারিগরের দল, বাড়ি যাও।" যাবার সময় রাজপুত্তুরকে রাজকন্যে বলে গেল, ছটার সময় সে যেন বাড়ি ফেরে।

রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন, "পুকুর পরিষ্কার হয়েছে?"

রাজপুত্তুর বলল, "হ্যাঁ।"

দেখে মনে হল রাজা খুব খুশি হয়েছেন। কিন্তু ডিনারের সময় তিনি বললেন, "আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে তোমাকে আরো একটা কাজ করতে হবে। কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাহাড় আছে। গোলাপ-ঝাড়ে সেটা ঢাকা। সেগুলো কেটে পাহাড়ের ওপর একটা কেল্লা বানাও। সেই কেল্লার কোথাও যেন কোনো জুড়ি না থাকে। আর সেটার প্রতিটি ঘরে যেন থাকে সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র।"

সকালে রাজা তাকে দিলেন একটা বালি-ঘড়ি আর কাঁচের তুরপুন আর বললেন কাজটা শেষ হওয়া দরকার সন্ধে ছটার মধ্যে। প্রথম গোলাপ-ঝাড়টা কাটতে গিয়ে রাজপুত্তুরের কাঁচের তুরপুনটা খান্-খান্ হয়ে গেল আর সব আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে সে পড়ল বসে। তার পর রাজকন্যেকে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাকে সব কথা বলল। আবার রাজকন্যে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াল আর তার পর রুমালে গিঁট দিয়ে মাটিতে আছড়ে বলল, "কারিগরের দল বেরিয়ে এসো।" সঙ্গে-সঙ্গে বামনের দল হাজির হল।

রাজকন্যে তাদের বলল, "সমস্ত গোলাপ-ঝাড় কেটে পাহাড়ের চুড়োয় তোমাদের বানাতে হবে চমৎকার একটা কেল্লা। আর সেটার প্রতিটি ঘরে যেন থাকে সুন্দর-সুন্দর আসবাবপত্র। তিন ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ শেষ হওয়া চাই।"

সাহায্য করার জন্য আবার বামনরা তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে পাঠিয়ে কাজে লেগে গেল।

সন্ধে ছটায় রাজকন্যেকে গিয়ে তারা জানাল, কাজ শেষ হয়েছে।

রাজকন্যে তার রুমাল মাটিতে আছড়ে বলল, "কারিগরের দল, বাড়ি যাও।" সঙ্গে-সঙ্গে তারা হল অদৃশ্য।

ঘুম থেকে উঠে সব কাজ শেষ দেখে রাজপুত্তুরের আনন্দ আর ধরে না। রাজকন্যের সঙ্গে সে তখন ফিরল কেল্লায়।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "কেল্লাটা শেষ হয়েছে?"

রাজপুত্তুর বলল, "হ্যাঁ।"

কিন্তু ডিনারের সময় রাজা বললেন, "আমার দুই মেয়ের বিয়ে না হবার আগে তোমার সঙ্গে ছোটো মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না।"

রাজার কথা শুনে দুজনেই তারা খুব হতাশ হয়ে পড়ল। শেষে স্থির করল চুপি চুপি পালিয়ে যাবে।

বেশি দূর তারা যায় নি। এমন সময় রাজকন্যে দেখল তার বাবাকে আসতে। রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি আর বাড়ি ফিরব না। তোমাকে একটা গোলাপ-ঝাড় করে দিচ্ছি। আমি সেখানে থাকব একটা গোলাপ কুঁড়ি হয়ে।"

রাজা তাদের কাছে পৌঁছে দেখেন একটা গোলাপ-ঝাড় আর তাতে একটা গোলাপ কুঁড়ি। কুঁড়িটা তুলতে যেতে গোলাপ কাঁটাগুলো এমন সাংঘাতিকভাবে তাঁর গায়ে ফুটতে লাগল যে, সেটা তোলার আশা তিনি ছেড়ে দিলেন। তাঁকে একা বাড়ি ফিরতে দেখে ভীষণ রেগে রানী বললেন, "কুঁড়িটি তুলতে পারলে গাছটা নিশ্চয়ই পেছন পেছন আসত।" তাই আর একবার চেষ্টা করার জন্য রাজা আবার-বেরুলেন।

ততক্ষণে রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের নাগাল ধরার জন্য রাজাকে ছুটতে হল খুব জোরে।

রাজাকে আসতে দেখে রাজকন্যে বলল, "তোমাকে একটা গির্জে করে দিচ্ছি। আমি হব সেখানকার যাজক। গির্জের মঞ্চ থেকে আমি ধর্ম-উপদেশ দিতে থাকব।"

হাঁপাতে হাঁপাতে রাজা গির্জেয় ঢুকলেন। তার পর যাজকের ধর্ম-উপদেশ শুনে বাড়ি ফিরলেন।

ভীষণ রেগে রানী বললেন, "তুমি একেবারে অপদার্থ। যাজককে কেন তুমি সঙ্গে করে বাড়ি আনলে না? আনলে নিশ্চয়ই গির্জেটা পেছন পেছন আসত। এবার আমি নিজে যাচ্ছি।"

বহু মাইল যাবার পর দূর থেকে রাজকন্যেকে রানী দেখতে পেলেন।

রাজকন্যে বলে উঠল, "সর্বনাশ। এবার দেখছি মা আসছেন! তোমাকে একটা পুকুর করে দিচ্ছি। আমি তার মধ্যে থাকব একটা মাছ হয়ে।"

রানী তাদের কাছে পৌঁছে দেখেন—একটা পুকুর; তার মাঝখানে একটা মাছ লাফাচ্ছে। বহু চেষ্টা করেও মাছটাকে তিনি ধরতে পারলেন না। সেটাকে ধরবার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন সমস্ত জল পান করে পুকুরটাকে খালি করতে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। তাই শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, "রাজার মতো আমিও অপদার্থ।" তার পর রানী তাদের কাকুতি-মিনতি করে বললেন তাঁর কাছে আসতে। তারা এলে পর মেয়েকে তিনি তিনটে আখরোট দিয়ে বললেন, "এগুলো সঙ্গে রাখ। একদিন কাজে লাগবে।" তার পর তাদের দুজনকে তিনি যেতে দিলেন।

যে-কেল্লায় রাজপুত্তুর জন্মেছিল সেখানে পৌঁছে তারা উঠল এক গ্রামে। তার পর রাজকন্যেকে রাজপুত্তুর বলল, "এখানে তুমি অপেক্ষা কর। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কেল্লা থেকে লোক-লস্কর আর একটা জুড়িগাড়ি নিয়ে আসছি।"

বাড়িতে তাকে ফিরতে দেখে সবাই খুব খুশি হল।

তাদের সে বলল, গ্রামে তার কনে রয়েছে। জুড়িগাড়ি করে তাকে সে নিয়ে আসবে। জুড়িগাড়িতে সে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বুড়ি রানী তার ঠোঁটে চুমু খেলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে সব-কিছু ভুলে গেল সে।

তার মা আদেশ দিলেন জুড়িগাড়িটাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে। তার পর সবাই মিলে আবার ফিরে গেল কেল্লায়।

বেচারা রাজকন্যে দিনের পর দিন সেই গ্রামে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু তাকে নিতে কেউই এল না। তাই কিছুকাল পরে কেল্লার কাছে এক জাঁতাকলে সে চাকরি নিল। সেখানে ছিল হাড়ভাঙা খাটুনি। তা ছাড়া প্রতি সন্ধেয় নদীতে গিয়ে তাকে মাজতে হত হাঁড়িকুড়ি। কিন্তু জাঁতাওয়ালা মানুষটি ছিল খুব দয়ালু। তাই তার কাছে অনেক দিন সে কাজ করল।

একদিন রাজপুত্তুরের মা নদীর তীরে বেড়াতে এসে দেখলেন সেই ছোটো রাজকন্যেকে। রানী তাঁর সঙ্গিনীদের কাছে মেয়েটির রূপের খুব

প্রশংসা করলেন। সবাই তার দিকে তাকাল। কিন্তু কেউই জানতে পারল না—আসলে সে কে।

ইতিমধ্যে ছেলের জন্য রানী এক কনে পছন্দ করেছিলেন। মেয়েটি এসেছিল অনেক দূরের এক দেশ থেকে। শোনা যায় সে ছিল খুবই রূপসী। মেয়েটি কেল্লায় পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেল। ছোটো রাজকন্যে বিয়ে দেখতে যাবার অনুমতি চাইতে জাঁতাওয়ালা আপত্তি করল না। ছোটো রাজকন্যে তার মায়ের দেওয়া একটা আখরোট খুলতে দেখে তার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর একটি পোশাক। সেটা পরে সে গেল গির্জেয়। পূজাবেদীর কাছে গিয়ে সে বসল আর তার রূপ দেখে সবাই হল মুগ্ধ। তার পর বর-কনে পৌঁছল সেই পূজাবেদীর কাছে। আর যাজক যখন তাদের বিয়ে দিতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে কনে পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল সুন্দর পোশাক-পরা অচেনা মেয়েটিকে। কনে নতজানু হয়ে বসেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল, ঐরকম পোশাক না হলে রাজপুত্তুরকে সে বিয়ে করবে না। তাই বিয়ে সেদিন ভেঙে গেল। যে-যার বাড়ি গেল ফিরে।

অচেনা মেয়েটিকে প্রশ্ন করা হল, পোশাকটা সে বিক্রি করবে কি না। উত্তরে সে জানাল তার একটা অনুরোধ রাখলে বিনা পয়সায় পোশাকটা সে দিয়ে দেবে কনেকে। তাকে প্রশ্ন করা হল—কী তার অনুরোধ। মেয়েটি বলল, রাজপুত্তুরের দোরগোড়ার পাপোষে এক রাত সে ঘুমোতে চায়। সেখানে ঘুমোবার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। কিন্তু চাকরদের নির্দেশ দেওয়া হল ঘুমোতে যাবার আগে রাজপুত্তুরকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেবার।

ছোটো রাজকন্যে পাপোষে শুয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চেঁচিয়ে বলে চলল, "তোমাকে কি আমি বনের সব গাছ কাটতে, একটা পুকুর পরিষ্কার করতে, একটা কেল্লা বানাতে সাহায্য করি নি? তোমার জীবন বাঁচাবার জন্যে তোমাকে কি আমি একটা গোলাপ-ঝাড়, গির্জে আর পুকুর করে দিই নি? সব কথা কি এখন ভুলে গেছ?"

রাজপুত্তুর অবশ্য তার কোনো কথাই শুনতে পেল না। কিন্তু চাকররা শুনল সব কথা।

অচেনা মেয়েটির সুন্দর পোশাক পরে পরদিন বরের সঙ্গে কনে

গেল গির্জেয়। এদিকে ছোটো রাজকন্যে দ্বিতীয় আখরোট খুলে আগের চেয়েও সুন্দর পোশাক পরে হাজির হল সেখানে।

আগের বারের মতোই সব-কিছু আবার ঘটল।

ছোটো রাজকন্যে আবার গিয়ে শুলো রাজপুত্তুরের পাপোষে। চাকরদের আবার নির্দেশ দেওয়া হল রাজপুত্তুরকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে। এবার কিন্তু সে-নির্দেশ তারা মানল না। ঘুমের ওষুধের বদলে এমন একটা সরবত তারা দিল যেটা জাগিয়ে রাখে। ছোটো রাজকন্যে কাঁদতে-কাঁদতে আগের রাতের কথাগুলো বলতে রাজপুত্তুর শুনল আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল অতীতের সব ঘটনার কথা। বিছানা থেকে তক্ষুনি সে চলে যেত ছোটো রাজকন্যের কাছে। কিন্তু রানী তার দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ছোটো রাজকন্যেকে খুঁজে বার করে সে জানাল—কী করে সব কথা ভুলে গিয়েছিল। ছোটো রাজকন্যে তখন তৃতীয় আখরোট খুলে বার করল আর-একটা পোশাক—আগের দুটোর চেয়েও সেটা সুন্দর। সেই পোশাক পরে গির্জেয় গিয়ে রাজপুত্তুরকে সে বিয়ে করল। ফুট্‌ফুটে ছেলে মেয়েরা তাদের পথে ছড়িয়ে দিল ফুলের পাপড়ি। আর তার পর সেখানে এমন আমোদ-আহ্লাদের বান ডাকল যার তুলনা নেই।

অন্য কনে আর পাজি বুড়ি রানীকে পরের ট্রেনেই কেল্লা ছেড়ে যেতে হল।

[এ গল্পটা যে-ই বলুক-না কেন—শেষটা বলতে-বলতে নিশ্চয়ই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।]

তিন জাদুকর

জাদুবিদ্যা শেখার পর নানা দেশ ঘুরতে-ঘুরতে তিন জাদুকর পৌঁছল এক সরাইখানায়। সেখানে রাত কাটাতে গেলে সরাইখানার মালিক জানতে চাইল—কোথা থেকে তারা আসছে আর কোথায় চলেছে,

তারা বলল, "আমাদের জাদুর খেলা দেখাবার জন্যে দেশে—দেশে ঘুরছি।"

সরাইখানার মালিক বলল, "তোমরা কী-কী পার, দেখাও।"

প্রথম জাদুকর বলল, সে তার হাত কেটে পরদিন সকালে আবার সেটা জুড়তে পারে। দ্বিতীয় জাদুকর বলল, সে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বার করে পরদিন সেটা আবার ঠিক জায়গায় বসাতে পারে। তৃতীয় জাদুকর বলল, সে তার চোখদুটো উপড়ে পরদিন সকালে আবার ঠিক জায়গায় লাগাতে পারে।

সরাইখানার মালিক বলল, "তোমাদের কথা সত্যি হলে মানতেই হবে তোমরা মস্ত আর্টিস্ট।"

জাদুকরদের সঙ্গে ছিল ক্ষত সারাবার এক বোতল মলম। সব সময় সেটা তারা সঙ্গে রাখত। তাই নির্ভয়ে একজন কাটল তার হাত, একজন ছিঁড়ে বার করল তার হৃৎপিণ্ড আর একজন ওপড়াল তার চোখ দুটো। সেগুলো প্লেটে রেখে তারা দিল সরাইখানার মালিককে। সরাই খানার মালিক প্লেটটা এক দাসীকে দিয়ে বলল খাবারের আলমারিতে তুলে রাখতে।

দাসী লুকিয়ে-লুকিয়ে ভালোবাসত এক সৈনিককে, সরাইখানার

মালিক, তিন জাদুকর আর বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর, সেই সৈনিক এসে খাবার চাইল, সৈনিকের জন্য মেয়েটি আলমারি থেকে খাবার এনে হাসি-গল্পে উঠল মেতে। আলমারির পাল্লা বন্ধ করার কথা তার মনেই রইল না।

এদিকে হল কি—বাড়ির বেড়ালটা চুপি-চুপি না এসে তিন জাদু-করের হাত, হৃৎপিণ্ড আর চোখদুটো আলমারি থেকে নিয়ে নিঃশব্দে পড়ল সরে।

সৈনিকের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে ডিস্‌গুলো আলমারিতে রাখতে গিয়ে দাসী দেখল—সর্বনাশ হয়েছে, আঁতকে তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, "এখন করি কী? হাতটা নেই। হৃৎপিণ্ডটা নেই। চোখ দুটোও নেই। আমার কী হবে?"

সৈনিক বলল, "ঘাবড়ো না। বাইরে ফাঁসিকাঠে একটা চোর লট্‌কে রয়েছে। কোন হাতটা নেই?"

সৈনিককে একটা ধারাল ছুরি দিয়ে দাসী বলল, "ডান হাতটা।"

চোরের ডান হাতটা সৈনিক কেটে আনল। তার পর বেড়ালটাকে ধরে উপড়ে নিল তার চোখদুটো। বাকি রইল শুধু হৃৎপিণ্ডটা।

সৈনিক বলল, "আজ তো তোমরা একটা শুয়োর মেরেছ। মরা শুয়োরটা নিশ্চয়ই মাটির তলার ঘরে আছে।"

দাসী বলল, "হ্যাঁ।"

মাটির তলার ঘরে গিয়ে সৈনিক তখন কেটে আনল শুয়োরের হৃৎপিণ্ডটা।

সেগুলো একটা প্লেটে নিয়ে দাসী তুলে রাখল খাবারের আলমারিতে। তার পর সৈনিক চলে যেতে হালকা মনে গিয়ে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাসীকে তিন জাদুকর প্লেটটা নিয়ে আসতে বলল, যাতে ছিল হাত, হৃৎপিণ্ড আর চোখদুটো। দাসী সেটা আনতে প্রথম জাদুকর জাদুর মলম দিয়ে চোরের হাতটা জুড়ে নিল, দ্বিতীয় জাদুকর বেড়ালের চোখদুটো বসাল নিজের চোখের কোটরে আর শুয়োরের হৃৎপিণ্ড লাগিয়ে নিল তৃতীয় জাদুকর।

তাদের কাণ্ড-কারখানা ভীষণ অবাক হয়ে দেখে সরাইখানার

মালিক খুব তারিফ করে বলল—এরকম আশ্চর্য ঘটনা আগে কখনো সে দেখে নি। বলল, তাদের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা দিকে দিকে সে প্রচার করবে। তারা বিল চুকিয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল।

খানিক যাবার পর যে জাদুকরের বুকে শুয়োরের হৃৎপিণ্ড শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে দল-ছাড়া হয়ে সে ছুটে-ছুটে যেতে লাগল ময়লা-গাদার দিকে। সঙ্গীরা তার কোটের কলার চেপেও ধরে রাখতে পারল না।

দ্বিতীয় জাদুকর তার চোখদুটো রগড়ে বলল, "দোস্ত! ব্যাপারটা বুঝছি না। এ-দুটো আমার চোখ নয়! কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার হাত ধরে নিয়ে চলো। নইলে পড়ে যাব।"

এইভাবে কষ্টেসৃষ্টে যেতে-যেতে সন্ধেয় তারা পৌঁছল আর-একটা সরাইখানায়, একসঙ্গে তারা গেল কফি খাবার ঘরে। সেখানে এক কোণে বসে এক ধনী লোক তার মোহরগুলো গুণছিল। যে জাদুকরের চোরের হাত সেখানে সে ঘুর্-ঘুর্ করতে লাগল। তার হাতটা উঠল নিশ্‌পিশ্ করে। আর যেই-না সেই ভদ্রলোক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে চক্ষের নিমেষে সে হাতিয়ে নিল এক মুঠো মোহর।

অন্য দুজন জাদুকর বলে উঠল, "দোস্ত করলে কী? চুরি করা যে মহাপাপ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।"

প্রথম জাদুকর বলল, "সে কথা জানি কিন্তু আমার হাতটা এমন নিশ্‌পিশ্ করছিল যে নিজেকে সামলাতে পারলাম না।"

তারা তিনজন বিছানায় গিয়ে শুলো। এমন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার যে কিচ্ছুটি দেখা যায় না।

কিন্তু যে জাদুকরের বেড়াল-চোখ হঠাৎ সে জেগে উঠে অন্যদের জাগিয়ে বলল, "দোস্ত-দোস্ত! চারি দিকে তাকাও, দেখছ না সাদা ইঁদুরগুলো ঘরময় ছুটোছুটি করছে?"

অন্য দুজন উঠে বসল। কিন্তু কিচ্ছুটি দেখতে পেল না।

তখন তাদের একজন বলে উঠল, "আমরা নিশ্চয়ই ভুল হাত, চোখ আর হৃৎপিণ্ড পেয়েছি। চলো আমরা সরাইখানায় ফিরে যাই। আমাদের ঠকিয়েছে বলে সেখানকার মালিকের নামে আমরা অভিযোগ আনব।"

পরদিন আগেকার সরাইখানায় গিয়ে মালিককে তারা বলল—তাদের

একজনের চোরের হাত, একজনের বেড়ালের চোখ আর একজনের শুয়োরের হৃৎপিণ্ড।

মালিক বলল, সেটা তার দোষ নয়। দোষটা নিশ্চয়ই দাসীর। নিজের নাম শুনে দাসী পালাল খিড়কি দিয়ে। আর সে মুখো হল না। তার পর মালিক তার যথাসর্বস্ব জাদুকরদের দিতে তারা চলে গেল। কিন্তু নিজেদের আসল জিনিসগুলো পেলেই তারা খুশি হত।

সাত বীরপুরুষ

এক সময় সোয়াবিয়াতে সাত বীরপুরুষ একসঙ্গে থাকত। তাদের নাম মাস্টার শুলজ্, মার্লি, জ্যাক্লি, জের্গ্লি, মিচাল্, হান্স্ আর ভেইৎলি। একদিন তারা স্থির করল এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়বে। দেশে-দেশে করে চলবে অসমসাহসিক কাজ। কামারকে দিয়ে তারা বানিয়ে নিল লম্বা আর মজবুত লোহার একটা শিক। সেটাই হল তাদের অস্ত্র। নিজেদের মধ্যে যাতে ছাড়াছাড়ি না হয় তাই তারা সেই সাতজন সার বেঁধে সেটা শক্ত করে ধরে রইল। তাদের মধ্যে মাস্টার শুল্জ্-এর চেহারাটাই সব চেয়ে বড়ো, সবাইকার চেয়ে শক্তিও তার বেশি। তাই সারিতে সে-ই দাঁড়াল প্রথম। তার পর আকার অনুসারে অন্যরা। ভেইৎলি দাঁড়াল সবার শেষে।

তখন মাঠে-মাঠে খড়-শুকোবার সময়। যে-গ্রামে তারা রাত কাটাবে ভেবেছিল সারাদিন হাঁটার পর সন্ধেতেও সেখানে তারা পেঁছুতে পারল না। এমন সময় একটা ফিঙে জোরে-জোরে ডাকতে-ডাকতে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

তাই শুনে মাস্টার শুল্জ্ দারুণ ভয় পেয়ে গেল। ঘেমে নেয়ে উঠল। লোহার শিকটা আর-একটু হলেই তার হাত থেকে ফস্কে যেত। অন্যদের সে হেঁকে বলল, "শোনো-শোনো! দামামার শব্দ না?"

শিক ধরে তার পাশে ছিল জ্যাক্লি। সে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বারুদের গন্ধ পাচ্ছি।"

তার কথা শুনে প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে মাস্টার শুল্জ্ একটা বেড়া

টপকে পড়ল খড়-গাদায়। এক চাষী সেখানে তার আঁকশি ফেলে গিয়েছিল। সেটার ইস্পাতের দিক তার মুখে ফুটতে সে চেঁচিয়ে উঠল, "গেলাম! গেলাম! আমাকে বন্দী কর! আমি আত্মসমর্পণ করছি।"

অন্য দুজনও লাফাতে-লাফাতে এ ওর ঘাড়ে পড়ে তারস্বরে তখন চেঁচাতে শুরু করে দিল, "তুমি আত্মসমর্পণ করলে আমরাও করব!" শেষটায় কোনো শত্রু তাদের ধরে-বেঁধে নিয়ে না যাওয়ায় তারা বুঝল—মিছিমিছি তারা ভয় পেয়েছিল। কথাটা লোকের কানে পৌঁছলে তাদের নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করবে। তাই প্রত্যেকে প্রত্যেককে কথা দিল—মুখ বুজে থাকবে, কাউকে এ-বিষয়ে কোনো কথা বলবে না। তার পর আবার চলল এগিয়ে।

দ্বিতীয় যে-বিপদে তারা পড়ল সেটার সঙ্গে আগেরটার কোনো মিল ছিল না। তাদের পথ গিয়েছিল একটা অনাবাদী জমির ভিতর দিয়ে। সেখানে রোদে শুয়ে কান খাড়া করে বড়ো-বড়ো চোখ মেলে ঘুমোচ্ছিল একটা খরগোশ। এই নিষ্ঠুর বুনো জন্তুকে দেখে ঠক্‌ঠক্ করে তাদের হাঁটু কাঁপতে লাগল। নিজেদের মধ্যে তারা পরামর্শ করতে লাগল—কোন পথে যাওয়া কম বিপজ্জনক। তারা দৌড় দিলে দানবটা নিশ্চয়ই তাদের ধরে সাবাড় করে ফেলব, তাই তারা বলাবলি করল, "ভীষণ একটা লড়াই আমাদের লড়তে হবে, ভাগ্য সাহসীদের সহায় হয়।" তার পর তারা সাতজন শিকটা ধরল শক্ত করে চেপে—একপ্রান্তে মাস্টার শুল্‌জ্, অন্য প্রান্তে ভেইৎলি। মাস্টার শুল্‌জ্-এর ইচ্ছে ছিল শিকটা শক্ত করে ধরে থাকার। কিন্তু ভেইৎলির সাহস এমনি বেড়ে উঠল যে সে চাইল সোজা আক্রমণ করতে। চেঁচিয়ে সে বলে উঠল:

"দেশের নামে করব তাড়া,
নইলে তোমার দফা সারা।"

হান্‌স্ জুড়ে দিল:

"রাজা-উজির মুখেই মারো,
ড্রাগনকে দেখি তাড়া কর!"

মিচাল গেয়ে উঠল:

"একটা রোঁয়াও রাখব না,
যমরাজকেও মানব না।"

তার পালা আসতে জেরুগিল বলে উঠল :

"হয় যদি তার ভাই বা মা,
আমার কাছে নেইকো ক্ষমা।"

মার্‌লি যোগ করল :

"ভেইৎলি তুই এগিয়ে যাবি,
পেছনে আমি—খাস না খাবি।'

ভেইৎলি না এগুতে জ্যাক্‌লি বলে উঠল :

"শুল্‌জ্‌ যাবে সামনে
সম্মানে আর সসম্মানে।"

তখন মাস্টার শুল্‌জ্‌-এর সাহস বেড়ে ওঠায় বীরদর্পে সে গেয়ে উঠল :

"চল্‌ চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌
উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল।"

এই-না বলে সবাই মিলে তারা তেড়ে গেল ড্রাগনটার দিকে। যত তারা শত্রুর দিকে এগোয় ততই শুল্‌জ্‌-এর ভয় থাকে বাড়তে। শেষটায় ভয়ের চোটে সে চাপা গলায় চেঁচাতে শুরু করে দিল, "হেই মরেছি! হেই মরেছি।"

আর তার চেঁচানি শুনে জেগে উঠে খরগোশ্‌টা দিল ভোঁ দৌড়।

তাই-না দেখে মনের ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল মাস্টার শুল্‌জ্‌ :

"ছুট দিল কে হোঁস্‌ফোঁস্‌?
এ যে দেখছি খরগোশ্‌।"

সোয়াবিয়ার বীরপুরুষরা আরো এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে তার পর পেঁাছল মোজেল্‌-এ। সেটা একটা শ্যাওলা ঢাকা, নোংরা, গভীর নদী। সেটা পেরুবার সেতু ছিল না। তার বদলে ছিল খেয়াপারের নৌকো। সোয়াবিয়ার বীরপুরুষরা সে কথা জানত না। উলটো পারে একটা লোক কাজ করছিল, তাই চেঁচিয়ে তাকে তারা জিগেস করল—নদী পার হবে কী করে?

লোকটা তাদের ভাষা বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "কী বক্‌বক্‌ করছ?"

মাস্টার শুল্‌জ্‌ ভাবল লোকটা বলছে—জল ঠেলে এগোও। তাই

সে ঝাঁপ দিল মোজেল্ নদীতে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্যাওলা আর কাদার মধ্যে সে গেল ডুবে। কিন্তু বাতাসে তার টুপিটা উড়ে গেল আর সেটায় চেপে একটা ব্যাঙ চেঁচাতে লাগল, "মক্‌মক্! মক্‌মক্!"

অন্য ছজন সেটা শুনে বলাবলি করল, 'আমাদের দোস্ত, মাস্টার গুল্‌জ্, আমাদের ডাকছে। সে পেরুতে পারলে আমরাই-বা পারব না কেন?'

তাই তড়্‌বড়্ করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তারা ডুবল। এইভাবে একটা ব্যাঙের জন্য মরল সোয়াবিয়ার ছজন বীরপুরুষ। তাদের কথা আর শোনা যায় নি।

তিন শিক্ষানবিস

এক সময় তিন শিক্ষানবিস নিজেদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সব সময় একসঙ্গে থাকবে আর একই শহরে কাজ করবে। প্রভু বরখাস্ত করলে পর জীবনধারণের মতো কোনো সম্বল তাদের রইল না। তাদের একজন বলল, "আমরা এখন করি কী? এখানে তো আর থাকা যায় না। আবার বেরিয়ে পড়া যাক, অন্য শহরে কাজ না পেলে আমাদের পুরনো মনিবকে একটা ঠিকানা আমরা পাঠিয়ে দেব, সেই ঠিকানায় সর্বদাই আমাদের খোঁজ তিনি পাবেন। ঠিকানা পাঠাবার পর আমরা আলাদা-আলাদা পথে চলে যাব।"

অন্য দুজন তার কথায় সায় দিল; তার পর তিনজনেই পড়ল বেরিয়ে। যেতে-যেতে পথে তাদের সঙ্গে দেখা হল খুব ভালো পোশাক-পরা একটা লোকের সঙ্গে। সে জানতে চাইল, কী তারা করছে।

তারা বলল, "আমরা শিক্ষানবিস। কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ-পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু নতুন কাজ না পেলে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে।"

লোকটা বলল, "তার দরকার নেই। আমার নির্দেশ শুনলে কাজ কিংবা টাকাকড়ির অভাব তোমাদের হবে না। বিরাট ধনী হয়ে নিজেদের জুড়িগাড়ি তোমরা হাঁকাবে।"

তিনজনের হয়ে যে শিক্ষানবিস কথা বলছিল সে বলল, "আমাদের আত্মার শান্তি নষ্ট কিংবা আমাদের মুক্তির পথ বন্ধ না হলে নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ মেনে চলব।"

লোকটা বলে উঠল, "না-না। কখনোই তা হবে না। এ-ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই।"

কিন্তু অন্য দুজন শিক্ষানবিস তার পায়ের দিকে তাকিয়েছিল। তারা দেখে লোকটার একটা পা মানুষের, অন্যটা ঘোড়ার। তাই তার প্রস্তাব মেনে নিতে তারা দ্বিধা করছিল।

লোকটা তাদের রাজি করবার জন্য জোর দিয়ে আবার বলে উঠল, "তোমরা ঘাবড়ো না। কথা দিচ্ছি তোমাদের আত্মার কোনো ক্ষতি হবে না। এটা আর একজনের আত্মার ব্যাপার। সেটার অর্ধেক ইতিমধ্যেই আমি পেয়ে গেছি।"

লোকটার কথায় আশ্বস্ত হয়ে তার নির্দেশ মতো কাজ করতে তারা রাজি হল। লোকটা আর কেউ নয়—স্বয়ং শয়তান।

শয়তান বলল সব প্রশ্নের উত্তর এইভাবে তাদের দিতে হবে— "তিনজনে," "টাকা দিয়ে," "তা ঠিক।" পালা করে এই উত্তরগুলো তাদের দিতে হবে—একটাও বাড়তি কথা তারা বলতে পাবে না। তার আদেশ অমান্য করলে তাদের সব টাকাকড়ি অদৃশ্য হবে। অমান্য না করলে সব সময় তাদের পকেট থাকবে ভর্তি। এই-না বলে পকেট ভরে টাকাকড়ি দিয়ে শয়তান তাদের বলল শহরের বিশেষ একটা সরাইখানায় যেতে।

সেখানে পৌঁছলে সরাইখানার মালিক প্রশ্ন করল, "খাবার-দাবার তোমরা খাবে?"

প্রথমজন উত্তর দিল, "তিনজনে।"

মালিক বলল, "তাই ভেবেছিলাম।"

দ্বিতীয়জন বলে উঠল, "টাকা দিয়ে।"

মালিক বলল, "অবশ্যই।"

তৃতীয়জন বলে উঠল, "তা ঠিক।"

মালিক বলল, "ঠিকই তো। দাম না দিলে কে তোমাদের খাবার-দাবার দেবে?"

সেই সরাইখানায় কিছুদিন তারা রইল। "তিনজনে," "টাকা দিয়ে" এবং "তা ঠিক" ছাড়া একটি কথাও তারা বলল না। কিন্তু সেখানকার সব-কিছুই লক্ষ্য করে চলল তারা। একদিন রাশি-রাশি টাকাকড়ি নিয়ে এক ধনী বণিক সেখানে উঠে সরাইখানার মালিককে বলল, আমার

ঝোলাঝুলিগুলো ওপরতলায় নিয়ে যাও। দেখো, এই গবেট শিক্ষানবিস ছেলেরা সেগুলো যেন চুরি না করে।"

মালিক তার কথামতো ঝোলাঝুলিগুলো উপরতলায় নিয়ে গেল। বণিকের ঘরে তার বাক্সটা নিয়ে যাবার সময় মালিক টের পেল সেটা মোহরে ভরা। শিক্ষানবিসদের সে শুতে দিল নীচের তলায়। তার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মালিক আর তার বউ একটা কুড়ুল এনে বণিকের ঘরে গিয়ে তাকে খুন করে নিজেদের বিছানায় ফিরে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সরাইখানার সবাই আতঙ্কে উঠল সিঁটিয়ে। কারণ দেখা গেল ধনী বণিক খুন হয়েছে, নিজের রক্তে ভাসছে।

সেখানকার আতঙ্কিত বাসিন্দাদের সরাইখানার মালিক বলল, "এটা নিশ্চয়ই ঐ তিনটে গবেট শিক্ষানবিসের কাজ।" সবাই একমত হয়ে বলল, তারা ছাড়া বণিককে আর কেউ খুন করতে পারে না।

শিক্ষানবিসদের ডেকে মালিক প্রশ্ন করল, "বণিককে তোমরা খুন করেছ?"

প্রথমজন বলল, "তিনজনে।"

দ্বিতীয়জন বলল, "টাকার জন্যে।"

তৃতীয়জন বলল, "তা ঠিক।"

তাদের কথা শুনে মালিক চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার সবাই শুনলে তো! নিজেরাই এরা নিজেদের অভিযুক্ত করেছে।" তাই বিচারের জন্য তাদের হাজতে ভরা হল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে তারা পড়ল ভীষণ ঘাবড়ে। কিন্তু রাতে শয়তান এসে তাদের বলল আর একটা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে। জানাল তাদের মাথার একটা চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

পরদিন সকালে হাকিমের সামনে তাদের হাজির করা হলে হাকিম প্রশ্ন করলেন, "তোমরা খুনী?"

প্রথমজন বলল, "তিন জনে।"

"বণিককে কেন খুন করেছ?"

"টাকার জন্যে।"

হাকিম চেঁচিয়ে বললেন, "পাজি, বদমাশ! জানো না এটা অপরাধ?"

"তা ঠিক।"

হাকিম বললেন, "এরা অপরাধ স্বীকার করেছে। তার ওপর দেখা যাচ্ছে এরা উদ্ধত আর নিষ্ঠুর। এক্ষুনি ফাঁসির মঞ্চে ওদের নিয়ে যাও।" তাই সেখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে চলল সরাইখানার মালিক।

জল্লাদ যখন তাদের মুণ্ডু কাটার জন্য তার তরোয়ালটা তুলেছে এমন সময় টক্‌টকে লাল রঙের চারটে-শেয়ালে-টানা একটা জুড়ি গাড়ি সেখানে এসে থামল।

জনতা চেঁচিয়ে উঠল, "শাস্তি মকুব! শাস্তি মকুব!"

চোখ-ধাঁধানো পোশাক পরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সেজে জুড়িগাড়ি থেকে নেমে শয়তান বলল, "তোমরা এবার কথা বলতে পার। যা-যা দেখেছ, বলো। তোমরা নির্দোষ।"

বড়ো শিক্ষানবিস তখন বলল, "বণিককে আমরা খুন করি নি।" তার পর জনতার মধ্যে সরাইখানার মালিকের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে সে বলে চলল, "আসল অপরাধী ঐখানে দাঁড়িয়ে। তার মাটির তলার ঘরে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। আরো যাদের সে খুন করেছিল তাদের মৃতদেহ সেখানে দেখতে পাবেন।"

জল্লাদের ভৃত্যদের হাকিম পাঠালেন সরাইখানায়। তারা ফিরে এসে জানাল শিক্ষানবিসদের কথাটা সত্যি। হাকিম তাই আদেশ দিলেন মঞ্চে তুলে সরাইখানার মালিকের মুণ্ডু কেটে ফেলতে।

তিনজন শিক্ষানবিসকে শয়তান তখন বলল, "যে-আত্মাটা চেয়েছিলাম সেটা এখন পেলাম। তোমরা এখন মুক্ত। আজীবন কখনো অভাবে পড়বে না।

বনের বুড়ি

এক গরিব দাসী তার প্রভুর পরিবারের সঙ্গে গাড়িতে করে যাচ্ছিল গহন এক বনের মধ্যে দিয়ে। বনের মাঝখানে যখন তারা পৌঁচেছে একদল ডাকাত ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে সবাইকে মেরে ফেলল। শুধু প্রাণে বাঁচল সেই গরিব মেয়েটি। কারণ দারুণ ভয় পেয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে সে লুকিয়ে পড়েছিল একটা গাছের পিছনে।

লুঠের মালপত্র নিয়ে ডাকাতের দল চলে যাবার পর মেয়েটি তার লুকনো-জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে দেখল কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে। তখন সে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "হায়-হায়, কী এখন করি? বন থেকে বেরুবার পথ আমি জানি না। নিশ্চয়ই আমাকে উপোস করে মরতে হবে।"

বেরুবার পথের খোঁজে মেয়েটি অনেক ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু কোথাও পথটা খুঁজে পেল না।

সন্ধে হতে এক গাছতলায় বসে মেয়েটি তার উপাসনা শেষ করল। এমন সময় সাদা একটা পায়রা ঠোঁটে সোনার একটা ছোট্টো চাবি নিয়ে উড়ে এল তার কাছে। চাবিটা তার হাতে ফেলে পায়রা বলল :

"ঐ প্রকাণ্ড গাছটা দেখছ তো? ওটার মধ্যে একটা তালা আছে। চাবিটা দিয়ে সেই তালা খুললে দেখবে ভেতরে আছে প্রচুর খাবার। তোমাকে আর উপোস করতে হবে না।"

গাছটার কাছে গিয়ে তালা খুলতে মেয়েটি দেখে এক গামলা দুধ আর কিছু সাদা রুটি। সেগুলো খেয়ে ক্ষিদে মিটিয়ে মনে-মনে মেয়েটি

বলল, 'পাখিদের এখন দাঁড়ে বসে ঘুমোবার সময় হয়েছে। আমি ভারি ক্লান্ত। বিছানায় শুয়ে আমারও খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।'

সেই পায়রা তখন আর-একটা সোনার চাবি ঠোঁটে নিয়ে আবার তার কাছে উড়ে এসে বলল, "ঐ গাছটা খোলো। সেখানে দেখবে একটা বিছানা রয়েছে।"

গাছটা খুলে মেয়েটি দেখে সুন্দর নরম একটা বিছানা। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা জানাল—রাতে তিনি যেন তাকে বিপদ থেকে বাঁচান। তার পর বিছানায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে পায়রাটা তৃতীয়বার একটা চাবি এনে বলল, "ঐ গাছটা খোলো। সেখানে দেখবে পোশাক আছে।"

গাছটা খুলে সে দেখে সোনার কাজ-করা জহরত-বসানো নানা আশ্চর্য সুন্দর পোশাক—রাজকন্যেদেরও অমন ভালো পোশাক হয় না।

এইভাবে অনেকদিন তার কাটল। প্রতিদিন পায়রাটা এসে তার দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে যায়। কোনো কিছুরই অভাব তার হয় না। নির্মল শান্তিতে তার দিন কাটতে থাকে।

কিন্তু একদিন পায়রা তাকে বলল, "আমার জন্যে একটা কাজ করবে?"

মেয়েটি বলল, "নিশ্চয়ই।"

পায়রা বলল, "তোমাকে একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে যাব। ভেতরে গেলে দেখবে উনুনের পাশে এক বুড়ি বসে। সে তোমাকে শুভদিন জানাবে। কিন্তু কিছুতেই তার কোনো কথার উত্তর দেবে না। সোজা চলে যাবে বুড়ির ডান পাশের দরজায়। সেটা খুললে দেখবে একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। আর টেবিলের ওপর নানা ধরনের অনেক আঙটি ছড়ানো। বহু আঙটিতে দেখবে চোখ-ধাঁধানো জহরত বসানো। সেগুলো ছোঁবে না। একটা সাধারণ আঙটি খুঁজো। সেটাও থাকবে তার মধ্যে। যত তাড়াতাড়ি পার সেই আঙটিটা আমার জন্যে নিয়ে এসো।

সেই কুঁড়েঘরে পৌঁছে মেয়েটি ভিতরে গেল। বুড়ি সেখানে বসে-ছিল। তাকে দেখে চোখ বড়ো-বড়ো করে সে বলল, "শুভদিন, বাছা।"

মেয়েটি তার কথার উত্তর না দিয়ে গেল দরজাটার কাছে।

বুড়ি তার জামা চেপে ধরে বলল, "কোথায় যাচ্ছ? আমার অনুমতি না নিয়ে কেউ ওখানে যেতে পারে না।"

বুড়ির কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে মেয়েটি সোজা চলে গেল ঘরটার মধ্যে। ঘরের মাঝখানের টেবিলের উপর হীরে-চুণি-পান্না-বসানো রাশিরাশি আংটি ঝল্‌মল্‌ করছিল। দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার পর সে খুঁজতে লাগল সেই সাধারণ আংটিটা। কিন্তু কোথাও সেটা সে খুঁজে পেল না।

আংটিটা সে খুঁজছে, এমন সময় দেখে চুপিসাড়ে বুড়িকে ঘরে ঢুকতে। বুড়ির হাতে একটা পাখির খাঁচা। বুড়ির কাছে গিয়ে খাঁচাটা তার হাত থেকে নিয়ে নিল মেয়েটি। খাঁচার মধ্যে ছিল একটি পাখি। পাখিটির ঠোঁটে ছিল আসল আংটিটা। আংটিটা নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। সে আশা করেছিল সাদা পায়রা এসে আংটিটা নিয়ে যাবে। কিন্তু সাদা পায়রা এল না। তাই একটা গাছে হেলান দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল পায়রার জন্য। হঠাৎ সে টের পেল গাছটা ঝুঁকে পড়েছে আর হয়ে উঠছে নরম আর নমনীয়। গাছটার ডালপালা দুটি বাহু হয়ে তাকে করল আলিঙ্গন। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গাছটা হয়ে উঠেছে সুপুরুষ এক তরুণ। মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সানন্দে সে বলে উঠল:

"বনের বুড়ির জাদুর প্রভাব থেকে আমায় তুমি মুক্ত করেছ। বুড়িটা শয়তান ডাইনি। আমাকে সে একটা গাছ করে দিয়েছিল। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমি একটা সাদা পায়রা হতে পারতাম। বুড়ির কাছে আংটিটা যতদিন ছিল ততদিন মানুষের চেহারা ফিরে পেতে পারি নি।"

তার ঘোড়া আর ভৃত্যদেরও গাছ করে দেওয়া হয়েছিল। তারাও জাদুমুক্ত হয়ে সেই তরুণকে তখন ঘিরে দাঁড়াল।

তার পর মেয়েটিকে তরুণ নিয়ে গেল তার রাজত্বে। কারণ আসলে সে ছিল ধনী রাজপুত্র। সেখানে তাদের বিয়ে হল আর আজীবন তারা রইল সুখে-শান্তিতে।

তিন ভাই

এক সময় একটি লোকের ছিল তিনটি ছেলে। বসত-বাড়ি ছাড়া বিষয়-সম্পত্তি বলতে আর কিছুই তার ছিল না। প্রত্যেক ছেলের ইচ্ছে ছিল বাবার মৃত্যুর পর বাড়িটা সে পায়। লোকটি কিন্তু তিন ছেলেকেই সমান ভালোবাসত। তাই ভেবে পেল না কোন ছেলেকে বাড়িটা দিয়ে যাবে। পূর্বপুরুষদের বাড়ি বলে সেটা বিক্রি করতেও মন তার চায় নি। নইলে সেটা বেচে তিন ছেলেকেই সমান করে ভাগ করে দিত টাকাটা। শেষটায় মাথায় একটা বুদ্ধি খেলতে ছেলেদের ডেকে সে বলল, "তোমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে একটা করে পেশা শিখে এসো। ফেরার পর যে তার পেশার সব চেয়ে ভালো নমুনা দেখাতে পারবে সে-ই পাবে বাড়িটা।"

ছেলেরা তার প্রস্তাবে রাজি হল। বড়ো ছেলে স্থির করল কামার হবে, মেজো ছেলে নাপিত আর ছোটো ছেলে তরোয়াল খেলার শিক্ষক।

কোন তারিখে ফিরবে সেটা স্থির করে তিনজনেই তারা বেরিয়ে পড়ল। তিনজনেই পেল খুব ভালো শিক্ষক। শিক্ষকরা তাদের পেশা তিন ছেলেকেই শেখাল নিখুঁত করে। যে-ছেলে কামার হল, নাল পরাত সে রাজার ঘোড়ায়। তাই সে ভাবল, 'বাড়িটা যে আমি পাব তাতে সন্দেহ নেই।' যে-ছেলে নাপিত হল, দাড়ি কামাত সে শুধু বড়োলোকদের। তাই সে ভাবল, 'বাড়িটা নিশ্চয়ই তার হবে।' যে-ছেলে হয়েছিল তরোয়াল খেলার শিক্ষক তার মুখে কয়েকটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু

সেটা নিয়ে সে মন খারাপ করল না। কারণ মনে মনে সে ভাবল 'কাটাকুটির ভয় করলে বাড়ি পাওয়া যায় না।'

নির্দিষ্ট দিনে তিন ভাই একসঙ্গে হাজির হল তাদের বাবার কাছে। নিজেদের দক্ষতা কী ভাবে সব চেয়ে ভালো করে দেখানো যায়, সেটা ভেবে না পেয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে তারা বসল। এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা খরগোশকে তীরবেগে ছুটে যেতে।

নাপিত বলল, "ঠিক সময়ে এটা এসেছে।" এই-না বলে গামলায় সাবান-জলের ফেনা করে পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় খরগোশের সমস্ত লোম সে কামিয়ে দিল। সেটার শরীরের কোথাও কাটল না।

তার বাবা বলল, "নিখুঁত কাজ! তোমাকে হারানো শক্ত। মনে হচ্ছে তুমিই বাড়িটা পাবে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল একটা জুড়িগাড়ি ছুটে আসছে। কামার-ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, এবার দেখো আমি কি করতে পারি।" এই-না বলে গাড়ির সঙ্গে ছুটতে-ছুটতে ঘোড়াটার চারটে পায়ের নাল খুলে লাগিয়ে দিল চারটে নতুন নাল। গাড়িটাকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও থামাল না।

তার বাবা বলল, "অবাক কাণ্ড! তোমার ভাইয়ের মতোই আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছ। এখন আমি বাস্তবিকই বুঝতে পারছি না বাড়িটা কার পাওয়া উচিত।"

তখন ছোটো ছেলে চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, দেখো আমি কী পারি।"

তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। ছোটো ছেলে তরোয়াল বার করে তার মাথার উপর এমন সব কায়দায় ঘোরাতে লাগল যে, একফোঁটা জলও তার গায়ে পড়ল না। বৃষ্টি যত ঝম্‌ঝম্‌ করে পড়ে তত বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে থাকে সে তরোয়াল। সব শেষে মুষলধারায় নামল বৃষ্টি। কিন্তু তার পোশাক রইল খট্‌খটে শুকনো। দেখলে মনে হয় যেন কোনো বাড়ির মধ্যে সে রয়েছে।

ভীষণ অবাক হয়ে খুব তারিফ করে তার বাবা চেঁচিয়ে উঠল "তোমার দক্ষতাই সব চেয়ে আশ্চর্য। একেবারে নিখুঁত। বাড়িটা তোমাকে দিলাম।"

অন্য দুই ভাই স্বীকার করল যে, তাদের বাবার সিদ্ধান্তই নির্ভুল।

ভাইরা পরস্পরকে খুব ভালোবাসত। তাই তিনজনেই সানন্দে সেই বাড়িতে থেকে নিজের-নিজের পেশা অনুশীলন করে প্রচুর অর্থ রোজগার করল।

এইভাবে তারা বেঁচেছিল বুড়ো বয়স পর্যন্ত। শেষে একজন অসুখে পড়ে মারা গেল। তার শোকে মারা গেল অন্য দুই ভাইও। গ্রামের লোকরা জানত ভাইরা পরস্পরকে কী রকম ভালোবাসত। তাই একই কবরে তাদের তিনজনকে তারা সমাহিত করল।

বুড়ো-আঙলা

এক গরিব চাষী এক সন্ধ্যেয় উনুন-পাশে বসে আগুন খোঁচাচ্ছিল। তার পাশে বসে চরকা কাটছিল তার বউ। উনুন খোঁচাতে-খোঁচাতে চাষী বলল, "আমাদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই—এটা খুব দুঃখের কথা। আমাদের কুঁড়েঘরটা ভারি চুপচাপ। অন্যদের বাড়িতে দেখো কত হৈচৈ, কত আমোদ-আহ্লাদ!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার বউ বলল, "তা যা বলেছ। আমাদের যদি একটি বুড়ো-আঙলার মতো বাচ্চাও থাকত তা হলেই আমরা খুশি হতাম। তাকে খুব ভালোবাসতাম।"

কিছুদিন পরেই একটি শিশুর মা হল চাষার বউ। ছেলেটির হাত-পা মুখ-চোখ-নাক—সব-কিছুই নিখুঁত। কিন্তু শরীরটা বুড়ো-আঙলার মতো। চাষী আর তার বউ বলল, "আমাদের ইচ্ছাই তা হলে পূর্ণ হল। এ-ছেলেকেই আমরা খুব ভালোবাসব।" শরীরটা তার বুড়ো আঙুলের মতো বলে তার নাম দিল 'বুড়ো-আঙলা'। তাকে নানা খাবার তারা খাওয়াত। কিন্তু মাথায় সে বাড়ল না। জন্মের সময় যেমন ছিল তেমনি ছোট্টোই সে রইল। কিন্তু চোখদুটো ছিল তার বুদ্ধিতে ভরা। কিছুকাল পরে দেখা গেল ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি চট্‌পটে। যে কাজে হাত দেয় তাতেই সফল হয়।

একদিন চাষী বনে গিয়ে গাছ কাটার জন্য তোড়জোড় করছিল। আপন মনে সে বলে উঠল, 'মালগাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাবার কেউ যদি আমার থাকত!'

বুড়ো-আঙলা বলল, "বাবা, ভাবছ কেন? আমিই মালগাড়িটা নিয়ে যাব! দেখবে ঠিক সময়ে মালগাড়ি বনের মধ্যে হাজির হয়েছে। আমার ওপর নির্ভর করতে পার।"

হো-হো করে হেসে উঠে চাষী বলল, "তা হয় না রে। তুই ভারি ছোট্টো। ঘোড়ার লাগাম ধরে তুই নিয়ে যেতে পারবি না।"

বুড়ো-আঙলা বলল, "তাতে কিছু আসে-যায় না, বাবা। ঘোড়ার সাজ পরিয়ে দিলে আমি তার কানের ওপর বসে চেঁচিয়ে বলব কেমন করে তাকে যেতে হবে।"

তার বাবা বলল, "ওর কথাটা একবার পরখ করে দেখতে দোষ নেই।"

চাষীর বউ ঘোড়ার সাজ পরিয়ে বুড়ো-আঙলাকে সেটার উপর বসিয়ে দিল। আর সেই ক্ষুদে মানুষটি 'হ্যাট্ হ্যাট্' করে চেঁচিয়ে ঘোড়াটাকে বলতে লাগল কোন পথ দিয়ে যেতে হবে। ঘোড়াটা এমনভাবে চলল যেন সত্যিকারের কোনো গাড়োয়ান সেখানে রয়েছে। সঠিক পথ ধরে মালগাড়িটা সোজা চলল বনের দিকে।

এখন হল কি, গাড়িটা যখন একটা মোড় নিচ্ছে আর বুড়ো-আঙলা 'হ্যাট্ হ্যাট্' করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—এমন সময় সেখানে হাজির হল দুজন বিদেশী লোক। প্রথমজন বলে উঠল, "কী কাণ্ড! এর মানে কী? গাড়িটা আসছে! গাড়োয়ানের হাঁকডাকও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু গাড়োয়ানকে তো দেখতে পাচ্ছি না!"

দ্বিতীয়জন বলল, "নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। গাড়িটার পেছন-পেছন যাওয়া যাক। দেখি কোথায় গিয়ে থামে।"

চাষী বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ডান হাত দিয়ে তার ক্ষুদে ছেলেকে নামাল ঘোড়ার কান থেকে। মনের ফূর্তিতে বুড়ো-আঙলা গিয়ে বসল একটা খড়ের ওপর।

বুড়ো-আঙলাকে দেখে বিদেশী লোকরা এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরলো না। তার পর একজন অন্যজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, "শোনো, কোনো বড়ো শহরে এই ক্ষুদে মানুষটাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলে অনেক টাকা আমরা কামাতে পারব। ওকে কিনে নেওয়া যাক।" তাই চাষীর কাছে গিয়ে তারা বলল, "এই ক্ষুদে মানুষটাকে আমাদের কাছে বিক্রি কর! একে খুবই যত্নে আমরা রাখব।"

চাষী বলল, "না। এ আমাদের চোখের মণি। পৃথিবীর সব ধন-দৌলত দিলেও একে আমরা বিক্রি করব না।"

কিন্তু বিদেশী লোকদের কথা শুনে বুড়ো-আঙলা তার বাবার কোট বেয়ে উঠে তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "বাবা। ওদের কাছে আমায় বিক্রি করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব।" বেশ কিছু মোহর নিয়ে তাদের কাছে চাষী বুড়ো-আঙলাকে বিক্রি করে দিল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "কোথায় বসতে চাস?"

"তোমার টুপির কিনারে আমাকে তুলে দাও। পায়চারি করে দেখতে দেখতে যাব। পড়ব না।"

তাই তারা করল। বুড়ো-আঙলা তার বাবার কাছে বিদায় নেবার পর তাকে সঙ্গে নিয়ে লোক দুজন চলে গেল। যেতে-যেতে সন্ধে হলে বুড়ো-আঙলা তাদের বলল, "থামো, আমি নামব।"

লোকটা বলল, "যেখানে আছিস সেখানে থাক। এখন আমি থামব না।"

বুড়ো-আঙলা কিন্তু গোঁ ধরে বলল, "না-না, আমার পা ধরে গেছে। এক্ষুনি নামাও।"

লোকটা তার টুপি খুলে ক্ষুদে মানুষটাকে রাখল পথের পাশে এক খেতের কিনারে। মাটির ঢিপিগুলোর মধ্যে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে-করতে বুড়ো-আঙলা টুক করে ইঁদুরের একটা গর্তে সেঁধিয়ে গেল; তার পর হেসে চেঁচিয়ে তাদের বলল, "শুভরাত্রি মশাইরা! আমাকে না নিয়ে বাড়ি ফিরতে পার।" তারা দৌড়ে এসে তাকে বার করার জন্য লাঠি দিয়ে ইঁদুরের গর্তটা অনেক খোঁচাখুঁচি করল। কিন্তু কোনো ফল হল না। গর্তটার গভীর থেকে গভীরে চলে গেল বুড়ো-আঙলা। খানিক পরেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল।

তাই রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হল লোকদুটো।

বুড়ো-আঙলা যখন নিঃসন্দেহ হল লোকদুটো বেশ খানিকটা এগিয়েছে, তখন চুপিচুপি সে বেরিয়ে পড়ল গর্ত থেকে। আপন মনে সে বলে উঠল, 'রাতে এই চষা-খেতে ঘুরে বেড়ানো বিপজ্জনক। অনায়াসেই পা ভাঙতে বা গলা কাটতে পারে।' তার কপাল ভালো—খানিক পরেই তার পায়ে ঠেকল একটা শামুকের খোলা। "বাঁচা গেল, এটার মধ্যে নিরাপদে রাত কাটানো যাবে" বলে শামুকের খোলাটার মধ্যে গিয়ে সে বসল।

খানিক পরে, সবে তার ঘুম এসেছে, সে শুনতে পেল দুটো লোকের কথাবার্তা। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন অন্যজনকে বলল, "ধনী পাদরির সোনা-রুপোর জিনিসপত্র কী করে চুরি করা যায়?"

বুড়ো-আঙলা চেঁচিয়ে বলল, "আমি তোমাদের সেটা বাতলে দিতে পারি।"

ভয় পেয়ে চোরদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "কী ব্যাপার? কাকে যেন কথা বলতে শুনলাম!"

থেমে গিয়ে তারা কান খাড়া করে রইল। বুড়ো-আঙলা আবার হেঁকে বলল, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি তোমাদের সাহায্য করব।"

"কোথায় তুই?"

"আমি এইখানে, মাটিতে। লক্ষ্য কর কোথা থেকে আমার স্বর আসছে," বলল বুড়ো-আঙলা। হাতড়াতে-হাতড়াতে শেষটায় চোররা তাকে খুঁজে পেল।

তাকে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! তুই তো নেহাত ক্ষুদে একটা মানুষ! আমাদের সাহায্য করবি কী করে?"

সে বলল, "শোনো। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে পাদরির শোবার ঘরে চুপিসাড়ে আমি সেঁধিয়ে যাব আর যা-যা চাও সেগুলো জানলার গরাদ গলিয়ে তোমাদের হাতে দেব।"

তারা বলল, "ভালো কথা। দেখা যাক কতটা কী তুই করতে পারিস।"

পাদরির বাড়ি পৌঁছে বুড়ো-আঙলা চুপিসাড়ে সেঁধিয়ে গেল তার শোবার ঘরের মধ্যে। কিন্তু খানিকটা গিয়েই তারস্বরে সে চেঁচাতে শুরু করল, "এখানকার কোনো জিনিস তোমাদের চাই?" চোররা ভয় পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, "গলা নামিয়ে কথা বল। নইলে বাড়িসুদ্ধু সবাই জেগে উঠবে।" বুড়ো-আঙলা কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন তাদের কথা শুনতে পায় নি। আরো চেঁচিয়ে সে প্রশ্ন করল, "কী তোমাদের দরকার? এখানকার কোনো জিনিস চাও?" পাশের ঘরে রাঁধুনি ঘুমোচ্ছিল। তার গলা পেয়ে ভালো করে শোনবার জন্য বিছানায় সে উঠে বসল। দারুন ভয় পেয়ে খানিক দূরে চোর দুজন পালাল ছুটে।

তার পর ভাবল, 'ক্ষুদে মানুষটা আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে।' তাই ফিরে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে তাকে বলল, "ইয়াকি ছাড়্‌। কিছু জিনিস-পত্র এগিয়ে দে।" তাদের কথা শুনে বুড়ো-আঙলা আবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমাদের সব-কিছু দিচ্ছি, হাত বাড়িয়ে দাও।"

এবার তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল রাঁধুনি। সঙ্গে-সঙ্গে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে এল পাদরির শোবার ঘরে। চোর দুজন এমনভাবে ছুটে পালাল যেন শিকারী তাদের তাড়া করেছে। কিন্তু রাঁধুনি কিছু দেখতে না পেয়ে জ্বালাতে গেল একটা মোমবাতি। মোমবাতি নিয়ে যখন সে ফিরল, বুড়ো-আঙলা ততক্ষণে চুপিসাড়ে গোলাবাড়িতে সরে পড়েছে। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে কাউকে দেখতে না পেয়ে রাঁধুনি আবার শুতে চলে গেল। ভাবল, চোখ কান খোলা থাকলেও নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছিল।

খড়ের গাদায় উঠে বুড়ো-আঙলা ঘুমোবার ভালো একটা জায়গা পেল। ভাবল ভোর পর্যন্ত সেখানে ঘুমিয়ে বাবা-মার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু তখনো তার বরাতে ছিল আরো দুর্ভোগ।—পৃথিবীতে তো দুর্ভোগ আর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই যথানিয়মে ঘুম থেকে উঠে রাঁধুনি গেল গোরু-বাছুরদের খাবার দিতে। খড় নেবার জন্য প্রথমে সে গেল গোলাবাড়িতে। আর হবি তো হ—খড়ের যে-আঁটিটা সে তুলল সেটার মধ্যেই ঘুমোচ্ছিল বেচারা বুড়ো-আঙলা। কিন্তু এমন অঘোরে সে ঘুমোচ্ছিল যে, কিছুই সে টের পেল না। ঘুম যখন ভাঙল তখন সে গোরুর মুখের মধ্যে। সে চেঁচিয়ে উঠল, "কী সর্বনাশ! নিশ্চয়ই আমি একটা জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছি।" কিন্তু খানিক পরেই সে টের পেল কোথায় রয়েছে। গোরুটার দাঁতের মধ্যে পড়ে যাতে না পিষে যায় তার জন্য করতে হল তাকে হরেকরকম কসরৎ। কিন্তু খাবারের সঙ্গে হড়কে গোরুটার গলা দিয়ে না নেমে সে পারল না। বুড়ো-আঙলা বলে উঠল, "এ বাড়িতে দেখছি জানলা বানাতে লোকে ভুলে গেছে। সূর্যের আলোও এখানে পৌঁছয় না। আর মনে হচ্ছে। এখানে পয়সা দিয়েও মোমবাতি কিনতে পাওয়া যায় না।"

তার এই নতুন থাকার জায়গাটা মোটেই ভালো লাগল না। আর যেটা সব চেয়ে বিশ্রী কাণ্ড—যত সময় যায় ততই দরজা দিয়ে আসতে থাকে রাশি-রাশি খড়। ফলে থাকবার জায়গা ক্রমশ যেতে লাগল কমে।

শেষটায় দারুন আতঙ্কে তারস্বরে সে চেঁচাতে লাগল, "আমার জন্যে আর তাজা খাবার পাঠিয়ো না। আমার জন্যে আর তাজা খাবার পাঠিয়ো না।"

রাঁধুনি সবে তখন গোরু দুইতে বসেছিল। কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন সে মানুষের স্বর শুনতে পেল আর যখন চিনল এটা রাতে-শোনা সেই স্বর—তখন সে এমন ভয় পেল যে, পড়ে গেল টুল থেকে। ফলে বালতির দোয়া দুধ পড়ল চার দিকে ছিটিয়ে। পড়িমরি করে দৌড়ে প্রভুর কাছে গিয়ে হাউমাউ করে সে বলে উঠল, "পুরুতমশাই। পুরুতমশাই। গোরুটা কথা কইছে।"

পাদরি বললেন, "নিশ্চয় তোর মাথা খারাপ হয়েছে।" কিন্তু ব্যাপারটা কী দেখার জন্য নিজে গেলেন তিনি গোয়ালঘরে।

গোয়ালঘরে তিনি পা দিতে-না-দিতেই তারস্বরে বুড়ো-আঙলা আবার চেঁচিয়ে উঠল, "আমার জন্যে আর তাজা খাবার পাঠিয়ো না। আমার জন্যে আর তাজা খাবার পাঠিয়ো না।"

পাদরি নিজেও তখন ভয় পেয়ে ভাবলেন, নিশ্চয়ই গোরুটাকে দানোয় পেয়েছে। তাই তিনি আদেশ দিলেন গোরুটাকে মেরে ফেলতে। তাঁর আদেশমতো সেটাকে মেরে গোবরগাদার উপর তার পেটটা চেরা হল—যার মধ্যে বুড়ো-আঙলা ছিল ঢাকা।

বুড়ো-আঙলা চেষ্টা করতে লাগল বেরিয়ে আসতে। কাজটা কঠিন হলেও শেষপর্যন্ত সে সফল হল। কিন্তু যখন সবে কোনোমতে মাথাটা সে বার করেছে তখন পড়ল নতুন আর-একটা বিপদে। একটা নেকড়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। খুব খিদে পেয়েছিল সেটার। গোরুটার নাড়ি-ভুঁড়ির উপর ঝাঁপিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সে গিলে ফেলল। বুড়ো-আঙলা তার উপস্থিত-বুদ্ধি হারাল না। ভাবল, 'নেকড়ের সঙ্গে কথা কইলে কাজ হতে পারে।' তাই তার পেটের মধ্যে থেকে সে বলে উঠল, "নেকড়ে-ভায়া, তোমার জন্যে খুব একটা ভালো পুরস্কারের কথা আমি জানি।"

নেকড়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় সেটা পাওয়া যাবে?"

বুড়ো-আঙলা বলল, "বাড়িটা অমুক জায়গায়। সেখানকার নর্দমা দিয়ে চুপিসাড়ে উঠলে যত পার তত খেতে পাবে কেক, বেকন (নুনে জড়ানো শুয়োরের শুকনো মাংস) আর সসেজ (মাংসের পুর দেওয়া লম্বা গড়নের একরকম খাবার)।" এই-না বলে সে হুবহু বর্ণনা
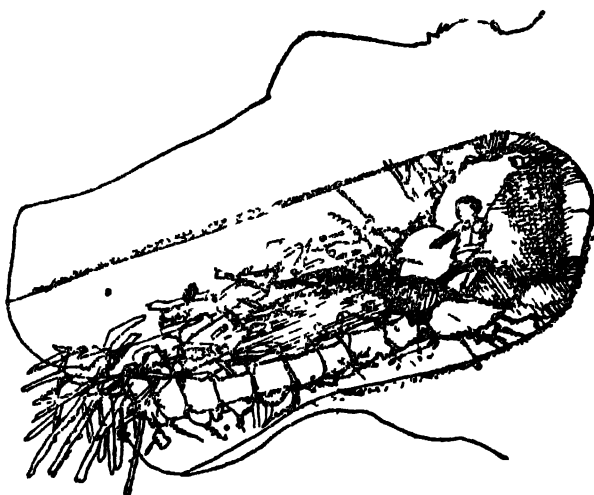
দিল তার বাবার বাড়িটার।

নেকড়েকে কথাটা আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না। রাতের বেলা নর্দমার মধ্যে দিয়ে ঘেঁষটে-ঘুঁষটে কোনোরকমে সে ঢুকল ভাঁড়ার-ঘরে। তার পর যতটা পারল খেল। যখন আর খেতে পারল না তখন গেল বেরুতে। কিন্তু খেয়ে-খেয়ে পেটটা তার এমন মোটা হয়ে গিয়েছিল যে, নর্দমার ফোকর দিয়ে কিছুতেই গলে বেরুতে পারল না। এই মতলবটাই ভেঁজেছিল বুড়ো-আঙলা। নেকড়ের পেটের মধ্যে থেকে সে শুরু করে দিল তারস্বরে চেঁচাতে।

নেকড়ে বলে উঠল, "চুপ কর, চুপ কর। বাড়ির লোকজন যে জেগে উঠবে!"

বুড়ো-আঙলা বলল, "বাজে বোকো না। নিজে তো পেট পুরে খেয়েছ। এবার আমায় একটু ফুর্তি করতে দাও।" এই-না বলে আবার সে শুরু করল তারস্বরে চেঁচাতে।

সেই শব্দে শেষটায় ঘুম ভাঙল তার বাবা-মা'র। দৌড়ে ভাঁড়ার-ঘরের কাছে গিয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তারা তাকাল। নেকড়েকে দেখতে পেয়ে তারা দৌড়ে ফিরে গেল। তার পর চাষী ফিরল একটা কুড়ুল আর তার বউ একটা কাস্তে নিয়ে। চাষী তার বউকে বলল,

"আমার পেছনে থাকো। আমার কুড়ুলের ঘায়ে নেকড়ে না মরলে ছুটে গিয়ে তাকে তুমি টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলো।"

বুড়ো-আঙলা তার বাবার গলা শুনে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা! বাবা! আমি এইখানে। নেকড়ের পেটের মধ্যে।"

কথাগুলো শুনে মহানন্দে তার বাবা চেঁচিয়ে উঠল, "ভগবানকে ধন্যবাদ, আমাদের ছেলে ফিরেছে। বুড়ো-আঙলা যাতে জখম না হয় তার জন্য বউকে সে বলল কাস্তেটা সরাতে। তার পর কুড়ুল ঘুরিয়ে এমন জোরে সে মারল নেকড়েটার মাথায় যে এক ঘায়েই তার দফা-রফা। তার পর ছুরি কাঁচি এনে সেটার পেট চিরে তারা বার করলে ক্ষুদে মানুষটাকে। চাষী বলল, "তোর জন্যে ভারি ভাবনায় ছিলাম।"

বুড়ো-আঙলা বলল, "আমি অনেক দূর-দূর জায়গা ঘুরে এসেছি। তাজা বাতাসে আবার নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।"

"কোথায়-কোথায় গিয়েছিলি?"

"বাবা! আমি গিয়েছিলাম একটা ইঁদুরের গর্তে, তার পর একটা গোরুর ভুঁড়িতে আর তার পর একটা নেকড়ের পেটে। এবার থেকে তোমাদের সঙ্গে আমি বাড়িতেই থাকছি।"

তার বাবা-মা বলল, "পৃথিবীর সব ধন-দৌলত দিলেও তোকে আর আমরা বিক্রি করব না।" বড়ো-আঙলাকে জড়িয়ে ধরে তারা চুমু খেয়ে তাকে দিল অনেক খাবার-দাবার। আর দিল নতুন একটা পোশাক। কারণ এভাবে ঘোরাঘুরি করায় পোশাকটা তার এক্কেবারে নোংরা হয়ে গিয়েছিল।

হাড়-হাবাতের দল

মোরগ তার মুরগি-বউকে বলল, "এখন বাদাম পাকার সময়। কাঠবিল্লি সেগুলো নিয়ে পালাবার আগে, চলো আমরা পাহাড়ে গিয়ে ভুরি-ভোজ সেরে নিই।"

মুরগি-বউ বলল, "খুব ভালো কথা। চলো—দুজনে মিলে খুব ফুর্তি করা যাবে।"

এই-না বলে দুজনে তারা পাহাড়ে গেল। দিনটা ভারি সুন্দর—রোদেভরা। তাই সন্ধে পর্যন্ত সেখানে তারা রইল। তারা খুব খাওয়া-দাওয়া করছিল, নাকি খুব খাওয়া-দাওয়ার দরুন তাদের খুব গর্ব হয়েছিল—ঠিক কী কারণে জানি না—তারা স্থির করল পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে না। বাদামের খোল দিয়ে মোরগ তাই বানাল ছোট্টো একটা গাড়ি। মুরগি-বউ সেটায় বসে মোরগকে বলল, "এবার তুমি টানতে শুরু কর।"

মোরগ বলল, "তামাশা রাখো। আমি হেঁটে বাড়ি ফিরব সেও বরং ভালো—কিন্তু তোমার গাড়ি টানব না। টানবার জন্যে গাড়িটা বানাই নি। কোচওয়ান সেজে কোচওয়ানের জায়গায় বসতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু গাড়ি টানবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

এই নিয়ে তারা তর্কাতর্কি করছে এমন সময় সেখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে একটা হাঁস প্যাঁক্‌প্যাঁক্ করে চেঁচিয়ে উঠল, "চোরের দল! আমার বাদামগাছের বাগানে কে তোদের আসতে অনুমতি দিয়েছিল? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।" এই-না বলে মোরগের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
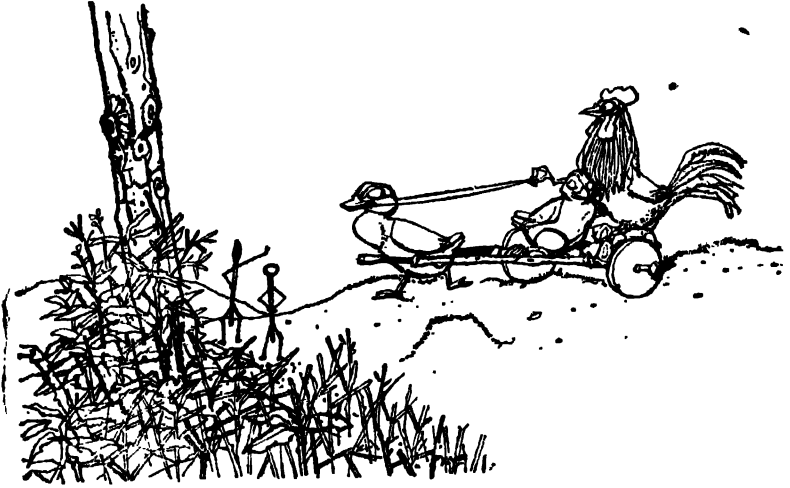
মোরগও কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সেও ছুটে গিয়ে নখ দিয়ে আঁচড়ে-টাঁচড়ে তাকে এমন নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল যে শেষপর্যন্ত কাঁদতে-কাঁদতে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হল হাঁস। শাস্তি হিসেবে খুশি হয়েই গাড়ি টানতে সে রাজি হল। মোরগ গিয়ে বসল কোচওয়ানের জায়গায়। গাড়ি ছুটল। হাঁসকে আরো জোরে ছোটার জন্য মোরগ ক্রমাগত হাঁক ছাড়তে লাগল।

খানিক যাবার পর তাদের সঙ্গে দেখা হল দুজন পথিকের—একটা আলপিন, অন্যটা ছুঁচ। তারা দুজন চেঁচিয়ে তাদের বলল থামতে। কাকুতি-মিনতি করে তারা বলতে লাগল এক্ষুনি এমন অন্ধকার হয়ে যাবে যে, তাদের পক্ষে আর এক পা এগুনোও সম্ভব হবে না। তারা বলল রাস্তাটা ভারি নোংরা। অনুরোধ করল গাড়িতে তাদের তুলে নিতে। জানাল তারা গিয়েছিল দর্জি-বাড়িতে সেখানে বিয়ার খেতে-খেতে তাদের খুব দেরি হয়ে গেছে। মোরগ দেখল দুজনেই তারা খুব রোগা। বেশি জায়গা নেবে না। তাই তাদের সে গাড়িতে তুলে নিল। কিন্তু তার আগে তাদের কথা দিতে হল—মুরগি-বউয়ের পায়ের আঙুল তারা মাড়াবে না।

সন্ধের পর তারা পৌঁছল এক সরাইখানায়। সে-রাতে আর এগুতে

তারা চাইল না। তা ছাড়া হাঁসের পা দুটোও খুব শক্তসমর্থ নয় তাই বার বার এদিক থেকে ওদিকে সে টলে টলে পড়ছিল। তাই তারা উঠল সেই সরাইখানায়। সরাইখানার মালিক কিন্তু প্রথমটায় অনেক ওজর-আপত্তি করল। বলল সেখানে আর খালি জায়গা নেই। আসলে তার মনে হয়েছিল এ-লোকগুলো বিশেষ ভদ্রগোছের নয়। কিন্তু তাদের কথাবার্তা ছিল খুব মিষ্টি। তারা বলল পথে আসতে-আসতে মুরগি-যে ডিম পেড়েছে সেটা তাকে দিয়ে দেবে। তা ছাড়া ফাউ হিসেবে দেবে হাঁসটাকেও, যেটা প্রতিদিন একটা করে ডিম পাড়ে। এই-সব শুনে সরাইখানার মালিক শেষটায় সেখানে তাদের রাত কাটাতে দিতে রাজি হল। সেখানে উঠে সব চেয়ে ভালো খাবার-দাবার আনিয়ে মহা ফুর্তিতে তারা রাত কাটাল।

পরদিন খুব ভোরে—তখনো ভালো করে আলো ফোটে নি আর সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—মুরগি-বউয়ের ঘুম ভাঙিয়ে ডিমটা বার করে ঠুকরে মোরগ সেটা ভাঙল। তার পর দুজনে মিলে সেটা খেয়ে খোলাটা তারা উনুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে ছুঁচের কাছে গেল। ছুঁচটা তখনো ঘুমচ্ছিল। সেটার ঝুঁটি ধরে তুলে এনে সরাইখানার মালিকের চেয়ারের গদিতে তারা গেঁথে দিল। আলপিনটাকে আটকাল তার তোয়ালেতে। তার পর মাঠ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। হাঁসটা খোলামেলা জায়গায় ঘুমোতে ভালোবাসত। তাই সারা রাত সে ছিল উঠোনে। তাদের ছুটে পালাবার শব্দ শুনে জেগে উঠে সেও দৌড় দিল আর খানিক বাদে ছোটো একটা নদীতে পৌঁছে চট্‌পট্‌ সাঁতরে পালাল। অমন চট্‌পট্‌ আগের দিন গাড়িটার সামনে সে ছুটতে পারে নি।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুয়ে সরাইখানার মালিক গেল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে। আলপিন তার মুখ আঁচড়ে ডান থেকে বাঁ কান পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলল লাল একটা দাগ। তার পর রান্নাঘরে গিয়ে পাইপ ধরিয়ে যখন উনুনের কাছে সে এসেছে—ডিমের খোলাটা উড়ে তার চোখে এসে পড়ল। "মনে হচ্ছে সব-কিছু আজ আমার মাথায় এসে পড়ছে", বলে চটে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে সে গিয়ে বসল তার আরাম-কেদারায়। আর বসবার সঙ্গে-সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে 'গেলুম! গেলুম!' বলে সে চেঁচিয়ে উঠল। কারণ আলপিনের চেয়ে ছুঁচের জ্বালা অনেক বেশি। আর এবার সে যন্ত্রণাটা বোধ করল মাথায় নয়।
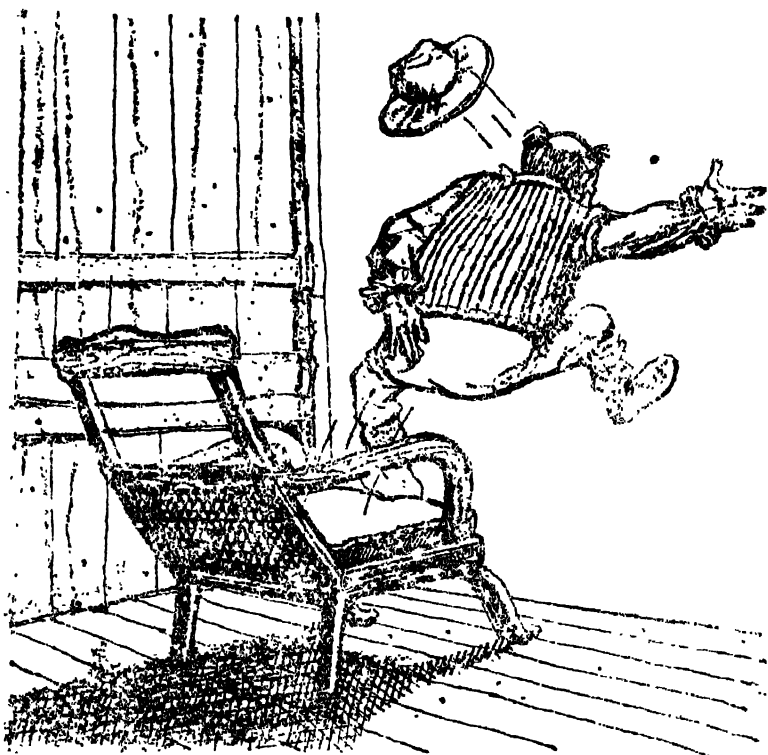
সে তখন দস্তুরমতো ক্ষেপে উঠল। তার সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ল গত সন্ধেয় যে-সব অতিথি এসেছিল তাদের উপর। তাদের খোঁজে সে গিয়ে দেখে সবাই পালিয়েছে। তখন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ভবিষ্যতে কখনো সে আর কোনো হাড়-হাবাতেদের তার সরাইখানায় থাকতে দেবে না—যারা দাম না দিয়ে পেট পুরে খায়, তার উপর করে নানারকম বাঁদরামি।

লোহার উনুন

বহুকাল আগে এক বনের এক রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হয় বুড়ি এক ডাইনির। ডাইনি তাকে নানা শেকড়-বাকড় খাইয়ে জাদুমুগ্ধ করে রেখে দেয় লোহার প্রকাণ্ড একটা উনুনের মধ্যে। বহু বছর সেখানে সে ছিল। কারণ কেউই তাকে মুক্তি দিতে পারে নি। একদিন এক রাজকন্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। বাবার দেশে সে ফিরে যেতে পারছিল না। সেই উনুনের কাছে আসতে রাজকন্যে শুনল কে যেন তাকে বলছে, "কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?" রাজকন্যে বলল, "আমি পথ হারিয়েছি। বাবার দেশে ফিরতে পারছি না।"

উনুনের ভিতরকার স্বর উত্তর দিল, "আমি যা বলি তাই করলে এক্ষুনি তোমায় সাহায্য করব। আমার বাবা তোমার বাবার চেয়েও বড়ো রাজা। তোমাকে বিয়ে করতে আমি রাজি।"

শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "লোহার একটা উনুন নিয়ে কী আমি করব?" কিন্তু রাজপুত্রের কথায় রাজি হতে সে তাকে বলে দিল কোন পথ দিয়ে যেতে হবে। সেই পথে গিয়ে দু ঘণ্টার মধ্যে সে পৌঁছল তার বাবার প্রাসাদে। কিন্তু যাবার আগে রাজপুত্র তাকে বলেছিল, "বাড়ি ফিরে এই উনুনটা কাটবার জন্যে একটা ছুরি নিয়ে আসবে।" রাজকন্যে ফিরতে বুড়ো রাজা এবং আর সবাই খুব খুশি হল। কিন্তু রাজকন্যের মনে সুখ ছিল না। বাবাকে সে বলল একটা লোহার উনুনকে বিয়ে করবে বলে সে কথা দিয়েছে।

মেয়ের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে রাজা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

গ্রিম—৩-১১

তাঁর জ্ঞান ফিরলে স্থির করা হল রাজকন্যের বদলে পাঠানো হবে জাঁতাওয়ালার মেয়েকে। সে-মেয়েটিও খুব রূপসী। একটা ছুরি দিয়ে তাকে বলা হল সেখানে গিয়ে উনুনের গায়ে একটা ফুটো করতে। ছুরি দিয়ে উনুনটা ক্রমাগত সে আঁচড়াতে লাগল, কিন্তু কোনোই ফল হল না। শেষটায় উনুনের মধ্যেকার সেই স্বর বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এখন দিনের আলো ফুটেছে।"

মেয়েটি বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবার জাঁতাকলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

সেই স্বর বলল, "তুমি তা হলে জাঁতাওয়ালার মেয়ে? তুমি বাড়ি গিয়ে রাজকন্যেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

উনুন তাকে যা বলেছিল ফিরে গিয়ে রাজাকে সে কথা সে বলল। তার কথা শুনে সবাই গেল আরো ঘাবড়ে। রাজার কাছে চাকরি করত একটি মেয়ে। মেয়েটির বাবা শুয়োর চরাত। জাঁতাওয়ালার মেয়ের চেয়েও সে রূপসী। রাজা তাকে একটা মোহর দিয়ে বললেন রাজকন্যের বদলে সে যেন যায় উনুনটার কাছে। এ-মেয়েটিও ছুরি দিয়ে সেটা আঁচড়াল, কিন্তু ফুটো করতে পারল না। শেষটায় উনুনের ভিতর থেকে সেই স্বর বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এখন দিনের আলো ফুটেছে।"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, কারণ বাবার শিঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

সেই স্বর বলে উঠল, "যে শুয়োর চরায় তুমি তা হলে তার মেয়ে? ফিরে গিয়ে রাজকন্যেকে বোলো সে না এলে তার বাবার গোটা রাজত্ব ধ্বংস হবে।"

কথাটা শুনে রাজকন্যে কাঁদতে লাগল। কিন্তু নিজের কথার খেলাপ সে করতে পারল না। বাবাকে বিদায় জানিয়ে একটা ছুরি নিয়ে সে তাই যাত্রা করল সেই বনের দিকে। উনুনটার কাছে দু ঘণ্টা ধরে লোহার উপর ছুরিটা ঘষে সে বানাল ছোট্টো একটা ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে তাকিয়ে সে দেখে উনুনের মধ্যে বসে রয়েছে দামী পোশাক পরে সুপুরুষ এক রাজপুত্র। দেখেই রাজকন্যে তাকে ভালোবেসে ফেলল। গর্তটা রাজকন্যে আরো বড়োসড়ো করার পর রাজপুত্র বেরিয়ে এসে বলল,

"তুমি আমার, আমি তোমার। তুমিই আমার কনে, কারণ আমাকে তুমি মুক্তি দিয়েছ।"

রাজপুত্র তক্ষুনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু

রাজকন্যে যাবার আগে বলল বাবার কাছ থেকে সে বিদায় নিতে চায়। রাজপুত্র রাজি হল কিন্তু এক শর্তে—তিনটের বেশি কথা রাজাকে সে বলতে পারবে না।

রাজকন্যে বাড়ি ফিরল। কিন্তু রাজপুত্রের নির্দেশ ভুলে গিয়ে রাজার সঙ্গে সে কইল তিনটের অনেক বেশি কথা। ফলে অনেক তুষার-মোড়া পাহাড়ের চুড়ো আর উপত্যকার উপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোহার উনুনটা। কিন্তু রাজপুত্র আর তার মধ্যে বন্দী রইল না। ইতিমধ্যে রাজার কাছে বিদায় নিয়ে বনে ফিরে রাজকন্যে কোথাও সেই লোহার উনুনটা খুঁজে পেল না। ন দিন ধরে সেটাকে সে খুঁজল। শেষ-টায় ক্ষিদের জ্বালায় মনে হল সে মরে যাবে। সন্ধে হতে সে উঠল একটা গাছে। আর মাঝরাত হলে সে দেখল কাছেই একটা বাতি জ্বলছে। সাহায্য পাবার আশায় সে এগিয়ে গেল বাতিটার দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছল ছোট্টো একটা কুঁড়েঘরে। সেটার চার পাশে অনেক ঘাস আর দোড়গোড়ায় জড়ো-করা কিছু কাঠকুটো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সে দেখে ভিতরে রয়েছে কতগুলো মোটা-সোটা কোলাব্যাঙ। তাদের জন্য একটা টেবিলে খাবার-দাবার সাজানো। প্লেট আর ডিশগুলো রুপোর। সাহস করে দরজায় টোকা দিতে একটা ব্যাঙ বলে উঠল :

"শোন্ রে ওরে ব্যাঙের ছা
দরজা খুলে দেখ গে যা
বাইরে কে রয় দাঁড়িয়ে।"

সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে ছোট্টো একটা ব্যাঙ দরজা খুলে দিল আর রাজকন্যে চলে এল বাড়ির মধ্যে।

রাজকন্যেকে সবাই আদর অভ্যর্থনা করে বসতে বলল। তার পর প্রশ্ন করল কোথা থেকে সে আসছে আর কোথায় চলেছে। রাজকন্যে তাদের জানাল বাবার সঙ্গে তিনটের বেশি কথা বলেছিল বলে সেই উনুন আর রাজপুত্র অদৃশ্য হয়েছে। দেশে-দেশে রাজপুত্রকে সে চলেছে খুঁজে। তখন সেই কোলাব্যাঙটা চেঁচিয়ে উঠল :

"শোন্ রে ওরে ব্যাঙের ছা,
নামিয়ে ফেলে চুপড়িটা,
আন্ রে এইখানে।"

ছোট্টো ব্যাঙ চুপড়িটা নিয়ে এলে বুড়ো কোলাব্যাঙ তাকে রাতের খাবার খেতে দিল। তার পর দেখাল নরম একটা বিছানা। সেটায় শুয়ে রাজকন্যে পড়ল অঘোরে ঘুমিয়ে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর বুড়ো ব্যাঙ তাকে দিল তিনটে ছুঁচ, একটা চাকা-লাগান লাঙল আর তিনটে বাদাম। বলল পথে এগুলো কাজে লাগবে। কারণ রাজপুত্রের সঙ্গে আবার দেখা হবার আগে তাকে পেরিয়ে আসতে হবে কাঁচের একটা পাহাড়, তিনটে ধারাল তরোয়াল আর বড়ো একটা হ্রদ। সেগুলো নিয়ে যেতে-যেতে রাজকন্যে পৌঁছল সেই কাঁচের পাহাড়ে। জুতোর শুকতলায় সেই ছুঁচগুলো লাগিয়ে সে পেরিয়ে গেল পাহাড়টা। তার পর পৌঁছল ধারালো তরোয়ালগুলোর কাছে। সেগুলো সে পেরিয়ে গেল চাকা-লাগানো লাঙলে চড়ে। শেষে সে পৌঁছল সেই হ্রদে। সেটা পেরিয়ে সে দেখল চমৎকার প্রকাণ্ড একটা কেল্লা। সেই কেল্লায় থাকত রাজপুত্র কিন্তু সে ভেবেছিল রাজকন্যে বেঁচে নেই তাই আর-একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছিল। রাজকন্যে সেই কেল্লায় গিয়ে দাসীর চাকরি নিল। এক সন্ধেয় পকেটে হাত দিয়ে সে দেখে বুড়ো কোলাব্যাঙ তাকে যে-তিনটে বাদাম দিয়েছিল সেগুলো রয়েছে। একটা বাদাম ভেঙে সে দেখে তার মধ্যে রয়েছে চমৎকার একটা পোশাক। নতুন কনে সে খবর পেয়ে বলল, পোশাকটা তার চাই—কারণ সে পোশাক দাসীকে মানায় না। রাজকন্যে সেটা বিক্রি করতে রাজি হল একমাত্র শর্তে—রাজপুত্রের শোবার পাশের ঘরে একটা রাত তাকে কাটাতে দিতে হবে। নতুন কনে রাজি হল, কিন্তু রাজপুত্র ঘুমোতে যাবার আগে তাকে সে দিল ঘুমের ওষুধ-মেশানো এক গেলাস সরবত। রাজকন্যে পাশের ঘর থেকে বলে চলল, "তোমাকে গহন বন আর লোহার উনুন থেকে আমি বাঁচিয়েছি। তোমার কাছে এসেছি কাঁচের পাহাড়, তিনটে ধারাল তরোয়াল আর প্রকাণ্ড একটা হ্রদ পেরিয়ে। তবু আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?"

ঘুমিয়ে ছিল বলে রাজপুত্র তার কথাগুলো শুনতে পেল না। কিন্তু দাসদাসীরা সেটা শুনে রাজপুত্রকে জানাল। পরদিন সন্ধেয় দ্বিতীয় বাদামটা ভেঙে রাজকন্যে দেখল প্রথমটার চেয়ে সুন্দর আর-একটা পোশাক সেখানে রয়েছে। আবার কনে বলল, সেটা তার চাই-ই

রাজকন্যে আগের শর্তে সেটা দিল। কিন্তু রাজপুত্রকে কনে আবার ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ছিল বলে কিছুই সে শুনতে পেল না। কিন্তু দাস-দাসীরা তার কান্না শুনে সব কথা জানাল রাজপুত্রকে।

পরের সন্ধেয় তৃতীয় বাদাম ভেঙে রাজকন্যে দেখে সোনার চুমকি-বসানো একটা পোশাক রয়েছে। কনে বলল সেটাও তার চাই। আগের শর্তে রাজকন্যে তাকে দিল পোশাকটা। কিন্তু এবার ঘুমের ওষুধ না খেয়ে রাজপুত্র সেটা দিল ফেলে। আর আজ যখন রাজকন্যে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে শুরু করল কী করে গহন বন আর লোহার উনুন থেকে তাকে সে উদ্ধার করেছিল—রাজপুত্র তার কথাগুলো শুনে চমকে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কথা ঠিক : তুমি আমার, আমি তোমার।" তার পর রাজকন্যের সঙ্গে জুড়িগাড়িতে চেপে সেই হ্রদে নৌকো বেয়ে চট্‌পট্‌ তারা ওপারে পেঁছিল। তিনটে ধারাল তরোয়াল পেরুল চাকা-লাগানো লাঙলে চড়ে আর কাঁচের পাহাড় পেরুল সেই তিনটে ছুঁচের সাহায্যে। সব শেষে তারা পেঁছিল কোলাব্যাঙদের কুঁড়েঘরে। আর সেটার মধ্যে তারা যেতেই কুঁড়েঘরটা হয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ। জাদুমুক্ত হয়ে কোলাব্যাঙরাও ফিরে পেল তাদের স্বাভাবিক চেহারা। কারণ আসলে তারা সবাই ছিল সেই দেশের রাজার ছেলে। তার পর খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। আর রাজপুত্র আর রাজকন্যে বাস করতে লাগল সেই প্রাসাদে। এই প্রাসাদ রাজপুত্রের বাবার প্রাসাদের চেয়েও ছিল অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু মেয়ের জন্য বুড়ো রাজা খুব হেদিয়ে পড়ায় দু দেশের সরকারকে মিলিত করে তারা গিয়ে রইল বুড়ো রাজার সঙ্গে। তার পর অনেক বছর ধরে সুখে শান্তিতে রাজ্য শাসন করল তারা।

ইঁদুর, পাখি আর সসেজ

একবার একটা ইঁদুর, একটা পাখি আর একটা সসেজের দেখা হয়ে গেল। আর একসঙ্গে তারা পাতলো সংসার। বহুদিন তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাল একই বাড়িতে। পাখির কাজ ছিল রোজ বনে উড়ে গিয়ে কাঠকুটো নিয়ে আসা। ইঁদুরকে হত জল তুলতে, আগুন জ্বালতে আর খাবারের টেবিল সাজাতে। রান্নার কাজ করত সসেজ।

কিন্তু যারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে তারা সেটা জানতে পারে না। একদিন পাখি গেল কাঠকুটো আনতে। অন্য একটা পাখির সঙ্গে দেখা হতে বড়াই করে সে জানাল তাদের সুখের সংসারের কথা। অন্য পাখি উপহাস করে বলল: অন্যরা বাড়িতে থাকে আর তাকে সব কাজ করতে হয়—সেটা তো নেহাতই ক্রীতদাসের জীবন। আগুন জ্বালিয়ে, জল তুলে ইঁদুর তার ছোট্টো ঘরে গিয়ে খানিক বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় তারা তাকে ডেকে বলল খাবার টেবিল সাজাতে। রান্নাটা ভালো হচ্ছে কি না দেখার জন্য সসেজ রইল উনুনের পাশে। ডিনারের সময় হলে স্যুপ্ নাড়িয়ে, তরি-তরকারিতে এক
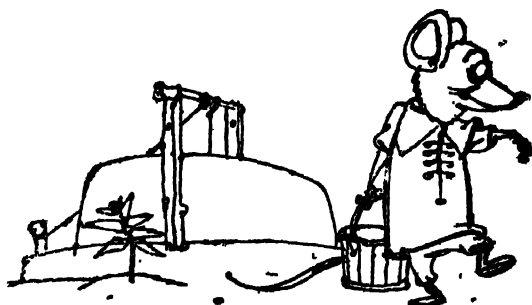
চিমটে নুন সে দিল। রান্নাবান্না তৈরি, এমন সময় পাখি ফিরে তার বোঝাটা নামাল। তার পর টেবিলের সামনে বসল তারা খেতে। পেট ভরলে তারা ঘুমোল সকাল পর্যন্ত। কারণ এরকমটাই ছিল তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জীবন।

পরদিন কিন্তু পাখি বলল কাঠকুটো আনতে সে আর যাবে না। বোকার মতো অন্যদের গোলামী করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। গৃহস্থালীর কাজ ঢেলে সাজানো দরকার। অন্য কেউ এবার বাইরের কাজ করুক। ইঁদুর আর সসেজ পাখিকে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু পাখি কিছুতেই তার গোঁ ছাড়ল না। কে বাইরে যাবে তাই নিয়ে অন্য দুজন টস্ করল। বাইরে যাবার দান পড়ল সসেজের। স্থির হল ভবিষ্যতে ইঁদুর হবে রাঁধুনী আর জল তুলবে পাখি।

আর ফলে হল কী? সসেজ বেরুল কাঠকুটো আনতে আর পাখি তুলল জল, উনুনে সস্‌প্যান চড়াল ইঁদুর। পাখি আর ইঁদুর অপেক্ষা করে রইল কাঠকুটো নিয়ে সসেজের ফেরার জন্য। কিন্তু সসেজ আর ফেরেই না দেখে তারা দুজনে পড়ল দারুন দুশ্চিন্তায়। শেষটায় খোলা হাওয়ায় খানিক ঘুরে আসার জন্য পাখি উড়ে বেরুল বাইরে। ভাবল সসেজের সঙ্গে পথে তার দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু সে দেখে : তাদের বাড়ির কাছে সসেজকে একটা কুকুর টুপ্ করে গিলে ফেলল। এইভাবে নির্লজ্জের মতো ডাকাতি করার জন্য কুকুরকে নালিশ জানাল পাখি। কিন্তু এই নালিশে কোনো কাজ হল না। কারণ কুকুর বলল সসেজের কাছে অনেক জাল চিঠিপত্র ছিল বলে তাকে বধ করে সে ঠিকই করেছে।

কাঠকুটোর বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে যা দেখেছে শুনেছে সব কথা জানাল পাখি। তাদের দুজনেরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল আর স্থির করল ভবিষ্যতে তারা একসঙ্গেই থাকবে। পাখি সাজাল খাবার টেবিল আর ইঁদুর গেল রান্নাঘরে তদারক করতে। কিন্তু সসেজের মতো ঝুঁকে যেই-না সে সুপ্ নাড়াতে গেছে অমনি তার মধ্যে পড়ে সঙ্গে-সঙ্গে সে গেল ডুবে। খাবার নিতে এসে পাখি দেখে—রাঁধুনি কোথাও নেই। ইঁদুরকে খোঁজার জন্য পাখি কাঠকুটো চার দিকে ছড়িয়ে ফেলল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেল না। সেই কাঠকুটোয় গিয়ে পড়ল আগুনের একটা ফুলকি আর সঙ্গে-সঙ্গে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুন নেভাবার জন্য পাখি ছুটল জল আনতে। কিন্তু কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল বালতিটা। আর সেটা তুলতে গিয়ে সে গেল ডুবে। তার পর থেকে পাখিটাকে আর দেখা যায় নি।

কুঁড়ে চরকা-মেয়ে

এক সময় এক গ্রামে ছিল একটি লোক আর তার বউ। বউটি ছিল বেজায় কুঁড়ে, কোনো কাজ করতে চাইত না। বর তাকে সুতো কাটার জিনিসপত্র দিলে হয় সে সুতো কাটত না; নয়ত কাটা-সুতো পড়ে থাকত মাকুর মধ্যে। কাটিমে গোটানো হত না। বউকে তাই নিয়ে সে বকাবকি করলে ঠোঁট ফুলিয়ে বলত, "কাটিমই নেই তো সুতো গোটাব কিসে? বনে গিয়ে কাঠ কেটে এনে আমাকে একটা কাটিম বানিয়ে দাও।"

লোকটি বলল, "কাটিমের অভাবে যদি সুতো গোটাতে না পার তা হলে নিশ্চয়ই কাঠ এনে তোমাকে একটা কাটিম বানিয়ে দেব।"

তার কথা শুনে বউটি খুব ঘাবড়ে পড়ল। কারণ তার বর কাঠ আনলে কাটিম বানানো হলে তাতে সুতো হবে গোটানো। আর সুতো গোটানো হলে তাকে কাটতে হবে আরো সুতো। তাই খানিক ভেবে চুপিচুপি বরের পিছন-পিছন সে গেল বনে। তার বর যখন গাছে উঠে ভালো একটা ডাল কাটছে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"কাটিম-কাঠ কাটলে পর মরবে,
জড়ালে সুতো দারুন শোক করবে।"

কুড়ুল নামিয়ে লোকটি আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে উঠল, 'এটা নিশ্চয়ই আমার কল্পনা। এ-সব কথা কেউ বলতে পারে না। অতএব ভয় পাবার কারণ নেই।' তাই আবার সে কুড়ুল তুলে কাঠ-কাটা শুরু করল আর সঙ্গে-সঙ্গে শুনল সেই একই কথাগুলো। ভয় পেয়ে

কাঠ-কাটা থামিয়ে সে খানিক ভাবল। তার পর সাহস ফিরে আসতে তৃতীয়বার যেই-না কুড়ুলটা সে তুলেছে আবার সে শুনতে পেল সেই কথাগুলো :

"কাটিম-কাঠ কাটলে পরে মরবে,
জড়ালে সুতো দারুন শোক করবে।"

তখন সে স্থির করল সেদিন আর কাঠ কাটবে না। তাই চট্‌পট্‌ গাছ থেকে নেমে চলল বাড়ির দিকে।

তার বউ ঘুর-পথে না গিয়ে সোজাসুজি একটা পথ ধরে ছুটে গিয়ে তার বরের আগেই পৌঁছল বাড়িতে। বর ফিরতে নিতান্ত নিরীহ গলায় সে প্রশ্ন করল, "কাটিম বানাবার ভালো কাঠ এনেছ ?"

লোকটি বলল, "না।" তার পর সেই রহস্যময় স্বরের সাবধান-বাণী জানাল তার বউকে। কিছুদিন তাকে আর বকাবকি করল না।

কিন্তু অগোছাল বাড়িটা দেখতে-দেখতে আবার একদিন ধৈর্য হারিয়ে বউকে সে বলল, "বউ, শনের সুতোগুলো যে মাকুতেই রয়ে গেছে। এটা কিন্তু ভারী লজ্জার কথা।"

তার বউ বলল, "আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। তুমি আমাকে কাটিম দাও নি। তাই এক কাজ কর—মেঝেয় তুমি শোও। মাকুর সুতো তোমার গায়ে জড়িয়ে রাখব।"

লোকটি রাজি হল। ফলে মাকুর সুতো তার গায়ে হল জড়ানো ; তার পর লোকটি বলল, "এবার এটা ফোটানো দরকার।"

তাই শুনে বউটি আবার ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তার মাথায় নতুন একটা ফন্দি খেলতে বলল, "কাল খুব ভোরে সুতোটা সেদ্ধ করা যাবে।"

পরদিন ভোর-ভোর উঠে উনুন ধরিয়ে সে চড়াল একটা কেতলি। কিন্তু সুতোর বদলে তাতে সে রাখল এক দলা দড়ির ফেঁসো। তার বর তখনো ঘুমোচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে সে বলল, "এক মিনিটের জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। উনুনে সুতোটা চড়িয়েছি। সেদিকে খেয়াল রেখো। কিন্তু সাবধান। কারণ মোরগ ডাকার সময় সেদিকে না তাকালে সুতোটা দড়ির ফেঁসো হয়ে যাবে।"

লোকটি বিছানা ছেড়ে উঠে, চট্‌পট্‌ পোশাক পরে গেল রান্নাঘরে। কিন্তু কেতলির মধ্যে তাকিয়ে সে দেখে সেখানে রয়েছে শুধু এক দলা

দড়ির ফেঁসো। বেচারা ভাবল দোষটা নিশ্চয়ই তারই, খুব সম্ভব তাকে যা-যা করতে বলা হয়েছিল সেটা সে করে নি।

ভবিষ্যতে সুতো বা সুতো কাটার কথা বউকে কখনো সে আর বলত না।

দক্ষ চার ভাই

এক সময় এক গরিব লোকের ছিল চার ছেলে। তারা বড়ো হবার পর তাদের সে বলল, "বাছারা, পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় আমার হয়েছে। তোমাদের দেবার মতো কিছুই আমার নেই। তোমরা সবাই দেশ-বিদেশে গিয়ে এমন সব পেশা শিখো যাতে কোনো অভাবে পড়তে না হয়।

বাবাকে বিদায় জানিয়ে হাতে বেড়াবার ছড়ি নিয়ে একসঙ্গে চার ভাই বেরুল ফটক দিয়ে। যেতে যেতে তারা পৌঁছল এক চৌমাথায়—চার দিকে চলে গেছে চারটে পথ। বড়ো ভাই তখন বলল, "এইখানে আমরা বিদায় নেব চার বছর পূর্ণ হবার দিন এখানে আবার আমরা আসব। এই চার বছর ধরে নিজেদের ভাগ্য খুঁজে বেড়াব।"

তার পরে তারা চারজন চার দিকে চলে গেল। যেতে যেতে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল একটি লোকের। সে তাকে প্রশ্ন করল কোথায় সে চলেছে আর কী সে করতে চায়।

সে বলল, "আমি একটা পেশা শিখতে চাই।"

লোকটি বলল, "আমার সঙ্গে চুরি বিদ্যে শিখবে চলো।"

সে বলল, "না, এটা সৎ পেশা নয়। চোর হলে শেষপর্যন্ত ফাঁসিতে লটকাতে হয়।"

লোকটি বলল, "ফাঁসিতে লটকাবার ভয় নেই। যেটা কেউ জোগাড় করতে পারে না সেটা কী করে জোগাড় করতে হয় তোমায় আমি শিখিয়ে দেব। কেউ তোমার সন্ধান পাবে না।"

সেই লোকটির কাছে বড়ো ভাই শিখল কি করে দক্ষ চোর হওয়া যায়। ফলে যে জিনিস সে চাইত সেটা শেষপর্যন্ত নির্ঘাৎ ফেলত হাতিয়ে।

মেজো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল আর একটি লোকের। তাকেও সে একই প্রশ্ন করল।

মেজো ভাই বলল, "জানি না।"

সে বলল, "আমার সঙ্গে জ্যোতিষবিদ্যা শিখবে চলো। এর চেয়ে ভালো পেশা আর নেই। কারণ কিছুই তোমার অজানা থাকবে না।"

মেজো ভাই তাই হয়ে উঠল খুব ভালো জ্যোতিষী। গুরুর কাছে বিদায় নেবার সময় গুরু তাকে একটা দুরবীন দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে পৃথিবী ও আকাশের সব খবর পাবে। কিছুই তোমার কাছে রহস্যময় থাকবে না।"

সেজো ভাইকে এক শিকারী শেখাল শিকারের সব কায়দা কানুন। ফলে সে হয়ে উঠল খুব দক্ষ শিকারী। যাবার সময় গুরু তাকে একটা রাইফেল দিয়ে বলল, "এটার নিশানা তোমার কখনো ফস্কাবে না।"

ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে একটি লোকের দেখা হতে সে প্রশ্ন করল, "দর্জি হবে?"

সে বলল, "দর্জিদের কথা আমার জানা আছে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পায়ের ওপর পা দিয়ে ছুঁচের ফোঁড় দিয়ে যেতে হয়। তার ওপর তো আছে ইস্ত্রি করার ঝামেলা। এটা আমার পোষায় না।

লোকটি বলল, "এটা তোমার ধারণা। কিন্তু আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব একেবারে অন্য ধাঁচে দর্জির কাজ, সেটা মোটেই বিরক্তিকর নয়। সব-দিক দিয়েই সেটা সম্মানজনক।

ছোটো ভাই তাই নিপুণভাবে শিখল দর্জির কাজ। বিদায় নেবার সময় দর্জি তাকে একটা ছুঁচ দিয়ে বলল, "এটা দিয়ে ডিমের মতো নরম বা ইস্পাতের মতো শক্ত সব-কিছুই তুমি সেলাই করতে পারবে। যেটা সেলাই করবে সেটার মধ্যে সেলাইয়ের একটা ফোঁড়ও দেখা যাবে না।

চার বছর পূর্ণ হবার দিন চার ভাই আবার সেই চৌমাথায় হাজির হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তার পর একসঙ্গে ফিরল তাদের বাবার কাছে। খুব খুশি হয়ে তাদের বাবা বলল, "বাতাস দেখছি তোদের আমার কাছে উড়িয়ে এনেছে।"

কে কী পেশা শিখেছে বাবাকে তারা বলল। তারা বাড়ির সামনে একটা বড়ো গাছের ছায়ায় বসে কথা বলছিল। তাদের বাবা বলল, "কে কী রকম শিখেছিস এবার পরখ করে দেখি।" তার পর মেজো ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই গাছটার মগডালে একটা বাবুইয়ের বাসা আছে। সেখানে কটা ডিম আছে বলতে পারিস?"

জ্যোতিষ তার দুরবীন দিয়ে উপরে তাকিয়ে বলল, "পাঁচটা।"

তাদের বাবা বড়ো ছেলেকে বলল, "পাখিটা ডিমগুলোর ওপর বসে তা দিচ্ছে। এমনভাবে ডিমগুলো নিয়ে আয় যাতে পাখিটা টের না পায়।"

চুরি বিদ্যেয় পোক্ত বড়ো ছেলে গাছে উঠে পাখিটার শরীরের নীচেকার পাঁচটা ডিম নিয়ে এল। তা দেবার জন্য পাখি যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল কিছুই টের পেল না।

তাদের বাবা টেবিলের চার কোণে চারটে ডিম রাখল, মাঝখানে একটা। তার পর শিকারী ছেলেকে বলল, "এক গুলিতেই এই পাঁচটা ডিম ঠিক আধখানা করে ভেঙে দে।"

শিকারী ছেলে তার বাবার কথামতো রাইফেল তুলে একগুলিতেই আধখানা করে ভাঙল পাঁচটা ডিম। তার কাছে এমন ধরনের বারুদ ছিল বন্দুকের গুলিকে যেটা পাঁচ দিকে ছোটাতে পারে।

তাদের বাবা তখন ছোটো ছেলেকে বলল, "এবার তোর পালা। পাখির বাচ্চাসমেত ডিমগুলোকে এমনভাবে সেলাই করে দে যাতে বাচ্চাগুলোর কোনোরকম অনিষ্ট না হয়।"

দর্জি-ছেলে তার ছুঁচ দিয়ে বাবার কথামত সেগুলো সেলাই করে দিল। তার পর চুরি বিদ্যেয় পোক্ত ছেলে ডিম পাঁচটা আবার রেখে এল বাসার মধ্যে পাখির শরীরের তলায়। পাখিটা কিছুই টের পেল না।

ছোট্টো পাখি দুদিন তা দেবার পর ডিম ফেটে বেরুল পাঁচটা বাচ্চা। তাদের গলার চার পাশে দেখা গেল সরু লালচে ডোরা। সেখানটাই দর্জি সেলাই করে দিয়েছিল।

তাদের বাবা বলল, "তোদের কাজ দেখে বাস্তবিকই খুব খুশি হয়েছি। সময় নষ্ট না করে ভালো-ভালো কাজ তোরা শিখেছিস। তোদের মধ্যে কে যে সব চেয়ে দক্ষ বলতে পারছি না। যা-যা শিখেছিস ভবিষ্যতে সে-সব কাজে লাগাবার সময় প্রমাণ হবে সব চেয়ে ভালো কাজ কে শিখেছে।"

অল্প দিনের মধ্যেই দারুন আতঙ্কে দেশের সবাই শুনল —রাজকন্যাকে একটা ড্রাগন ধরে নিয়ে গেছে। রাজা দিন-রাত মেয়ের জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলেন আর ঘোষণা করে দিলেন—রাজকন্যেকে যে উদ্ধার করে আনবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

তাই শুনে চার ভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "আমাদের দক্ষতা প্রমাণ করার এটা মস্ত সুযোগ।"

জ্যোতিষ তার দুরবীনের মধ্যে তাকিয়ে বলল, "রাজকন্যেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটা পাথরের ওপর সে বসে আছে। কিন্তু ড্রাগন তাকে পাহারা দিচ্ছে।"

তাই রাজার কাছ থেকে একটা জাহাজ চেয়ে নিয়ে চার ভাই তাতে চড়ে পৌঁছল সেই পাথরটার কাছে। পৌঁছে দেখে রাজকন্যে সেখানে বসে কিন্তু তার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে ড্রাগনটা।

শিকারী বলল, "গুলি করতে ভয় করছে। কারণ ড্রাগনের সঙ্গে রূপসী রাজকন্যেও মারা পড়বে।"

চোর বলল, "আমি তা হলে চেষ্টা করে দেখি।" এই-না বলে চুপিচুপি গিয়ে এমন নিপুণভাবে রাজকন্যের কোল থেকে ড্রাগনের মাথা নামিয়ে তাকে সে চুরি করে আনল যে, ড্রাগন কিছুই টের পেল না। যেমন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল তেমনি সে ঘুমুতে লাগল।

মনের আনন্দে রাজকন্যেকে নিয়ে চট্‌পট্‌ জাহাজে উঠে তারা সমুদ্রে পাড়ি দিল। কিন্তু জেগে উঠে রাজকন্যেকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ রেগে দারুন ফোঁস্‌ফাঁস্‌ করতে-করতে ড্রাগন উড়ে এল তাদের জাহাজের উপর। তার পর জাহাজটার উপর সে যখন ঝাঁপ দিতে যাবে শিকারী তার রাইফেল তুলে এক গুলিতে চুরমার করে দিল তার হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আকাশ ভেঙে তার প্রকাণ্ড শরীর জাহাজটার উপর পড়ায় সেটা ভেঙে হয়ে গেল টুকরো-টুকরো। তাদের কপাল ভালো। তাই কোনোরকমে জাহাজের দুটো পাটা ধরে সমুদ্রে তারা চলল সাঁতরে। তারা ভীষণ বিপদে পড়ত। কিন্তু দর্জি তাদের বাঁচাল। সেই আশ্চর্য ছুঁচটা বার করে চট্‌পট্‌ পাটা দুটো সেলাই করে সে বানিয়ে ফেলল একটা ভেলা। সবাই সেই ভেলায় উঠল। তার পর দর্জি সেই ভেলা বেয়ে জাহাজের সব টুকরোগুলো সংগ্রহ করে এমন নিপুণভাবে সেলাই করে ফেলল যে, সেটা হয়ে গেল আগের মতোই নিখুঁত গোটা একটা

জাহাজ। তাতে চড়ে মনের আনন্দে তারা ফিরল দেশে।

মেয়েকে দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। চারভাইকে তিনি বললেন, "তোমাদের একজনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। কার সঙ্গে বিয়ে হবে নিজেরাই তোমরা স্থির কর।"

ভাইদের মধ্যে তখন বেধে গেল ভীষণ ঝগড়া।

জ্যোতিষী বলল, "রাজকন্যেকে আমি না দেখতে পেলে তোমাদের দক্ষতা কোনো কাজেই লাগত না। অতএব রাজকন্যে আমার।"

চোর বলল, "রাজকন্যের কোল থেকে ড্রাগনের মাথা নামিয়ে আমি না নিয়ে এলে তোমার আবিষ্কারে কী লাভ হত শুনি? অতএব রাজকন্যে আমার।"

শিকারী বলল, "গুলি করে ড্রাগনকে আমি না মারলে তোমাদের সবাইকে সে টুকরো-টুকরো করে ফেলত। অতএব রাজকন্যে আমার।"

দর্জি বলল, "ছুঁচ দিয়ে জাহাজটা আমি না করে দিলে তোমরা সবাই ডুবে মরতে। অতএব রাজকন্যে আমার।"

রাজা তখন বললেন, "তোমাদের সবাইকারই রাজকন্যেকে বিয়ে করার সমান অধিকার আছে। কিন্তু চারজনেই তো রাজকন্যেকে বিয়ে করতে পারে না। তাই তোমাদের কারুর সঙ্গেই রাজকন্যের বিয়ে দেব না। তার বদলে পুরস্কার হিসেবে তোমাদের সবাইকেই দেব আমার রাজত্বের এক-একটা অংশ।"

রাজার সিদ্ধান্ত শুনে চার ভাই খুশি হয়ে বলল, "নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করার চেয়ে এটাই ভালো।"

তাই চার ভাই রাজত্বের এক-একটা অংশ নিয়ে তাদের বাবার সঙ্গে বাকি জীবন কাটাল সুখে শান্তিতে।

দুই ফার্দিনান্দ

এক সময় ছিল একটি লোক আর তার বউ। যতদিন তাদের অবস্থা ভালো ছিল ততদিন তাদের ছেলেপুলে হয় নি। কিন্তু তারা খুব গরিব হয়ে পড়ার পর বউটির কোলে এল একটি ছেলে। তারা গরিব বলে প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউই ছেলেটির ধর্মবাবা হতে চাইল না। লোকটি তখন তার বউকে বলল ছেলেটির ধর্মবাবার খোঁজে সে যাবে পাশের গ্রামে।

যেতে-যেতে পথে তার সঙ্গে দেখা হল আর-একটি গরিব লোকের। গরিব লোকটি জানতে চাইল, কোথায় সে চলেছে। লোকটি ছেলের ধর্মবাবার খোঁজে চলেছে শুনে সে বলল, "আমরা দুজনেই গরিব। তাই আমিই হব তোমার ছেলের ধর্মবাবা। কিন্তু মনে রেখো, আমি খুব গরিব। তাই কোনো উপহার দিতে পারব না। এতে আপত্তি না থাকলে বউকে বোলো ছেলেকে নিয়ে গির্জেয় আসতে।"

ছেলে নিয়ে গির্জেয় গিয়ে তারা দেখে সেই ভিখিরি তাদের আগেই সেখানে পৌঁচেছে। ভিখিরি ছেলেটির নাম দিল 'বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ'।

গির্জে থেকে বেরিয়ে ছেলের মায়ের হাতে একটা চাবি দিয়ে ভিখিরি বলল, "চাবিটা খুব সাবধানে রেখো। ছেলের চোদ্দো বছর পূর্ণ হলে বিস্তীর্ণ পতিত জমিতে যেয়ো। সেখানে একটা কেল্লা দেখবে। এই চাবি দিয়ে সেটার দরজা খোলা যাবে।"

ছেলেটি সুস্থ সবল হয়ে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। তার যখন সাত বছর বয়েস একদিন সে খেলা করছিল ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। তারা

নিজেদের ধর্মবাবার কথা বলতে শুরু করে কে কী উপহার পেয়েছে সে কথা জানিয়ে খুব বড়াই করতে লাগল। ছেলেটি রইল চুপ করে। কারণ কখনো সে শোনে নি ধর্মবাবা তাকে কোনো উপহার দিয়েছিল বলে।

বাড়ি ফিরে সে প্রশ্ন করল, "বাবা, ধর্মবাবা আমায় কিছু দেয় নি।"

তার বাবা বলল, "হ্যাঁ, একটা চাবি দিয়েছিল। সেটা দিয়ে পতিত জমির কেল্লার দরজা খোলা যাবে। কেল্লাটা দেখলে দরজা খুলে ভেতরে যেতে পারো। কারণ সেটা তোমার কেল্লা।"

ছেলে তক্ষুনি ছুটল কেল্লার খোঁজে। কিন্তু কোথাও কোনো কেল্লা সে খুঁজে পেল না।

চোদ্দো বছর পূর্ণ হবার পর আবার সে গেল সেই পতিত জমিতে। এবার সেখানে কেল্লাটা দেখে দরজা খুলে সে গেল ভিতরে। কিন্তু তার মধ্যে একটা ছাই রঙা ঘোড়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। ঘোড়াটা দেখে খুব খুশি হয়ে লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে সে বাড়ি ফিরল।

ঘোড়াটা পেয়ে তার গর্ব আর ধরে না। সেটায় চড়ে সে বেরুল দেশ দেখতে। যেতে-যেতে সে দেখে পালকের একটা কলম মাটিতে পড়ে আছে। প্রথম সে ভেবেছিল কলমটা কুড়িয়ে নেবে। তার পর ভাবল একটা কলম জোগাড় করা মোটেই কঠিন নয়।

এই-না ভেবে যেই সে ঘোড়া ছুটিয়েছে, এমন সময় শুনল কে যেন বলছে, "ফার্দিনান্দ, আমাকে দয়া করে সঙ্গে নাও।"

পিছন ফিরে কাউকে সে দেখতে পেল না। কিন্তু কলমটা কুড়িয়ে নিল।

খানিক যাবার পর সে পৌঁছল একটা নদীর কাছে। নদীর তীরে সে দেখে কাদায় আটকে একটা মাছ ছটফট করছে। মাছটার লেজ ধরে তাকে সে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

জল থেকে মুখ তুলে মাছ বলল, "আমাকে কাদা থেকে উদ্ধার করেছ বলে তোমাকে একটা উপহার দেব। এই বাঁশিটা নাও। দরকারে পড়ে বাজালেই তোমাকে সাহায্য করতে আসব।"

আবার যেতে-যেতে তার সঙ্গে দেখা হল একটি লোকের। সে প্রশ্ন করল, "কোথায় চলেছ?"

"পরের গ্রামে।"

"তোমার নাম কী?"

"বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ।"

"তাই নাকি! তোমার আর আমার নাম প্রায় একই। কারণ আমার নাম, 'বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ'।"

একসঙ্গে যেতে-যেতে তারা পৌঁছল পরের গ্রামে।

বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ জানত নানা ছলাকলা। সে জানতে পারত লোকেদের মনের কথা। কে কী করবে আগে থেকেই সে কথা সে বলে দিতে পারত। বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দকে তার পছন্দ হয় নি।

একটা সরাইখানায় দুজনেই তারা উঠল। সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হল রূপসী একটি মেয়ের। বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দকে সে ভালোবেসে ফেলল। কারণ তার চেহারা ছিল খুব সুন্দর।

মেয়েটি তাকে প্রশ্ন করল, "কোথায় চলেছ?"

সে বলল, "বিশেষ কোনো জায়গায় নয়। এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

মেয়েটি বলল, "তুমি যেয়ো না। রাজা একজন সইস্ খুঁজছেন। তুমি সেই কাজের জন্যে চেষ্টা করো।"

চাকরিটার জন্যে আবেদন করতে বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দের কিন্তু লজ্জা করল। মেয়েটি বলল, তার হয়ে সে-ই আবেদন করবে। তাই রাজাকে গিয়ে জানাল তার সন্ধানে খুব ভালো লোক আছে।

রাজা বললেন, "লোকটিকে কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ো।"

নিজের ছাই-রঙা ঘোড়াটাকে ছেড়ে যেতে কিন্তু বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দের মন সরলো না। তাই রাজাকে সে বলল তাঁর গাড়ির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যাবার কাজ সে নেবে।

কথাটা শুনে বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ মেয়েটিকে বলল, "আমাকে সাহায্য না করে ও-লোকটাকে সাহায্য করলে কেন?"

মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। সে বুঝেছিল এ লোকটা বিপজ্জনক শত্রু হয়ে উঠতে পারে। তাই তার মন রাখার জন্য বলল, "তোমার কথাও রাজাকে গিয়ে বলছি।"

রাজাকে সে বলল, বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দকে তাঁর খাসভৃত্যের চাকরি দিতে।

রাজা তাকে চাকরি দিলেন। রাজাকে রোজ পোশাক পরাবার সময় সে দুঃখ করে বলত, যে মেয়েকে রাজা ভালোবাসেন তাকে তিনি

হারিয়েছেন।

বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দকে বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ দেখতে পারত না বলে রাজাকে এক সকালে সে বলল, "মহারাজ, আপনার ঘোড়সওয়ারকে বলুন মেয়েটিকে খুঁজে আনতে। না পারলে তার মুণ্ডু কেটে ফেলবেন।" রাজা তাই তাকে আদেশ দিলেন রূপসী মেয়েটিকে খুঁজে আনতে। বললেন, না পারলে তাকে মরতে হবে।

বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ খুব ভয় পেয়ে গেল। আস্তাবলে তার ছাই-রঙা ঘোড়ার কাছে গিয়ে বলল, "কী করি বল তো? ভীষণ বিপদে পড়েছি।"

তখন সে শুনতে পেল একটি স্বর বলছে, "বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ, কেঁদো না।"

স্বরটা শুনে সে চার দিকে তাকাল। কিন্তু তার ছাই-রঙা ঘোড়া ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। ঘোড়াকে তখন সে বলল, "তোর সঙ্গে এবার আমার ছাড়াছাড়ি হবে। কারণ নিশ্চয়ই আমি মরব!"

আগের স্বর আবার বলে উঠল, "বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ, কেঁদো না।"

তখন সে বুঝল কথাগুলো তাকে বলছে ছাই-রঙা ঘোড়াটা। তাই ঘোড়াকে সে বলল, "বন্ধু ঘোড়া, সত্যিই তুই কথা বলতে পারিস? যে-মেয়েকে রাজা ভালোবাসতেন তাকে খোঁজবার জন্যে তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। না পারলে মরতে হবে। এখন কী করি, বল তো?"

ছাই-রঙা ঘোড়া বলল, "এক্ষুনি রাজাকে গিয়ে বলো তুমি যাবে। কিন্তু তার আগে চেয়ে নিয়ো এক জাহাজ-ভর্তি মাংস আর রুটি। কারণ হ্রদের মধ্যে আছে দৈত্যের দল। খেতে না দিলে তারা তোমার হাত-পা ছিঁড়ে ফেলবে। সেখানে আছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাখি। রুটির টুকরো না পেলে তারা উপড়ে ফেলবে তোমার চোখ দুটো।"

কসাইকে রাজা আদেশ দিলেন মাংস দিতে আর রুটিওয়ালাকে আদেশ দিলেন রুটি দিয়ে জাহাজটা ভরে দিতে।

জাহাজে মাংস-রুটি ভরা হবার পর ছাই-রঙা ঘোড়া তাকে বলল, "আমার পিঠে চড়ে তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলো। জাহাজের কাছে দৈত্যরা এলে বোলো:

"ধীরে, দানব, ধীরে!
তোমার কথা ভেবেছি;

জাহাজে-ভরা খাবার-দাবার
তাইতো আমি এনেছি।

"আর পাখির দল জাহাজের উপর পাক খেতে শুরু করলে বোলো :

"ধীরে, পাখি ধীরে !
তোমার কথা ভেবেছি ;
জাহাজ ভরে অনেক রুটি
তাইতো আমি এনেছি।

'এই বলে তাদের খেতে দিয়ো। তা হলে তোমার ক্ষতি তারা করবে না। উলটে করবে সাহায্য। যে কেল্লায় রাজকন্যে ঘুমিয়ে আছে সেটা তোমায় তারা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান, রাজকন্যের ঘুম ভাঙাবে না। দৈত্যরা পালঙ্কসুদ্ধু তাকে নিয়ে আসবে।"

ঘোড়ার কথামতো হুবহু সব-কিছু ফলে গেল। দৈত্য আর পাখিরা খাবার-দাবার পেয়ে হল খুব খুশি। তার পর দৈত্যের দল পালঙ্কসুদ্ধ রাজকন্যেকে নিয়ে এল রাজার কাছে।

রাজকন্যেকে দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু বললেন, সেই কেল্লা থেকে জরুরি কিছু কাগজপত্রও আমার দরকার ছিল।

রাজা বললেন, কাগজপত্রগুলো নিয়ে আসতে হবে বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দকে। আনতে না পারলে সে মরবে। আস্তাবলে গিয়ে ছাই-রঙা ঘোড়াকে সে বলল, "বন্ধু ঘোড়া, আবার আমাকে যেতে হবে।"

ছাই-রঙা ঘোড়া বলল, "আগে যা-যা করেছিলে ঠিক সেই কাজ-গুলোই আবার তোমায় করতে হবে।"

তাই সে জাহাজ ভর্তি রুটি আর মাংস নিয়ে আবার যাত্রা করল এবং প্রথমবারের মতোই ঘটল সব-কিছু।

কেল্লার কাছে পৌঁছতে ছাই-রঙা ঘোড়া বলল, "রাজকন্যের শোবার ঘরে যাও। টেবিলের ওপর দেখবে কাগজপত্রগুলো রয়েছে।" সেখানে গিয়ে সেগুলো সে নিয়ে এল। কিন্তু ফিরতি-পথে তার হাত থেকে পালঙ্কের কলমটা পড়ে গেল জলে।

ছাই-রঙা ঘোড়া হায়-হায় করে বলে উঠল, "এ-ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারব না।"

ফার্দিনান্দের তখন কিন্তু তার বাঁশিটার কথা মনে পড়ল। সেটা বাজাতেই পালকের কলম মুখে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে জলে ভেসে উঠল সেই

মাছটা। কাগজপত্র নিয়ে সে হাজির হল কেল্লায়। আর তার পর রাজার সঙ্গে বিয়ে হল রাজকন্যের।

কিন্তু রাজার নাকটা ছিল বেজায় লম্বা। তাই তাকে রানীর মোটেও পছন্দ হয় নি। রাজার চেয়ে তার অনেক বেশি ভালো লেগেছিল বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ।

একদিন সমস্ত সভাসদ নিয়ে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। রানী সেখানে ঘোষণা করল নানা আশ্চর্য কলা-কৌশল সে জানে। বলল, লোকের মুণ্ডু কেটে আবার পারে জুড়ে দিতে। কেউ কি সেটা পরখ করার জন্য নিজের গলা বাড়িয়ে দেবে না? কাটবার জন্য নিজের গলা কেই-বা বাড়িয়ে দিতে চায়? কেউই তাই এগিয়ে এল না। বিশ্বাসঘাতক ফার্দিনান্দ তখন প্রস্তাব করল, রানী যেন বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দের গলা কেটে জুড়ে দেয়। রানী তার গলা কেটে সঙ্গে-সঙ্গে এমনভাবে সেটা জুড়ে দিল যে, দেখলে মনেই হয় না সেটা কাটা হয়েছিল। গলার চার দিকে শুধু রইল সরু সুতোর মতো একটা দাগ।

তাই-না দেখে ভীষণ অবাক হয়ে রাজা বললেন, "এই অবিশ্বাস্য কলাকৌশল কোথায় শিখলে?"

রাজার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানী বলল, "এসো, তোমার মুণ্ডু কেটে আবার জুড়ে দি।"

রাজা বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" সঙ্গে-সঙ্গে রানী কেটে ফেলল তাঁর মুণ্ডু। আর তার পর এমন ভান করতে লাগল—যেন সেটা জোড়া লাগছে না। তাই রাজাকে কবর দেওয়া হল আর বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দকে বিয়ে করল রানী।

বিশ্বস্ত ফার্দিনান্দ সেই ছাই-রঙা ঘোড়া ছাড়া আর কোনো ঘোড়াতেই চড়ত না। একদিন ছাই-রঙা ঘোড়া তাকে বলল সেই পতিত জমিতে নিয়ে যেতে। সেখানে পৌঁছে দৌড়ে তিনবার সে চক্কর দিল। তার পর ছাই-রঙা ঘোড়া দাঁড়াল পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে। আর অবাক কাণ্ড, সঙ্গে-সঙ্গে সে হয়ে গেল সুপুরুষ এক রাজপুত্র।

তিন কালো রাজকন্যে

শত্রুরা অস্টেন্‌ড্‌ শহর অবরোধ করে ঘোষণা করল ছশো মোহর পেলে অবরোধ তারা তুলে নেবে। শহরবাসী যখন স্থির করল মোহরগুলো যে জোগাড় করতে পারবে তাকেই তারা মেয়র নির্বাচন করবে।

শহরের বাইরে এক গরিব জেলে থাকত। সমুদ্রে মাছ ধরে সংসার চালাত সে। শত্রুরা তার ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে প্রতিদানে তাকে দিয়েছিল ছশো মোহর। জেলে শহরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে মোহরগুলো দিল। কর্তৃপক্ষ সেগুলো দিতে শত্রু অবরোধ তুলে নিল।

জেলেকে তার পর কর্তৃপক্ষ মেয়র করে দিয়ে ঘোষণা করল, যে তাকে 'মাস্টার মেয়র' বলে সম্বোধন না করবে তাকেই হবে ফাঁসিতে লটকানো।

এদিকে জেলের ছেলে শত্রুদের কাছ থেকে পালিয়ে পৌঁছল এক বনে। একটা উঁচু পাহাড়ের এক দিক সেই বনে ঢাকা ছিল। খাড়া পথ দিয়ে উঠতে উঠতে সে পৌঁছল জনশূন্য এক কেল্লায়। সেখানকার চেয়ার, টেবিল, পর্দা—সব-কিছুই কুচ্‌কুচে কালো। সেই কেল্লায় থাকত তিন রাজকন্যে। ভারি রোগা তারা। তাদের গায়ের রঙও কালো। রাজকন্যেরা তাকে জানাল তার কোনো ক্ষতি করবে না। বলল, সে হয়তো তাদের মুক্তি দিতে পারবে। জেলের ছেলে বলল, কী করে তাদের সাহায্য করতে হবে জানতে পারলে সানন্দেই সে

সাহায্য করবে। রাজকন্যেরা বলল, এক বছর সে তাদের দিকে তাকাতে বা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আরো জানাল, ইতিমধ্যে কোথাও সে যেতে চাইলে তারা তাকে সেখানে পাঠাবে। তাই শুনে জেলের ছেলে বলল, সে তার বাবার কাছে যেতে চায়। রাজকন্যেরা তখন তাকে দিল এক থলি টাকা আর এমন একটা পোশাক যেটা পরে আট দিনের মধ্যে সে তার বাবার কাছে পৌঁছতে পারে।

অস্টেনূড্ শহরে পৌঁছে তাদের আগেকার কুঁড়েঘরে বাবার দেখা সে পেল না। সে তখন লোকজনদের প্রশ্ন করল জেলের কী হয়েছে। তারা তাকে বলল, 'জেলে' বলেছে শুনলে শহরের লোক তাকে ফাঁসি দেবে।

কিন্তু তাদের কথায় কান না দেওয়ায় জেলের ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসির মঞ্চে। শহরবাসীদের তখন সে বলল, "মশাইরা, দয়া করে আমাকে আমাদের পুরনো কুঁড়েঘরে যেতে দিন।"

শহরের লোকেরা কিন্তু তার আবেদন গ্রাহ্য করল না।

তখন সে বলল, "আমার কী অপরাধ? আমি কি এক গরিব জেলের ছেলে নই, যে তার মা-বাবার জন্যে অনেক মোহর জোগাড় করেছিল?"

লোকে তখন তাকে চিনতে পারল। তার বাবা তাকে নিয়ে গেল মেয়রের বাড়িতে। সেখানে পৌঁছে সে তার এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা জানাল। বলল সেই প্রকাণ্ড জাদুময় দুর্গের কথা যেখানে আছে প্রায় কুচ্‌কুচে কালো তিন রাজকন্যে যাদের মুখে শুধু একটি করে সাদা দাগ। বলল, রাজকন্যেরা তাকে বলেছে ভয় না পেতে, জাদুর মায়া থেকে তাদের উদ্ধার করতে।

তার মা বলল, "তাতে ভালো হবে না। সেখানে তুমি এক কেতলি পবিত্র জল নিয়ে গিয়ে রাজকন্যেদের মুখে ফুটন্ত জল ছিটিয়ো।"

কেল্লায় পৌঁছে রাজকন্যেদের ঘুমোতে দেখে সে এমন ঘাবড়ে গেল যে, তার হাত ফস্‌কে রাজকন্যেদের মুখে পড়ে গেল কেতলির জল। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের শরীরের অর্ধেকটা হয়ে গেল ফরসা।

রাজকন্যেরা তখন লাফিয়ে উঠে বলল, "হতভাগা! আমাদের রক্ত তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। আমাদের এখন জাদুমুক্ত করার মতো কোনো লোকই আর পৃথিবীতে রইল না। আমাদের তিন ভাই শেকলে

বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কথা ছিল আমরা তাদের মুক্তি দেব।"

সঙ্গে-সঙ্গে কেল্লার মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। জেলের ছেলে তখন জানলার মধ্যে দিয়ে পড়ল লাফিয়ে। আর সঙ্গে-সঙ্গে কেল্লাটা গেল মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে। পাহাড়টাও হল অদৃশ্য। তার পর থেকে কেউই বলতে পারে না সেই পাহাড় আর কেল্লা কোন জায়গায় ছিল।

নোইস্‌ট্‌ আর তার তিন ছেলে

ওয়েরেল আর গোর্‌স্‌ট্‌ এর মাঝখানে নোইস্‌ট্‌ নামে একটি লোক থাকত। তার ছিল তিন ছেলে। বড়ো ছেলেটি খোঁড়া, মেজোটি অন্ধ, ছোটোটি উলঙ্গ। একদিন ক্ষেতে গিয়ে একটা খরগোশকে তারা দেখতে পেল। অন্ধ ছেলে তাকে গুলি করল, খোঁড়া ছেলে গিয়ে তাকে ধরল আর উলঙ্গ ছেলে তাকে পকেটে ভরল। তার পর তারা পৌঁছল বিরাট এক হ্রদে। সেখানে ছিল তিনটে জাহাজ। প্রথমটা ভেসে রইল, দ্বিতীয়টা ডুবল আর তৃতীয়টার তলা ছিল না। যে জাহাজটার তলা ছিল না সেটায় তিন ভাই উঠে পৌঁছল প্রকাণ্ড এক বনে। সেই বনে ছিল প্রকাণ্ড একটা গাছ, সেই গাছে প্রকাণ্ড একটা গির্জে আর সেই গির্জেয় শুকনো চেহারার বুড়ো এক কর্মচারী আর হিংস্র বুড়ো এক যাজক। মুগুর পিটিয়ে সবাইকে সে আশীর্বাদ করছিল।

শান্তি আর বিশ্রাম আমরা যেন পাই,
এই আশীর্বাদ থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ব্রাকাল শহরের একটি কুমারী মেয়ে

হিন্নান পাহাড়ের নীচে সেন্ট এ্যান্‌-এর গির্জেয় একদিন ব্রাকাল শহরের একটি কুমারী মেয়ে পৌঁছল। তার ছিল বিয়ের খুব সখ। সেখানে আর কেউ নেই ভেবে সে প্রার্থনা করতে লাগল :

"পুণ্যবতী সেন্ট এ্যান্‌
বর জুটিয়ে দাও,
লোকটা তোমার চেনা
থাকে গথ্‌মারগেটে,
ভালো করে চেনো তাকে
চুল যার হলদেটে।"

যে-লোকটা গির্জের বইপত্র দেখাশোনা করে সে তখন ছিল পূজাবেদীর পিছনে। তীক্ষ্ণ খোনা গলায় সে উত্তর দিল, "তাকে কখনো পাবে না। তাকে কখনো পাবে না।"

গির্জেতে একটি ছবির মধ্যে সেন্ট এ্যান্‌-এর পাশে ছিল মেরিমাতার সন্তান শিশু যিশুর ছবি। মেয়েটি ভাবল, শিশু যিশুই কথাগুলো বলেছে। তাই সে ভীষণ চটে বলল, "তুই চুপ কর পাজি ছোঁড়া। তোর মা-কে কথা বলতে দে।"

মিলের কথাবার্তা

"কোথায় চলেছ ?"

"ওয়ালপ-এ।"

"আমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছি। তুমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছ। সাম্‌, সাম্‌, আমরা একসঙ্গে যাব।"

"তোমার বর আছে ? তার নাম কী ?"

"চাম্‌।"

"আমার বরের নাম চাম্‌। তোমার বরের নাম চাম্‌। আমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছি। তুমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছ। সাম্‌, সাম্‌, আমরা একসঙ্গে যাব।"

"তোমারও একটা বাচ্ছা আছে ? তার নাম কী ?"

"গ্রিন্‌ড্‌।"

"আমার ছেলের নাম গ্রিন্‌ড্‌। তোমার ছেলের নাম গ্রিন্‌ড্‌। আমার বরের নাম চাম্‌। তোমার বরের নাম চাম্‌। আমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছি। তুমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছ। সাম্‌, সাম্‌, আমরা একসঙ্গে যাব।"

"তোমার চাকর আছে। তোমার চাকরের নাম কী ?"

"ঠিক-মতো-কাজ-কর্‌।"

"আমার চাকরের নাম ঠিক-মতো-কাজ-কর্‌। তোমার চাকরের নাম ঠিক-মতো-কাজ-কর্‌। আমার ছেলের নাম গ্রিন্‌ড্‌। তোমার ছেলের নাম গ্রিন্‌ড্‌। আমার বরের নাম চাম্‌। তোমার বরের নাম চাম্‌। আমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছি। তুমি ওয়াল্‌প্‌-এ যাচ্ছ। সাম্‌, সাম্‌, আমরা একসঙ্গে যাব।"

ভেড়ার ছানা আর ক্ষুদে মাছ

এক সময় ছিল ছোট্টো এক বোন। দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসত। তাদের মা ছিল না। সৎ-মা তাদের খুব নিগ্রহ করত।

একদিন বাড়ির সামনেকার মাঠে আর দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তারা খেলা করছিল। বাড়ির এক পাশে ছিল একটা পুকুর। ছেলেমেয়েরা সেই পুকুরের চার পাশে এ ওকে তাড়া করে দৌড়চ্ছিল। তার পর হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে-নাচতে তারা ছড়া কাটছিল :

"এনেক্ বেনেক্ বাঁচতে দাও,
আমার পাখি তুমিই নাও।
পাখি তখন আনবে খড়,
খড়টা দেব কসাক্‌কে।
কসাক্ আমায় দেবে দুধ
রুটিওলাকে দেব দুধ।
রুটিওলা সেঁকবে কেক
কেকটা দেব কিটিকে।
কিটিকে তখন ধরবে ইঁদুর
ইঁদুরগুলো ফেলব ফাঁদে।
আর ধরব—"

শেষ কথাটা যে বলেছিল সে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাচ্ছিল ছুটে আর অন্যরা চেষ্টা করছিল তাকে ধরতে।

জানলা দিয়ে সৎ-মা তাদের হেসে লুটোপাটি খেয়ে হুটোপাটি করতে দেখে বেজায় বিরক্ত হল। সে জানত ডাইনিদের তুক্‌তাক। তাই ভাইটিকে সে করে দিল মাছ আর বোনটিকে ভেড়ার ছানা। পুকুরের মধ্যে মাছটা মনের-দুঃখে সাঁতরে বেড়াতে লাগল আর ভেড়ার ছানা মনের দুঃখে মাঠের মধ্যে লাগল ঘুরে বেড়াতে—একটা ঘাসও দাঁতে কাটে না।

এইভাবে অনেকদিন কাটার পর কেল্লায় এল বিদেশী নানা অতিথি। সৎ-মা ভাবল মস্ত একটা সুযোগ এসে গেছে। তাই রাঁধুনিকে ডেকে সে বলল, "মাঠে গিয়ে ভেড়ার ছানাটাকে ধরে আন। সেটাকে কাটতে হবে। নইলে অতিথিদের খাবার কম পড়ে যাবে।"

রাঁধুনি গিয়ে ভেড়ার ছানাটাকে ধরে রান্নাঘরে এনে তার পাগুলো বাঁধল। মুখ বুজে সব-কিছু সইল ভেড়ার ছানা। ছুরিটা বার করে খিড়কির দরজার বাইরে রাঁধুনি যখন শানাচ্ছে সে দেখে ক্ষুদে একটা মাছ তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে পুকুরের এ-পার থেকে ও-পার সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মনে হল মাছটা যেন কিছু বলতে চাইছে।

ভেড়ার ছানা তাকে দেখে বলে উঠল :

"ভাই আমার পুকুর মাঝে
জমাট দুঃখু বুকের কাছে।
রাঁধুনি দেখো শানায় ছুরি
আমায় দিয়ে বানাবে কারি।"

ক্ষুদে মাছ উত্তর দিল :

"হায় ছোটো বোন, হায় ছোটো বোন,
কেমন করে সইব ?
পুকুরতলায় মনের কথা
কার সঙ্গে কইব ?"

ক্ষুদে মাছকে বলা ভেড়ার ছানার করুণ কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে রাঁধুনি ভাবল, 'এটা সাধারণ ভেড়ার ছানা কখনোই হতে পারে না। বাড়ির ডাইনি-গিন্নি নিশ্চয়ই কোনো মানুষকে জাদুর মায়ায় ভেড়া করে

দিয়েছে।' তাই সে বলল, "ভয় পেয়ো না। তোমায় কাটব না। এই-না বলে অন্য একটা ভেড়ার ছানা কেটে অতিথিদের জন্য রাঁধল সে। তার পর আগের ভেড়ার ছানাকে দয়ালু এক চাষীর বউয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে যা-যা শুনেছিল তাকে জানাল।

চাষীর বউ ছিল সেই ছেলেমেয়েদের ধাই-মা। সব কথা শুনে তার ভীষণ সন্দেহ হল। তাই ভেড়ার ছানাকে সে নিয়ে গেল এক ধার্মিক আর বিজ্ঞ বুড়ির কাছে। ক্ষুদে মাছ আর ভেড়ার ছানাকে মন্ত্র পড়ে সে আশীর্বাদ করার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ফিরে পেল তাদের মানুষের চেহারা তার পর তাদের সে নিয়ে গেল এক বনে। সেখানে ছোট্টো সুন্দর এক কুঁড়েতে বুড়ি ধাই-মার সঙ্গে তারা রইল সুখে-শান্তিতে।

সীসেইম্—দ্বার খোলো

এক সময় ছিল দুই ভাই। একজন গরিব, অন্যজন ধনী। গরিব ভাই তার ধনী ভাইয়ের কাছে কিছুই পেত না। খুদকুঁড়ো বেচে কোনোরকমে সংসার চালাত সে। ছেলেমেয়ে বউকে পেট ভরে রুটি খেতে দিতেও সে পারত না।

একদিন বনের মধ্যে সে তার গোরুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এমন সময় কাছেই দেখে একটা ন্যাড়া পাহাড়। আগে কখনো সেটা তার নজরে পড়ে নি। গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে পাহাড়টার দিকে সে তাকাল। এমন সময় সে দেখে বারোজন লম্বা-চওড়া হিংস্র চেহারার লোক আসছে। লোকগুলোকে দেখে তার মনে হল তারা ডাকাত। তাই গোরুর গাড়িটা একটা ঝোপের মধ্যে রেখে কী হয় দেখার জন্য সে উঠল একটা গাছে। বারোটা লোক পাহাড়টার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সীসেইম্—দ্বার খোলো।"

সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়টা ফাঁক হয়ে গেল আর বারোটা লোক সেঁধুতে সেটা হয়ে গেল বন্ধ। খানিক পরে পাহাড়টা আবার ফাঁক হল আর সেই বারোটা লোক কাঁধে ভারী ভারী ছালা নিয়ে এল বেরিয়ে।

লোকগুলো বেরিয়ে এসেই চীৎকার করে বলল, "সীসেইম্—বন্ধ হও।" পাহাড়ের দুটো দিক তখন এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেল যে, দেখে মনে হয় না সেখানে কোনো ফাঁক ছিল। বারোটা লোক তখন সেখান থেকে গেল চলে। পাহাড়ের মধ্যে কী আছে দেখার জন্য গরিব লোকটির খুব কৌতূহল হল। তাই গাছ থেকে নেমে পাহাড়টার

সামনে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "সীসেইম্—দ্বার খোলো ; সীসেইম্—দ্বার খোলো।" সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়টা গেল ফাঁক হয়ে। গরিব লোকটি তখন তার মধ্যে ঢুকল। ভিতরে গিয়ে সে দেখে বিরাট একটা গুহা সোনা-রুপোয় ঠাসা আর সেগুলোর পিছনে শস্যদানার মতো গাদা করা রয়েছে রাশিরাশি মুক্তো আর হীরে-পান্না-চুনি।

গরিব লোকটি প্রথমে স্থির করতে পারল না কী সে করবে। শেষটায় পকেট ভরে সে নিল মোহর। কিন্তু মুক্তো আর জহরতগুলো সে ছুঁলো না। তার পর বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে সে বলল, "সীসেইম্—বন্ধ হও, সীসেইম্—বন্ধ হও।" সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়টা বন্ধ হয়ে গেল আর গোরুর গাড়ি চালিয়ে সে ফিরল বাড়ি।

তার পর থেকে তার আর কোনো অভাব রইল না। ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর জন্য সে কিনল রুটি আর ভালো-ভালো খাবার-দাবার। এই ভাবে আনন্দে তার দিন কাটে। গরিবদের সে দু হাতে ভিক্ষে দেয়। লোকে অভাবে পড়লে করে সাহায্য। মোহরগুলো খরচ হতে ধনী ভাইয়ের কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লা ধার করে পাহাড়টা থেকে সে নিয়ে এল আরো মোহর।

এইভাবে যখনই তার টাকাকড়ির দরকার হয় ধনী ভাইয়ের কাছে দাঁড়িপাল্লা ধার করে সে নিয়ে আসে মোহর।

গরিব ভাইয়ের সুখের সংসার দেখে ধনী ভাইয়ের চোখ টাটিয়ে উঠল। সে ভেবে পেল না কোথা থেকে গরিব ভাই অত টাকাকড়ি পায় আর কেনই-বা বার বার তার দরকার পড়ে দাঁড়িপাল্লাটার। শেষটায় তার মাথায় একটা ফন্দি এল ; দাঁড়িপাল্লার তলায় সে লাগিয়ে দিল পিচ। আর গরিব ভাই সেটা যখন তাকে ফিরিয়ে দিল সে দেখে দাঁড়ি-পাল্লার তলায় একটা মোহর আটকে রয়েছে।

গরিব ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে সে প্রশ্ন করল, "তুই অত কি মাপিস বল তো ?"

সে বলল, "চাল, ডাল, গম।"

ধনী ভাই তখন মোহরটা দেখিয়ে তাকে বলল, "সত্যি কথা বল নইলে হাকিমের কাছে নালিশ করব।"

তাই ভয় পেয়ে গরিব ভাই তাকে জানাল সব কথা।

সব কথা শুনে ধনী ভাই তার গাড়িতে চেপে সঙ্গে-সঙ্গে চলে গেল

সেই পাহাড়ে। সে স্থির করেছিল ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ধনরত্ন নিয়ে আসবে।

পাহাড়টার কাছে পৌঁছেই সে চেঁচিয়ে বলল, "সীসেইম্—দ্বার খোলো ; সীসেইম্—দ্বার খোলো।"

কিন্তু ধনরত্নের কথা মশগুল হয়ে ভাবছিল বলে পাহাড়ের নাম সে ভুলে গিয়েছিল। তাই বার বার সে যখন বলল, "সেমেলি—দ্বার খোলো ; সেমেলি—দ্বার খোলো," পাহাড়টা একটুও ফাঁক হল না। তাই দেখে ভীষণ সে ঘাবড়ে পড়ল। আর যত সে ভাবতে লাগল ততই গুলিয়ে যেতে লাগল নামটা।

সন্ধেয় পাহাড়টা ফাঁক হতে ভিতরে এল সেই বারোজন ডাকাত। ধনী ভাইকে সেখানে বন্দী দেখে হো-হো করে হেসে তারা বলল, ওরে ঘুঘু, এইবার ধরেছি। ভেবেছিলি কি তুই এখানে আসিস সেটা আমরা লক্ষ্য করি নি? এবার বাছাধন, আর পালাতে হচ্ছে না।"

ধনী ভাই চেঁচিয়ে উঠল, "আমি না, আমি না! আমার ছোটো ভাই! কিন্তু ডাকাতরা তার কথা বিশ্বাস করল না তার মুণ্ডু দিল উড়িয়ে।

রাজকন্যে আর মটরদানা

এক সময় এক রাজপুত্র চেয়েছিল আসল এক রাজকন্যেকে বিয়ে করতে। তাই আসল রাজকন্যের খোঁজে নানা দেশে সে ঘুরল। কিন্তু মনের মতো রাজকন্যের খোঁজ কোথাও পেল না। রাজকন্যেদের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু সে বুঝতে পারল না তারা আসল রাজকন্যে কি না। তার কেবলই মনে হতে লাগল রাজকন্যেদের কী যেন খুঁত রয়েছে। তাই খুব মনমরা হয়ে সে বাড়ি ফিরল, কারণ সত্যিকারের কোনো রাজকন্যেকে বিয়ে করতে তার ভারি ইচ্ছে হয়েছিল।

এক সন্ধেয় শুরু হল সাংঘাতিক ঝড়। বাজের শব্দে কানে তালা ধরে, বিদ্যুৎ ঝলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর এমন অঝোরে ঝরতে থাকে বৃষ্টি যে, দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। এমন সময় শহরের সিংহদ্বারে কে যেন ধাক্কা দিল। বুড়ো রাজা গেলেন সেটা খুলতে।

দ্বার খুলে তিনি দেখেন বাইরে এক রাজকন্যে দাঁড়িয়ে। ভিজে সে একেবারে জুবজুবে হয়ে গেছে। তার চুল আর পোশাক থেকে ঝরঝর করে জল ঝরছে। জুতোর সামনের দিকে ঢুকে গোড়ালির কাছ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জল। তবু মেয়েটি বলল—সে সত্যিকারের রাজকন্যে।

বুড়ি রানী ভাবলেন, 'এক্ষুনি সে কথা জানা যাবে।' কিন্তু মুখে কোনো কথা বললেন না। একটা শোবার ঘরে গিয়ে বিছানা থেকে সব তোষক তুলে খাটে তিনি রাখলেন একটা মটরদানা। তার পর কুড়িটা তুলোর তোষক আর তার উপর কুড়িটা পালকের তোষক দিয়ে চাপা দিলেন সেই মটরদানাটা।

সেই বিছানায় শুয়ে রাজকন্যে রাত কাটাল। পরদিন সকালে তাকে জিগেস করা হল—কী রকম তার ঘুম হয়েছিল।

রাজকন্যে বলল, "সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি বিছানাটার নীচে কী ছিল কে জানে! এমন শক্ত কিছু ছিল যে সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেছে! ভারি কষ্ট পেয়েছি!"

সবাই তখন বুঝল—এই হচ্ছে সত্যিকারের রাজকন্যে। কারণ কুড়িটা পালকের তোষক আর কুড়িটা তুলোর তোষকের নীচেকার মটরদানা সে টের পেয়েছিল। সত্যিকারের রাজকন্যে ছাড়া এটা কেউ টের পায় না।

রাজপুত্র তাই তাকে বিয়ে করল। কারণ বুঝেছিল এইবার সত্যিকারের রাজকন্যের খোঁজ সে পেয়েছে। মটরদানাটা এখনো জাদুঘরে থাকার কথা, কেউ অবশ্য সেটা যদি চুরি না করে থাকে।

মনে রেখো—এটা কিন্তু সত্যিকারের গল্প।

অকৃতজ্ঞ ছেলে

একদিন একটি লোক তার বউয়ের সঙ্গে নিজেদের দোরগোড়ায় বসেছিল। তাদের সামনে ছিল একটা মুর্গির রোস্ট। তারা খেতে শুরু করতে যাবে, এমন সময় লোকটি দেখল তার দিকে তার বুড়ো বাবা আসছে। তাই চট্‌পট্‌ মুর্গিটা সে লুকিয়ে ফেলল যাতে তার বুড়ো বাবাকে ভাগ দিতে না হয়। তার বাবা এক গেলাস সরবত খেয়ে চলে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে গেল মুর্গির মাংসর লুকনো প্লেটটা আনতে। কিন্তু রোস্ট করা মুর্গি তখন হয়ে গিয়েছিল প্রকাণ্ড একটা কোলাব্যাঙ। ব্যাঙটা তার কাঁধে লাফিয়ে উঠে রয়ে গেল চিরকালের জন্য। তাকে লোকে নামাতে গেলে এমন কট্‌মট্‌ করে ব্যাঙটা তাকাত যে, দেখে মনে হত সেটা তাদের ঘাড়ের উপর বুঝি লাফিয়ে পড়বে। তাই সাহস করে কেউ তার কাছে যেত না। অকৃতজ্ঞ ছেলে বাধ্য হত সেটাকে খাওয়াতে। কারণ তার ভয় হত, না খাওয়ালে ব্যাঙটা তাকে খেয়ে ফেলবে। এইভাবে বাকি জীবনটা দারুণ দুঃখে আর ভয়ে ব্যাঙটাকে কাঁধে নিয়ে পৃথিবীময় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

তিনটি কুঁড়ে ছেলে

এক রাজার ছিল তিন ছেলে। তিনজনকেই তিনি সমান ভালো-বাসতেন। তাই তিনি স্থির করতে পারেন নি মৃত্যুর পর কাকে তাঁর রাজত্ব দিয়ে যাবেন। মৃত্যুর সময় রাজা তাদের ডেকে বললেন, "আমি স্থির করেছি তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে কুঁড়ে তাকেই রাজত্ব দিয়ে যাব।"

তাই শুনে বড়ো ছেলে বলল, "বাবা, তা হলে রাজত্বটা আমিই পাব। কারণ আমি এমন কুঁড়ে যে, ঘুমোবার জন্যে শুয়ে চোখ বন্ধ করতেও আমার কষ্ট হয়। চোখে এক ফোঁটা জল পড়লেও আমি চোখ বুজতে পারি না।"

মেজো ছেলে বলল, "বাবা, রাজত্বটা আমার। কারণ আমি এমন কুঁড়ে যে, আগুন পোয়াতে বসে পায়ের আঙুলগুলো পুড়ে গেলেও চেয়ার সরাতে ইচ্ছে করে না।"

ছোটো ছেলে বলল, "বাবা, রাজত্বটা আমার। কারণ আমি এমন কুঁড়ে যে, ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে কেউ যদি হাতে একটা ছুরি দেয় তা হলেও বরঞ্চ আমি ফাঁসিতে লটকাব তবু হাত তুলে দড়িটা কাটতে ইচ্ছে করে না।"

তাই শুনে রাজা বললেন, "তোমার কুঁড়েমিই চরম। তাই রাজত্ব তুমিই পাবে।"

বয়েস কমানো

যিশুখৃস্ট যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন এক সন্ধেয় সেন্ট পিটারের সঙ্গে তিনি যান এক কামারের বাড়ি। কামার তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এক বুড়ো ভিখিরি তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। বয়সের ভারে আর অসুখে ভুগে-ভুগে জিরজিরে তার শরীর। কামারের কাছে সে ভিক্ষে চাইল।

ভিখিরিকে দেখে সেন্ট পিটারের খুব করুণা হল। তাই যিশুখৃস্টকে তিনি বললেন, "প্রভু, দয়া করে এর অসুখ সারিয়ে দিন। তা হলে এ আবার খেটে খেতে পারবে।"

সেন্ট পিটারের অনুরোধ শুনে যিশুখৃস্ট সদয় গলায় কামারকে বললেন, "উনুনে কয়লা ভরে তোমার হাপরটা দাও। এই বুড়ো গরিব লোককে যৌবন আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

কামার উনুনে কয়লা ভরল। সেন্ট পিটার চালাতে লাগলেন হাপর। দেখতে-দেখতে গনগন্ করে উঠল আগুনের শিখা। যিশুখৃস্ট তখন বুড়ো ভিখিরিকে সেই আগুনের মধ্যে ঠেলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল তার দেহ আর সে গলা ছেড়ে করতে লাগল ঈশ্বরের জয়গান। তার পর তাকে কলতলায় এনে জল ঢাললেন আর লোকটির দেহ জুড়িয়ে গেলে তাকে করলেন আশীর্বাদ। সঙ্গে-সঙ্গে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বেরিয়ে এল বুড়ো লোকটি। দেখে মনে হল সে যেন তার কুড়ি বছরের যৌবন ফিরে পেয়েছে।

এক মনে কামার সব কিছু লক্ষ্য করছিল। এবার সবাইকে রাতের

খাবারের জন্য সে আমন্ত্রণ জানাল। সেই বাড়িতেই থাকত এক পঙ্গু আধ-কানা বুড়ি। কামারের সে শালী। তরুণের কাছে গিয়ে সে জানতে চাইল আগুনে পোড়াবার সময় তার কষ্ট হয়েছিল কি না।

তরুণ জানাল, মোটেই তার কষ্ট হয় নি। বলল, মনে হচ্ছিল যেন শিশিরবিন্দুর মধ্যে সে বসে আছে।

সারা রাত ধরে বুড়ি তরুণের কথাগুলো ভাবল। পরদিন ভোরে কামারকে ধন্যবাদ জানিয়ে যিশুখৃস্ট বিদায় নিলেন। কামার তখন ভাবল শালীকে সে তরুণী করে ফেলতে পারবে। কারণ যিশুখৃস্ট যা করেছিলেন সব-কিছু সে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিল। তাই শালীকে প্রশ্ন করল—আবার আঠার বছরের তরুণী হবার সাধ তার আছে কি না।

তার শালী বলল, "সাধ আছে বৈকি।"

কামার তখন উনুনের আগুন গন্‌গনে করে তার মধ্যে ঠেলে দিল বুড়িকে আর সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে সে চেঁচাতে শুরু করে দিল, "কে আছ—বাঁচাও বাঁচাও—আমাকে খুন করে ফেলছে।"

কামার তাকে ধমকে বলল, "ছট্‌ফট্‌ না করে, পাড়া জাগিয়ে চিৎকার না করে, চুপচাপ বসে থাক। আগুনটাকে আরো গন্‌গনে করে তুলছি।" এই-না বলে আরো জোরে-জোরে হাপর চালাতে লাগল কামার আর লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল আগুনের শিখা।

বুড়ি কিন্তু আরো তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। কামারের তখন সন্দেহ হল নিশ্চয়ই কিছু ভুলচুক হয়েছে। তাই উনুন থেকে বার করে এনে তাকে সে ফেলল জল-ভরা চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চায় পড়ে বুড়ি চেঁচাতে লাগল আরো জোরে-জোরে। উপরতলায় ছিল কামারের আর কামারের ছেলের বউ। বুড়ির চীৎকার শুনে দৌড়ে নেমে এসে তারা দেখে চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে বুড়ি তখন গোঙাচ্ছে।

ঈশ্বর আর শয়তানের জন্তু-জানোয়ার

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন সব জীবজন্তু। নেকড়েকে করেছিলেন তাঁর কুকুর। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন মেয়ে-হাঁস সৃষ্টি করতে।

তাঁর দেখাদেখি শয়তান ঘোষণা করল সে-ও সৃষ্টি করবে। তাই সে বানাল লম্বা লেজওলা মেয়ে-হাঁসদের। তারা মাঠে গেলে কাঁটা-ঝোপে আটকে যেত তাদের লেজগুলো আর শয়তানকে যেতে হত তাদের ছাড়াতে।

শেষটায় ভীষণ চটে উঠে শয়তান তাদের লম্বা লেজগুলো ছেঁটে দিল। আজও তাদের বেঁড়ে লেজগুলো দেখা যায়। তার পর থেকে মেয়ে-হাঁসের দল নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চরে বেড়াতে থাকে। কিন্তু একদিন হল কি, ঈশ্বর লক্ষ্য করলেন—ফলগাছ কারা মুড়িয়েছে, আঙুরলতা কারা ঠুকরেছে, কচিকচি চারা কারা ছিঁড়েছে। তাই তিনি খুলে দিলেন তাঁর নেকড়ের পাল। তাদের কাছে যে-মেয়ে-হাঁস আসে তাকেই তারা খেয়ে ফেলতে থাকে।

কথাটা শুনে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে শয়তান বলল, "আপনার জন্তুরা আমার জন্তুদের টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে।"

ঈশ্বর প্রশ্ন করলেন, "মন্দ জীব তুমি সৃষ্টি কর কেন?"

শয়তান জবাব দিল, "কারণ আমার স্বভাবটা মন্দ। তাই যা-কিছু সৃষ্টি করি সেগুলো মন্দ হতে বাধ্য। আপনার কাছে এসেছি ক্ষতিপূরণের জন্যে।"

"তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেব। ওক্‌গাছের পাতা ঝরে যাবার সঙ্গে-

সঙ্গে এসো। দেখবে ক্ষতিপূরণের টাকাকড়ি মজুত আছে।"

ওক্‌গাছের সব পাতা ঝরে যাবার পর শয়তান হাজির হয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা দাবি করল।

ঈশ্বর বললেন, "কন্‌স্‌ট্যাণ্টিনোপ্‌ল্‌-এর গির্জের কাছে মস্ত একটা ওক্‌গাছ আছে। সেটার পাতা এখনো ঝরে নি।"

বিড়্‌বিড়্‌ করে অভিশাপ দিতে-দিতে ওক্‌গাছটার খোঁজে শয়তান বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বনের পথ হারিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হল ছ মাস ধরে। শেষটায় পথ খুঁজে বাড়ি ফিরে সে দেখে আবার সব ওক-গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। তাই ক্ষতিপূরণের টাকাকড়ির দাবি করতে না পেরে তার সব মেয়ে-হাঁসদের চোখ গেলে সে পরিয়ে দিল নিজের চোখ।

তাই সব মেয়ে-হাঁসদের চোখ শয়তানের চোখের মতো আর লজগুলো বেঁড়ে। তাই মেয়ে-হাঁসের ছদ্মবেশ ধরতে শয়তানের খুব ভালো লাগে।

মোরগ আর কড়িকাঠ

এক সময় এক জাদুকর অনেক লোককে দেখাচ্ছিল নানা আশ্চর্য খেলা। তাদের সে দেখাল একটা মোরগ। খুব ভারী একটা কড়িকাঠ তুলে মোরগটা এমন ভাবে নিয়ে চলল যেন সেটা একটা পালক।

ভীড়ের মধ্যে ছিল কুমারী এক মেয়ে। তার কাছে ছিল এমন অদ্ভুত একটা পাতা যেটা সঙ্গে থাকলে জাদুর মায়া ধোঁকা দিতে পারে না। তাই সে দেখতে পেল কড়িকাঠটা আসলে খড় দিয়ে তৈরি।

মেয়েটি তখন ভীড়ের লোকদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা দেখতে পাচ্ছ না—মোরগ কড়িকাঠ বইছে না, বইছে কতকগুলো খড় ?"

লোকেরা যখন বুঝল জাদুকর তাদের ঠকিয়েছে তখন গালাগালি আর টিটকিরি দিতে-দিতে তাকে তারা তাড়িয়ে দিল। তাই ভীষণ রেগে জাদুকর স্থির করল প্রতিশোধ নেবে।

কিছুদিন পর মেয়েটির বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। বিয়ের দিন কনের পোশাক পরে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সে চলল গির্জেয়। হঠাৎ তার সামনে পড়ল একটা নদী। তখন তাতে জোয়ার এসেছে। এদিকে পার হবার কোনো সেতু সেখানে নেই। মেয়েটি তখন তার স্কার্ট হাঁটুর উপর গুটিয়ে চেষ্টা করল জল ভেঙে নদী পেরুতে। কিন্তু জলের মধ্যে যখন সে নেমেছে তখন একটা লোক ঠাট্টা করে তাকে বলল, "শুনছ মেয়ে ? তোমার চোখদুটো কোথায় ? এটাকে কী করে ভাবলে জল ?" আসলে লোকটা আর কেউ নয়—সেই জাদুকর।

মেয়েটি তখন দেখে হাঁটুর উপর স্কার্ট গুটিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে একটা শণের ক্ষেতে। অন্য লোকেরা সেটা লক্ষ্য করে হেসে টিককিরি দিয়ে উঠল মেয়েটিকে।

বুড়ি ভিখিরি

এক সময় ছিল এক বুড়ি। নিশ্চয়ই তোমরা কোনো-না-কোনো বুড়িকে ভিক্ষে করতে দেখেছ। এ-বুড়িটিও ভিক্ষে করত। কেউ তাকে ভিক্ষে দিলে সে বলত, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" বুড়ি ভিখিরি একদিন ভিক্ষে করতে-করতে এক দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখে এক ফুর্তিবাজ তরুণ আগুন পোয়াচ্ছে।

বুড়ি ভিখিরিকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে দেখে তার করুণা হল। তাই সে বলল, "ঠান্‌দি, ভেতরে আগুন পোয়াতে এসো।"

ভিতরে এসে বুড়ি আগুনের এত কাছে দাঁড়াল যে, তার ধুল্‌ধুলে পোশাকে ধরে গেল আগুন।

এটা তরুণ লক্ষ্য করল। কিন্তু তার তো উচিত ছিল আগুন নিভিয়ে দেওয়া—তাই-না? তার কাছে জল না থাকলে তার তো উচিত ছিল ঝর্‌ঝর্ করে কাঁদা। তার চোখের জল স্রোতের মতো বয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিতে পারত।

ছোট্টো রাখাল ছেলে

এক সময় ছোট্টো একটি রাখাল ছেলে ছিল। যে-কোনো প্রশ্নের বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিতে পারত বলে দিগ্‌বিদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেটির কথা রাজার কানে আসে। কিন্তু লোকের কথায় তাঁর বিশ্বাস হয় নি। ছেলেটিকে তাই তিনি ডেকে পাঠান রাজসভায়। ছেলেটি হাজির হলে রাজা তাকে বললেন, "তোমাকে তিনটে প্রশ্ন করব। উত্তর দিতে পারলে রাজপ্রাসাদে আমার সঙ্গে রেখে নিজের ছেলের মতো তোমাকে মানুষ করব।"

ছেলেটি প্রশ্ন করল, "মহারাজ, তিনটে প্রশ্ন কী কী?"

"প্রথম প্রশ্ন—সমুদ্রে কত ফোঁটা জল আছে?"

রাখাল ছেলে বলল, "মহারাজ, যতদিন না আমার গোনা শেষ হয় ততদিন সব নদীগুলোকে বন্ধ করে দিন যাতে এক ফোঁটা জলও সমুদ্রে না পড়ে। তখন আপনাকে বলব সমুদ্রে কত ফোঁটা জল আছে।"

রাজা বললেন, "দ্বিতীয় প্রশ্ন—আকাশে কত তারা আছে?"

ছেলেটি বলল, "মহারাজ, আমাকে মস্ত বড়ো এক টুকরো কাগজ দিন।" কাগজটা নিয়ে একটা আলপিন দিয়ে সেটায় এত ফুটো সে করল যেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সেগুলো গোনাও অসম্ভব। তার পর ছেলেটি বলল, "মহারাজ, কাগজে যত ফুটো আকাশে তত তারা। গুনে দেখুন।" কেউই গুনতে পারল না।

রাজা তার পর বললেন, "তৃতীয় প্রশ্ন—অনন্তের মধ্যে কতগুলো মুহূর্ত আছে?"

রাখাল হেসে বলল, "মহারাজ, পামরানিয়ায় অভেদ্য একটা পাহাড় আছে। সেটা এক মাইল উঁচু, এক মাইল চওড়া, এক মাইল গভীর। প্রতি হাজার বছরে সেই পাহাড়ে একটা পাখি এসে সেটার গায়ে ঠোঁট ঘষে। এইভাবে ঘষা খেতে-খেতে পাহাড়টা যেদিন মুছে যাবে সেইদিন অনন্তের প্রথম মুহূর্ত শেষ হবে।"

রাজা তখন বললেন, "খুব বিজ্ঞ লোকের মতো তিনটে প্রশ্নেরই উত্তর তুমি দিয়েছ। তাই আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে তুমি থাকবে। নিজের ছেলের মতো তোমাকে মানুষ করব।

তারার টাকা

এক সময় ছিল ছোট্টো একটি মেয়ে। বাবা-মাকে সে হারিয়েছিল। এমনই সে গরিব যে থাকার জন্য ছোট্টো ঘর আর ঘুমোবার জন্য ছোট্টো বিছানা তার ছিল না। শেষটায় যে-পোশাক সে পরেছিল সেটা আর দয়ালু একটি লোক তাকে রুটির যে-টুকরো দিয়েছিল সেটা ছাড়া কিছুই আর তার রইল না। কিন্তু মেয়েটি ছিল খুব ভালো আর নম্র।

পৃথিবীতে একেবারে একলা পড়ে সে মাঠে যেতে-যেতে ভাবতে লাগল, 'ভগবান আমার দেখাশোনা করবেন।' পথে তার সঙ্গে দেখা হল এক গরিব লোকের। মেয়েটিকে সে বলল, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দাও।" মেয়েটি তাকে রুটির টুকরোটা দিয়ে বলল, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

যেতে-যেতে তার কাছে কাঁদতে-কাঁদতে একটি শিশু এসে বলল, "ঠাণ্ডায় আমার মাথা জমে যাচ্ছে। মাথা ঢাকবার কিছু দাও।" মেয়েটি তার টুপি খুলে শিশুকে দিল। শিশুটি খানিকটা যাবার পর আর এক শিশু তার কাছে এল। শীতে সে হি-হি করে কাঁপছিল। কারণ তার গায়ে বডিস ছিল না। মেয়েটি নিজের বডিস খুলে তাকে দিল। আরো খানিক যেতে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল আর একটি শিশুর। মেয়েটির স্কার্ট সে চাইল আর শিশুকে মেয়েটি দিয়ে দিল নিজের স্কার্ট।

শেষটায় সে পৌঁছল এক বনে। অন্ধকার ঘন হতে আর-একটি শিশু তার কাছে এসে চাইল মেয়েটির গরম পেটিকোট। মেয়েটি ভাবল, 'এখন তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।'

এই-না ভেবে শিশুকে সে দিয়ে দিল নিজের ফ্লানেলের পেটিকোট।

তাই পৃথিবীতে নিজের বলতে কিছুই আর তার রইল না। কিন্তু সে যখন সেই অন্ধকার বনের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে, অনেক জ্বল্‌জ্বলে তারা আকাশ থেকে সেখানে ঝরে পড়তে লাগল। মেয়েটি তুলে দেখে সেগুলো রুপোর চক্‌চকে টাকা। সে আরো দেখল যে-পেটিকোট সে দিয়ে দিয়েছিল তার বদলে সব চেয়ে ভালো কাপড়ের দামী একটা পোশাক সেখানে রয়েছে। পোশাক পরে স্কার্টের মধ্যে সে কুড়িয়ে নিল টাকাগুলো। তার পর থেকে জীবনে তাকে কখনো কোনো অভাবে পড়তে হয় নি।

চুরি করা পয়সা

একবার একটি লোক তার বউ আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতে বসেছিল। তার এক বন্ধু এসেছিল খোঁজ খবর নিতে। সে-ও বসেছিল তাদের সঙ্গে ডিনারে। বারোটায় বন্ধু দেখল সাদা পোশাক পরে মড়ার মতো ফ্যাকাশে চেহারার একটি ছোট্টো মেয়েকে দরজা খুলে আসতে। মেয়েটি তাদের দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল পাশের ঘরে। খানিক বাদে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে সে আবার গেল বেরিয়ে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনেও ঘটল একই ঘটনা। বন্ধু তখন লোকটিকে প্রশ্ন করল, যে ফুটফুটে মেয়েটি সাদা পোশাক পরে প্রতিদিন খাবার সময় এসে শোবার ঘরে যায়—কে সে ?

লোকটি বলল, "কোনো মেয়েকে তো দেখি নি। তাই বলতে পারলাম না সে কে।"

পরদিন মেয়েটি আবার আসতে বন্ধু তাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। কিন্তু লোকটি তাকে দেখতে পেল না। তার বউ আর ছেলে-মেয়েরাও বলল, কাউকে তারা দেখতে পায় নি। বন্ধু তখন দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েটির পিছন-পিছন শোবার ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল। সে দেখে মেয়েটি মেঝেয় বসে কাঠের তক্তার ফাঁকগুলো একমনে খুঁটছে। অচেনা লোককে তার দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্ধু তখন খাবার টেবিলের কাছে ফিরে এসে শোবার ঘরে যা-যা দেখেছে বলে, মেয়েটির হুবহু বর্ণনা দিল।

মেয়েটির বর্ণনা শুনে লোকটির বউ বুঝতে পারল সে তারই মেয়ে, কয়েক সপ্তাহ আগে যার মৃত্যু হয়েছিল। সে তখন শোবার ঘরে গিয়ে মেঝের কাঠের তক্তা সরিয়ে দেখে দুটো পয়সা। পয়সা দুটো একদিন মেয়েকে দিয়ে সে বলেছিল সেগুলো গরিব কাউকে দিতে। মেয়েটি কিন্তু পয়সা দুটো ভিখিরিকে না দিয়ে কেক কেনার জন্য লুকিয়ে রেখেছিল। এই চুরির জন্যে তাই এখন আর মেয়েটি শান্তিতে তার কবরে ঘুমোতে পারে না। পয়সা দুটোর খোঁজে প্রতিদিন খাবার সময় সে আসে।

পয়সা দুটো তার বাবা-মা এক ভিখিরিকে দিয়ে দিল। আর সেদিন থেকে মেয়েটির দেখা আর কেউ পায় নি।

কনে পছন্দ

এক সময় তরুণ এক রাখালের বিয়ে করার সখ হয়। তিন বোনকে সে জানত। তিনজনেই সমান সুন্দরী। সে স্থির করতে পারে নি তাদের মধ্যে কাকে পছন্দ করবে। তাই মার কাছে গেল পরামর্শ নিতে। তার মা বলল:

"তাদের তিনজনকে রাতে খাবার খেতে নেমন্তন্ন কর। তার পর তাদের পনির দিয়ে লক্ষ্য করিস কে কী ভাবে কাটে।"

তার মা যা-যা বলেছিল রাখাল তাই করল। বড়ো বোন ছালসুদ্ধু পনিরটা গিলে ফেলল। মেজো বোন তাড়াহুড়ো করে কাটল পনিরের ছাল। কিন্তু তাতে অনেকটা ভালো পনির নষ্ট হল। ছোটো-বোন কিন্তু ধীরে-সুস্থে পনিরের ছাল ছাড়াল। তাতে একটুও পনির নষ্ট হল না।

রাখাল তার মাকে জানাল সব কথা। তার মা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "ছোটো বোনকে বিয়ে কর।"

তাকেই বিয়ে করল রাখাল। আর তার পর সুখে শান্তিতে লাগল সংসার করতে। কনে পছন্দ করে কোনোদিনও তাকে আক্ষেপ করতে হয় নি।

উড়নচণ্ডী মেয়ে

এক সময় তরুণী এক মেয়ে ছিল। সুন্দরী হলে হবে কী, সে কিন্তু ছিল ভারি অমনোযোগী আর কুঁড়ে। সুতো কাটতে দিলে শণের গিঁটগুলো সে ছাড়াত না। সেগুলো ছিঁড়ে লম্বা-লম্বা টুকরোগুলো ঘরময় সে ছড়াত। তার দাসী ছিল পরিশ্রমী মেয়ে। শণের টুকরোগুলো কুড়িয়ে, গিঁট ছাড়িয়ে, খুব মিহি করে সুতো কেটে তাই দিয়ে সুন্দর-সুন্দর পোশাক সে তৈরি করাত।

সেই অসাবধানী মেয়েকে এক তরুণ চাইল বিয়ে করতে। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। বিয়ের আগের দিন পরিশ্রমী দাসী তার নতুন গাউন পরে নাচতে এল। বিয়ের কনে তখন গান ধরল :

"আমার ফেলা টুকরোগুলো পরে
নাচছে মেয়ে—হেসেই যাব মরে!"

বর জানতে চাইল গানটার মানে কী। কনে বলল যে শণের টুকরো সে ফেলে দিয়েছিল সেগুলো কুড়িয়ে দাসী তার পোশাক বানিয়েছে। কথাটা শুনে তরুণ বুঝতে পারল একটি মেয়ে খুব পরিশ্রমী অন্যটি একেবারে উড়নচণ্ডী। তাই শেষপর্যন্ত দাসীকে সে বিয়ে করল।

বাঁদুরে কাহিনী

বাঁদরদের যুগে একদিন বেরিয়ে আমি সারা রোম শহরে ঘুরে বেড়াই। দেখি রেশমের সুতোয় বাতাসে ঝুলছে রোমের লাটেরান নামে বিখ্যাত গির্জে। তার পর দেখি একটা লোককে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠতে। লোকটার পা ছিল না। দেখি এমন ধারাল একটা তরোয়াল যেটা একটা সেতুকে দু টুকরো করে দেয়। আরো দেখি একটা তরুণ গাধাকে। রুপোর নাক তার। দুটো খরগোশকে সেটা তাড়া করে যাচ্ছিল। আর দেখি একটা লিন্‌ডেন গাছ। তাতে শুধু ফলেছিল বড়ো-বড়ো চ্যাপটা গড়নের কেক। তার পর দেখি দুটো শুকনো চেহারার বুড়িকে। একশো গাড়ি তেল আর ষাট গাড়ি নুন তারা পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছিল। এটা একটা বলবার মতো মস্ত গল্প নয়? তার পর দেখি একটা লাঙল আপনা থেকে ক্ষেত চষছে! ঘোড়া কিংবা বলদ লাঙলটা টানছিল না। আরো দেখি এক বছরের এক বাচ্ছাকে। রাটিস্‌বোন থেকে ট্রেভেস্ আর ট্রেভেস্ থেকে স্ট্রাস্‌বুর্গ শহর পর্যন্ত চারটে জাঁতা-পাথর বাচ্ছাটা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। আর-একটা বাজ-পাখি সাঁতার কাটছিল রাইন্ নদীতে। মাছদের খুব ঝগড়াঝাঁটি করতেও আমি শুনেছিলাম। তাদের চীৎকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, আরো দেখি গভীর একটা উপত্যকা থেকে একটা খাড়া পাহাড়ের উপর দিকে জলের মতো বয়ে চলেছে মধুর স্রোত। বাস্তবিকই এগুলো আশ্চর্য ঘটনা।

আর দেখি দুটো কাক একটা মাঠের ঘাস কাটছে, দুটো ফড়িং

একটা সেতু বানাচ্ছে, দুটো ঘুঘু একটা নেকড়েকে চিরছে-ছিঁড়ছে, আর দুটো ব্যাঙ শস্য আছড়াচ্ছে। আমি দেখি দুটো ইঁদুর এক যাজককে বিশপের পদে উন্নীত করছে আর দুটো বেড়াল একটা ভালুকের জিভ খামচে উপড়ে নিচ্ছে। তার পর একটা শামুক ছুটে গিয়ে মেরে ফেলে দুটো হিংস্র সিংহকে। তার পর দেখি এক নাপিতকে এক মহিলার দাড়ি কামাতে আর শুনি লম্বা-লম্বা দুই শিশু তাদের মাকে বলছে—বাজে বকবক কোরো না। তার পর দুটো শিকারী কুকুর জল থেকে একটা বাতাস-কল তুলে কাঁধে করে নিয়ে যায় আর একটা বুড়ো কাকতাড়ুয়া সেটা দেখে খুশি হয়। তার পর একটা খামারের আঙিনায় চারটে ঘোড়া প্রাণপণে গালচেগুলো আছড়ে পরিষ্কার করতে থাকে, দুটো ছাগল একটা চুল্লিতে আঁচ দেয় আর একটা লাল গোরু সেঁকবার জন্য সেটার মধ্যে রুটি গুঁজে চলে। তার পর একটা মোরগ ডেকে ওঠে—"কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ!" আর গল্পটার এইখানেই শেষ। কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ।

ডিট্মার্থ-এর কাহিনী

তোমাদের একটা গল্প বলি। মন দিয়ে শোনো। পৃথিবীর দিকে পিঠ আর আকাশের দিকে পেট করে আগুনে ঝলসানো দুটো মুর্গিকে আমি উড়ে যেতে দেখি। একটা জাঁতা-পাথর আর কামারের একটা নেহাই খুব ধীরে-ধীরে রাইন্ নদের উপর দিয়ে সাঁতরে যায় আর হুইটসাল্টাইড্-এর (ঈস্টার পর্বের পরের সপ্তম রবিবার থেকে এক সপ্তাহ ধরে খৃস্টীয় পর্ব) বরফের উপর বসে একটা ব্যাঙ চিবোতে থাকে একটা কাস্তে। একটা খরগোশ ধরতে তিনটে লোক আসে রণ্-পা চড়ে আর ক্রাচ-এ ভর দিয়ে। তাদের একজন কালা, একজন অন্ধ, একজন বোবা আর চতুর্থ জন খোঁড়া। খরগোশকে প্রথম দেখে অন্ধ, বোবা লোক কালার কানে চেঁচাতে থাকে আর খোঁড়া ছুটে গিয়ে চেপে ধরে খরগোশের গলা। একদল লোক শুকনো ডাঙায় নৌকো করে যেতে চায়। নৌকোয় পাল তুলে অনেক বিঘে জমি তারা পার হয়। শেষটায় নৌকো করে তারা চড়ে এক উঁচু পাহাড়ে আর সেখানেই তারা ডুবে মরে। একটা কাঁকড়া তাড়া করলে একটা খরগোশ দৌড় দেয় আর একটা গোরু মরে পড়ে থাকে একটা বাড়ির ছাতে। এই শহরের মাছি-গুলো ছাগলের মতো প্রকাণ্ড।—এইবার জানলাটা খোলো আর উড়িয়ে দাও এই-সব মিথ্যে কথাগুলো।

গল্পের ধাঁধা

একবার তিনটি মেয়েকে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুল করে দেওয়া হয়েছিল। তারা ফুটে ওঠে মাঠে। কিন্তু তাদের একজন রাতে বাড়ি যেতে পারত। তাই একবার খুব ভোরে সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে আবার ফুল হয়ে যাবার আগে বরকে সে বলল, "আজ দুপুরে এসে গাছ থেকে আমায় ছিঁড়ে নিয়ো। তা হলে তোমার সঙ্গে থাকতে পারব।" তার বর তাই করেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'বর কী করে তার বউকে চিনতে পেরেছিল?' কারণ ফুল তিনটে দেখতে ছিল হুবহু একরকম। কী করে বর চিনেছিল সে কথা তোমাদের বলছি। যে-রাতে মেয়েটি বাড়িতে তার বরের সঙ্গে ছিল সে-রাতে মাঠে তার দুই সঙ্গিনীর ওপর শিশির পড়ে। যে-ফুলে শিশির পড়ে নি সেই ফুল দেখে বর চিনতে পারে তার বউকে।

চালাক চাকর

যে-সংসারে বিশ্বাসী চাকর থাকে, যে-চাকর মনিবের আদেশ শোনে অথচ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে—সে-সংসারের কর্তা বাস্তবিকই সুখী।

হান্‌স্ ছিল সেইরকমই বিশ্বাসী চাকর। তার মনিবের একটা গোরু হারিয়ে গিয়েছিল। মনিব তাকে পাঠাল গোরুটার খোঁজে। সে গেল তো গেলই—আর ফেরে না। মনিব ভাবল, 'হান্‌স্ কখনো কাজে ফাঁকি দেয় না। খুব সে পরিশ্রমী।' অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু সে ফেরে না। তাই মনিব ভাবল—নিশ্চয়ই কোনো একটা ফ্যাসাদে সে পড়েছে। মনিব তাই নিজেই বেরুল হান্‌স্-এর খোঁজে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর সে দেখে একটা মাঠে হান্‌স্ ছোটাছুটি করছে।

তার নাগাল ধরে মনিব চেঁচিয়ে উঠল, "হান্‌স্, গোরুটার খোঁজ পেয়েছিস ?"

হান্‌স্ বলল, "না কর্তা, গোরুটার খোঁজ পাই নি—সেটার খোঁজও করি নি।"

"তা হলে এতক্ষণ কী করছিলি ?"

"গোরুটার চেয়েও ভালো জিনিসের খোঁজ পেয়েছি।"

"কী রে সেটা ?"

"তিনটে কোকিল। প্রথমটাকে দেখেছি, দ্বিতীয়টার গান শুনছি তৃতীয়টাকে ধাওয়া করছি।"

হান্‌স্-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরো। মনিবের আদেশ কখনো কানে তুলবে না। নিজের মাথায় যেটা আসে সেটাই করবে। তা হলেই হতে পারবে হান্‌স্-এর মতো চালাক আর বিশ্বাসী চাকর।

এক-চোখো, দু-চোখো, তিন-চোখো

এক সময় এক স্ত্রীলোকের ছিল তিন মেয়ে। বড়ো মেয়ের নাম 'এক-চোখো', কারণ তার কপালের মাঝখানে ছিল একটি মাত্র চোখ। মেজো মেয়ের নাম 'দু-চোখো', কারণ সাধারণ মানুষের মতো তার ছিল দুটো চোখ। ছোটো মেয়ের নাম 'তিন-চোখো', কারণ তার তৃতীয় চোখটা ছিল কপালের মাঝখানে। কিন্তু দু-চোখোকে সাধারণ মানুষের মতো দেখতে বলে তার মা আর অন্য দুই বোন তাকে দেখতে পারত না। তাকে তারা বলত, "দুটো চোখ নিয়ে তোকে দেখতে সাধারণ মানুষের মতো। তাই আমাদের পরিবারের তুই কেউ নয়।" তাকে তারা পরতে দিত ছেঁড়া কাপড়, খেতে দিত এঁটোকাটা আর করত নানাভাবে হেনস্থা।

একদিন দু-চোখো মাঠে গেছে ছাগল চরাতে। বোনেরা তাকে পেট ভরে খেতে দেয় নি। তাই ক্ষিদের জ্বালায় একটা আলে বসে সে কাঁদতে লাগল। এমন ঝর্‌ঝরিয়ে সে কাঁদতে লাগল যে, তার দু চোখ দিয়ে বয়ে গেল ছোট্টো দুটি স্রোত। মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে একবার চোখ তুলে সে দেখে তার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মেয়েটি তাকে প্রশ্ন করল, "দু-চোখো, কাঁদছ কেন?"

দু-চোখো বলল, "কাঁদছি, কারণ সাধারণ মানুষের মতো আমার দুটো চোখ আছে বলে মা আর বোনেরা আমাকে বরদাস্ত করতে পারে না। আমাকে সব সময় দারুণ হেনস্থা করে, এঁটোকাঁটা খেতে দেয়। আজ এত কম খেতে দিয়েছে যে, ক্ষিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে।"

মেয়েটি বলল, "দু-চোখো, মুখ মোছো। তোমাকে এমন একটা কথা বলব যেটা শুনলে ক্ষিদেয় আর কখনো কষ্ট পাবে না। তোমার ছাগলকে শুধু বোলো :

"ডাকো ডাকো ছাগল-ছা,
খাদ্যে ভরুক টেবিলটা।

"এটা বললেই নানা মুখরোচক খাবার ভর্তি একটা টেবিল এসে যাবে। সেখান থেকে যত খুশি খেয়ো। পেট ভরলে পর বোলো :

"ডাকো ডাকো ছাগল-ছা,
ছোট্টো টেবিল চলে যা।

"এটা বললেই টেবিলটা অদৃশ্য হবে।" কথাগুলো বলে মেয়েটি চলে গেল।

দু-চোখো ভাবল, 'ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। মেয়েটির কথা সত্যি কি না পরখ করে দেখি।' এই-না ভেবে সে বলল :

"ডাকো ডাকো ছাগল-ছা,
খাদ্যে ভরুক টেবিলটা।"

কথাগুলো বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার সামনে হাজির হল ছোট্টো একটা টেবিল। তার উপর সাদা ছোট্টো একটা টেবিল-ঢাকা, নানা প্লেট, রুপোর ছুরি-কাঁটা-চামচে আর গরম-গরম মুখরোচক খাবার—যেন সবে রান্নাঘর থেকে এসেছে। দু-চোখো তখন ভগবানকে তাঁর করুণার জন্য দুহাত তুলে প্রণাম জানিয়ে পেট ভরে খাবার-দাবার খেল। তার পর সেই মেয়েটির কথামতো বলল :

"ডাকো ডাকো ছাগল-ছা,
ছোট্টো টেবিল চলে যা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সেই ছোট্টো টেবিল আর তার উপরকার সব-কিছু হল অদৃশ্য। সব-কিছু দেখে ভারি খুশি হল দু-চোখো।

সন্ধেয় তার ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরে সে দেখল বোনেরা তার জন্য ছোট্টো একটা মাটির ভাঁড়ে সামান্য খাবার রেখে দিয়েছে। খাবারটা সে ছুঁলোও না। পরদিন আবার সে বেরুল তার ছাগলকে নিয়ে। তার জন্য এঁটোকাঁটা যা রাখা ছিল সেগুলো তেমনিই পড়ে রইল। প্রথম আর দ্বিতীয় বার বোনেরা কিছু লক্ষ্য করল না। কিন্তু বার বার এটা ঘটায় নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করল, "দু-চোখোর নিশ্চয়ই

কিছু একটা হয়েছে। খাবার আর সে ছোঁয় না। আগে তো যা আমরা দিতাম সব-কিছু চেটেপুটে সে খেত। নিশ্চয়ই অন্য কোনো উপায়ে খাবার জোগাড় করছে।" আসল ব্যাপারটা জানবার জন্য তারা স্থির করল দু-চোখো যখন ছাগল চরাতে যাবে এক-চোখো যাবে তার সঙ্গে আর লক্ষ্য রাখবে কেউ তার জন্য খাবার-দাবার নিয়ে আসে কি না।

তাই পরের বার দু-চোখো ছাগল চরাবার জন্য যখন বেরুচ্ছে এক-চোখো তার কাছে গিয়ে বলল, "আমিও তোর সঙ্গে মাঠে গিয়ে দেখব ছাগলটাকে ভালো ঘাস-পাতার জায়গায় নিয়ে গিয়ে তুই চরাচ্ছিস কি না।"

কিন্তু এক-চোখোর মতলব বুঝতে পেরে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে ছাগলটাকে এনে দু-চোখো বলল, "আয় এক-চোখো, এখানে বোস। তোকে একটা গান শোনাই।" এতটা হাঁটা এক-চোখোর অভ্যেস ছিল না, তার উপর রোদটাও ছিল কড়া। তাই ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ল। দু-চোখো তখন বার বার গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগল :

"এক-চোখো কি জেগে আছিস ?
এক-চোখো কি ঘুমোচ্ছিস ?"

গান শুনতে-শুনতে এক-চোখোর একটা চোখ বুজে এল তার পর সে পড়ল ঘুমিয়ে। দু-চোখো যখন দেখল এক-চোখো অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন সে বলে উঠল :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
খাদ্যে ভরুক টেবিলটা।"

টেবিলের সামনে বসে পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে সে আবার বলে উঠল :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
ছোট্টো টেবিল চলে যা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সব-কিছু হল অদৃশ্য। তখন এক-চোখোকে জাগিয়ে দু-চোখো বলল, "ছাগলটা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। চল, বাড়ি ফেরা যাক।"

তারা বাড়ি ফিরল। দু-চোখো আবারও তার ছোট্টো ভাঁড়ের খাবার ছুঁলো না। কেন সে খাচ্ছে না তার কারণ মাকে সে জানাতে পারল না। বলল, "মাঠে গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

পরদিন তিন-চোখোকে তাদের মা বলল, "এইবার দু-চোখোর সঙ্গে

তুই গিয়ে দেখে আয় তার জন্যে খাবার-দাবার কেউ আনে কি না। মেয়েটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে-লুকিয়ে খায়-দায়।"

তাই দু-চোখোর কাছে গিয়ে তিন-চোখো বলল, "আমিও তোর সঙ্গে মাঠে গিয়ে দেখব ছাগলটাকে ভালো ঘাস-পাতার জায়গায় নিয়ে গিয়ে তুই চরাচ্ছিস কি না।"

কিন্তু তিন-চোখোর মতলব বুঝতে পেরে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে ছাগলটাকে এনে দু-চোখো বলল, "আয়, এখানে আমরা বসি। তোকে একটা গান শোনাই।" রোদে হেঁটে-হেঁটে তিন-চোখো ক্লান্ত হয়ে বসতে দু-চোখো বার বার গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে শুরু করল সেই গানটা :

"তিন-চোখো কি জেগে আছিস ?"

কিন্তু তার পর তার গাওয়া দরকার ছিল :

"তিন-চোখো কি ঘুমোচ্ছিস ?"

সেটা না গেয়ে অসাবধান হয়ে সে গাইল :

"দু-চোখো কি ঘুমোচ্ছিস ?"

তার পর বার বার সে গুন্‌গুন্‌ করে চলল :

"তিন-চোখো কি জেগে আছিস ?
দু-চোখো কি ঘুমোচ্ছিস ?"

গান শুনতে-শুনতে তিন-চোখোর দুটো চোখ ঘুমে বুজে গেল। কিন্তু গানের মধ্যে তৃতীয় চোখকে ঘুমের কথা না বলায় সেটা রইল জেগে। তিন-চোখো অবশ্য তার তৃতীয় চোখটাও বুজেছিল চালাকি করে—ভান করছিল সেটাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আসলে সেটা মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে সব-কিছুই দেখতে পাচ্ছিল ভালোরকম। দু-চোখোর যখন মনে হল তিন-চোখো অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন সে তার ছোট্টো ছড়াটা বলে উঠল :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
খাদ্যে ভরুক টেবিলটা।"

তার পর পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে সে বলে উঠল :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
ছোট্টো টেবিল চলে যা।"

তিন-চোখো কিন্তু দেখল সব-কিছু।

দু-চোখো তার পর তার কাছে গিয়ে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলল, "তিন-চোখো, তুই ঘুমুচ্ছিলি নাকি? খুব পাহারা দিতে পারিস যা হোক! চল, বাড়ি যাই।"

বাড়ি ফিরে আবারও দু-চোখো কিছুই খেল না। তিন-চোখো তখন তার মার কাছে গিয়ে বলল, "এখন জানতে পেরেছি মেজো বোন খায় না কেন। মাঠে নিয়ে গিয়ে ছাগলটাকে সে যখন বলে :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
খাদ্যে ভরুক টেবিলটা।

"তখন তার সামনে হাজির হয় একটা টেবিল। তাতে এমন সব চমৎকার খাবার থাকে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে সে যখন বলে :

"ডাকো ডাকো ছাগল ছা,
ছোট্টো টেবিল চলে যা।

"সঙ্গে-সঙ্গে সব-কিছু হয়ে যায় অদৃশ্য। সব-কিছু আমি স্পষ্ট দেখেছি। ছড়া কেটে আমার দুটো চোখকে সে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কপালের চোখটা আমার ঘুমোয় নি।"

সব কথা শুনে হিংশুটি মা দু-চোখোকে রেগে বলল, "আমাদের চেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া করতে চাস? এইবার মজা বোঝাচ্ছি। দেখি এবার থেকে ভালো খাবার-দাবার কী করে তুই পাস!" এই-না বলে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ছাগলের বুকটা সে চিরে দিল। ফলে ছাগলটা গেল মরে।

তাই দেখে দু-চোখো মনের দুঃখে মাঠে গিয়ে আলে বসে আমুরি-ঝুমুরি হয়ে কাঁদতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেয়েটি তার কাছে হাজির হয়ে বলল, "ছোট্টো দু-চোখো, কাঁদছ কেন?"

সে বলল, "কাঁদছি কেন জানো না? তুমি যে ছোট্টো ছড়াটা শিখিয়েছিলে সেটা বললে রোজ যে-ছাগল আমার জন্যে ছোট্টো টেবিল ভরে ভালো-ভালো খাবার নিয়ে আসত তাকে আমার মা মেরে ফেলেছে। আবার ক্ষিদে-তেষ্টায় আমাকে কষ্ট পেতে হবে।"

মেয়েটি বলল, "দু-চোখো, আমার কথা শোনো। মরা ছাগলের নাড়িভুঁড়ি তোমার বোনেদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তোমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় পুঁতে ফেলো। তাতে তোমার ভালো হবে।"

কথাগুলো বলে মেয়েটি অদৃশ্য হল। দু-চোখো তখন বাড়ি গিয়ে বোনেদের বলল, "আমার ছাগলটার কিছু অংশ আমাকে দাও। ভালো কিছু চাচ্ছি না। নাড়িভুঁড়িগুলো দিলেই হবে।"

তার কথা শুনে হেসে উঠে তারা বলল, "সেগুলো তুই নিতে পারিস।"

দু-চোখো সেগুলো নিল। তার পর মেয়েটির কথা মতো নিঝুম রাতে দোরগোড়ায় সেগুলো পুঁতল।

পরদিন সকালে সবাই জেগে উঠে অবাক হয়ে দেখে দোরগোড়ায় আশ্চর্য একটা গাছ গজিয়ে উঠেছে। সেটার পাতা রুপোর আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে সোনার ফল। পৃথিবীতে সেগুলোর চেয়ে দামী আর সুন্দর কোনো জিনিস হতে পারে না। কিন্তু কেউই জানল না রাতারাতি গাছটা সেখানে কী করে গজিয়ে উঠল। শুধু দু-চোখো বুঝল গাছটা গজিয়েছে ছাগলের নাড়িভুঁড়ি থেকে। কারণ সেই জায়গাতেই নাড়িভুঁড়িগুলো সে পুঁতেছিল।

এক-চোখোকে তার মা বলল, "বাছা, গাছে চড়ে ফলগুলো পেড়ে আন।"

এক-চোখো গাছে চড়ল। কিন্তু যখনই সোনার আপেল পাড়তে যায় তখনই ডালটা তার হাত থেকে যায় ফস্‌কে। নানাভাবে সে চেষ্টা করল। কিন্তু একটা আপেলও পাড়তে পারল না।

তখন তাদের মা বলল, "তিন-চোখো, তুই গাছে চড়। তিন-চোখ দিয়ে এক-চোখোর চেয়ে তুই অনেক ভালো দেখতে পাস।"

এক-চোখো গাছ থেকে নেমে এল। তিন-চোখো উঠল গাছে। নানাভাবে সে চেষ্টা করল আপেল পাড়তে। কিন্তু আপেলগুলোকে কিছুতেই ধরতে পারল না।

শেষটায় তাদের মা বেজায় বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠল গাছে। কিন্তু এক-চোখো আর তিন-চোখোর মতো সেও পারল না কোনো আপেল ছুঁতে। বাতাসের মধ্যে সে শুধু হাত খামচাতে লাগল।

দু-চোখো তখন বলল, "আমি গাছে চড়ছি। হয়তো আমি

আপেল পাড়তে পারব।"

তার দুই বোন ঠাট্টা করে গলা ফাটিয়ে হেসে বলল, "দুটো চোখ দিয়ে তুই কী পারবি শুনি?"

কিন্তু দু-চোখো গাছে উঠতে সোনার আপেলগুলো তার কাছ থেকে সরে গেল না বরঞ্চ মনে হল সেগুলো যেন তার হাতের কাছে এগিয়ে আসছে। একটা-একটা করে আপেল পেড়ে কোঁচড় ভর্তি করে গাছ থেকে সে নেমে এল। তাদের মা আপেলগুলো নিয়ে নিল তার কাছ থেকে। কিন্তু আপেলগুলো পাড়ার জন্য তার প্রতি মোটেই তারা সদয় হল না বরঞ্চ হয়ে উঠল আগের চেয়েও নির্মম। কারণ শুধু সে-ই আপেলগুলো পাড়তে পেরেছে বলে তার দুই বোন আর মা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল।

একদিন তারা যখন সেই গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল এক 'নাইট' (ভদ্রবংশের সম্মানজনক সৈনিক) আসছে।

দুই বোন চেঁচিয়ে উঠল, "দু-চোখো, চট্‌পট্‌ গুঁড়ি মেরে বসে পড়। নাইট তোকে দেখতে পেলে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে," এই-না বলে বেচারা দু-চোখো আর তার তোলা সোনার আপেলগুলোকে একটা খালি পিপে দিয়ে তারা ঢেকে দিল। পিপেটা ছিল গাছটার পাশেই।

নাইট সেখানে এসে রুপোর পাতা আর সোনার ফলের গাছটার খুব প্রশংসা করে দুই বোনকে বলল, "এই সুন্দর গাছটা কার? যে এটার একটা ডাল ভেঙে আমায় দেবে যা চাইবে তাই তাকে দেব।"

এক-চোখো আর তিন-চোখো জানাল গাছটা তাদের। তার পর তারা চেষ্টা করল একটা ডাল ভাঙতে। কিন্তু কিছুতেই তারা পারল না। যত-বার তারা চেষ্টা করে ততবারই ডাল আর ফলগুলো চলে যায় তাদের নাগালের বাইরে।

তাই দেখে নাইট বলল, "গাছটা বলছ তোমাদের কিন্তু তার একটা ডালও তোমরা ভাঙতে পারছ না—এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!"

কিন্তু দু বোনে ক্রমাগত জোর দিয়ে বলে চলল—

গাছটা তাদেরই। তাদের মধ্যে যখন এই-সব কথাবার্তা হচ্ছে দু-চোখো তখন পিপের তলা দিয়ে গড়িয়ে দিল সোনার দুটো আপেল। আপেল দুটো গড়িয়ে এল নাইটের পায়ের কাছে। বোনেরা মিথ্যে কথা বলছে বলেই চটে উঠে আপেল দুটো গড়িয়ে দিয়েছিল দু-চোখো।

আপেল দুটো দেখে অবাক হয়ে নাইট প্রশ্ন করল, "এগুলো কোথা থেকে এল ?"

এক-চোখো আর তিন-চোখো বলল, "আমাদের আর-এক বোন আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো তার মাত্র দুটো চোখ বলে লজ্জায় সে কারুর সামনে বেরোয় না।"

কিন্তু নাইট-এর ইচ্ছে হল সেই বোনকে দেখার। তাই সে বলল, "দু-চোখো বেরিয়ে এসো।"

নাইট-এর ডাকে সাহস পেয়ে পিপের তলা থেকে বেরিয়ে এল দু-চোখো। আর তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নাইট বলে উঠল, "দু-চোখো তুমি নিশ্চয়ই গাছটা থেকে আমার জন্যে একটা ডাল ভেঙে দিতে পারবে।"

দু-চোখো বলল, "তা পারব। কারণ গাছটা আমার।" এই-না বলে গাছে চড়ে অনায়াসে একটা ডাল ভেঙে এনে নাইটকে সে দিল। সেই ডালে ছিল রুপোর পাতা আর সোনার ফল।

নাইট তখন প্রশ্ন করল, "এটার জন্য কী তোমায় দেব ?"

দু-চোখো বলল, "ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খিদেয় আর তেষ্টায়, অভাব আর অনটনে আমি কষ্ট পাই। এখান থেকে আমাকে তুমি যদি উদ্ধার করে নিয়ে যাও তা হলে আমি সুখী হব।"

সঙ্গে-সঙ্গে নাইট তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গেল তার বাবার প্রাসাদে। সেখানে সে তাকে দিল সুন্দর-সুন্দর পোশাক আর ভালো-ভালো খাবার-দাবার। কারণ দু-চোখোকে নাইট খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। আর তার পর একদিন খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

দু-চোখোর সৌভাগ্য দেখে অন্য দুই বোন হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। কিন্তু এই ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দিল, 'আশ্চর্য-গাছটা তো আমাদের রইল। এটা থেকে কোনো ফল পাড়তে না পারলেও যে এখান দিয়ে যাবে সে-ই এখানে থেমে আসবে আমাদের কাছে আর লোকের মুখে-মুখে গাছটার খ্যাতি পড়বে চার দিকে ছড়িয়ে। কে জানে হয়তো তাতেই আমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।' কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল গাছটা অদৃশ্য। গাছটার সঙ্গে মিলিয়ে গেল তাদের ভবিষ্যতের সব রঙীন স্বপ্নগুলো। এদিকে দু-চোখো এক সকালে তার ছোটো ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তার জানলার সামনে

গাছটা তার পিছন-পিছন এসেছে দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল সে।

ভারি আনন্দে কাটতে লাগল দু-চোখোর দিনগুলো। একদিন খুব গরিব দুটি মেয়ে সেই প্রাসাদে এল তার কাছে ভিক্ষে চাইতে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারল দু-চোখো, কারণ তারা হল তার অন্য দুই বোন—এক-চোখো আর তিন-চোখো। তারা তখন খুব গরিব হয়ে পড়েছে। দোরে-দোরে তাদের ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়। কিন্তু দু-চোখো তাদের তাড়িয়ে দিল না। জানাল সাদর অভ্যর্থনা। তাদের সে দিল ভালো-ভালো পোশাক আর মুখরোচক খাবার-দাবার। তাই অতীতে বোনের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা করেছিল সে কথা মনে পড়ায় গভীর অনুশোচনায় ভরে গেল তাদের হৃদয়।

সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ আর পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি

"সুপ্রভাত, হোলেনুথ্‌-খুড়ো।"

"সুপ্রভাত, পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি।"

"আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই—যদি তার মা মালচো, ভাই হোহেন্‌তোল্‌জ্‌, বোন কাসেত্রাস্ত আর সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ নিজে রাজি থাকে।"

"মা মালচো কোথায়?"

"গোয়ালে দুধ দুইছে।"

"সুপ্রভাত, মা মালচো।"

"সুপ্রভাত, পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি।"

"আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই—যদি তার ভাই হোহেন্‌তোল্‌জ্‌, বোন কাসেত্রাস্ত আর সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ নিজে রাজি থাকে।"

"তার ভাই হোহেন্‌তোল্‌জ্‌ কোথায়?"

"চিলেকোঠায় কাঠ কাটছে।"

"সুপ্রভাত, ভায়া হোহেন্‌তোল্‌জ্‌।"

"সুপ্রভাত, পিফ্‌-পাফ্‌ পোলত্রি।"

"আমার সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই—যদি বাবা হোলেনুথ্‌, মা মালচো, বোন কাসেত্রাস্ত আর

সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ নিজে রাজি থাকে।"

"বোন কাসেগ্রান্ত কোথায়?"

"বাগানে বাঁধাকপি কাটছে।"

"সুপ্রভাত, বোন কাসেগ্রান্ত।"

"সুপ্রভাত, পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি।"

"আমার সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই—যদি বাবা হোলেন্‌থ্‌, মা মালচো, ভাই হোহেন্‌তোল্‌জ্‌ আর সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ নিজে রাজি থাকে।"

"সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌ কোথায়?"

"তার ঘরে বসে পয়সা গুন্‌ছে।"

সুপ্রভাত সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌।"

"সুপ্রভাত, পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি।"

"আমাকে বিয়ে করবে?"

"নিশ্চয়ই—যদি বাবা হোলেন্‌থ্‌, মা মালচো, ভাই হোহেন্‌তোল্‌জ্‌ আর বোন কাসেগ্রান্ত রাজি থাকে।"

"সুন্দরী কাত্রিনেল্‌জ্‌, বিয়ের যৌতুক দেবার তোমার কী আছে?"

"নগদ চোদ্দো পয়সা, ধার দেওয়া আছে তিনটে টাকা, আধ পাউণ্ড শুঁই, একমুঠো বীজ আর একমুঠো মটরশুঁটি। পিফ্‌-পাফ্‌-পোলত্রি, এটা ভালো যৌতুক নয়? তোমার পেশা কী? তুমি কি দর্জি?"

"তার চেয়ে অনেক ভালো।"

"তুমি কি মুচি?"

"তার চেয়ে অনেক ভালো।"

"তুমি কি ঠিকাদার?"

"তার চেয়ে অনেক ভালো।"

"তুমি কি জাঁতাওয়ালা?"

"তার চেয়ে অনেক ভালো।"

"তুমি কি ঝাঁটা বানাও?"

"হ্যাঁ, আমি ঝাঁটা বানাই! এটা সুন্দর পেশা নয়?"

শেয়াল আর ঘোড়া

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা—এক চাষীর বিশ্বস্ত একটি ঘোড়া বুড়ো থুত্থুড়ে হয়ে পড়ে। কোনো কাজ করার শক্তি তখন তার ছিল না। তাই রোজ তাকে খাবার-দাবার দিতে তার মালিক ভীষণ বিরক্ত হত। এক সকালে ঘোড়াটাকে সে বলল, "তুই আর এখন আমার কোনো কাজে লাগিস না। তবু তোকে খেতে-দেতে দেব যদি একটা সিংহকে আমার কাছে ধরে আনতে পারিস। এখন আমার আস্তাবল থেকে দূর হ। দেখ গিয়ে তোর গায়ে এখনো কোনো খ্যামতা আছে কি না।" এই-না বলে ঘোড়াটাকে সে মাঠের মধ্যে তাড়িয়ে বার করে দিল।

অসহায় বুড়ো ঘোড়াটার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ঝড়-ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে চলল বনের দিকে।

যেতে-যেতে তার সঙ্গে দেখা হল এক শেয়ালের। শেয়াল তাকে প্রশ্ন করল, "ভায়া, মাথা নিচু করে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

ঘোড়া বলল, "হায় বন্ধু, আমার প্রভুর খুব টাকার লোভ। সে ভুলে গেছে অতীতে বিশ্বস্তভাবে আমি তার কত কাজ করেছিলাম। এখন আর আমি লাঙল টানতে পারি না। তাই আমাকে সে পেট ভরে খেতে না দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে।"

শেয়াল প্রশ্ন করল, "তোমার প্রভু কোনো শর্ত তোমায় বলে নি, যাতে সেখানে থাকতে আর খেতে-দেতে পারো?"

ঘোড়া বলল, "তা বলেছে বটে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। বলেছে,

একটা সিংহকে ধরে আনতে পারলে আমায় থাকতে আর খেতে-দেতে দেবে। কিন্তু আমি তো বুড়ো। সে শক্তি আমার কোথায়? সে জানে আমার পক্ষে এটা করা একেবারে অসম্ভব।"

শেয়াল বলল, "আমি তোমায় সাহায্য করব। মড়ার মতো টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ো।"

শেয়ালের কথামত ঘোড়া শুয়ে পড়ল। শেয়াল তখন সোজা সিংহর গুহায় গিয়ে তাকে বলল, "বাইরে একটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে। ভুরিভোজ করবে তো এসো।"

শেয়ালের সঙ্গে সিংহ ঘোড়াটার কাছে আসতে শেয়াল তাকে বলল, "এখানে তুমি মনের সুখে খেতে পারবে না। মরা ঘোড়াটাকে তোমার লেজে বেঁধে দিচ্ছি। এটাকে তোমার গুহায় টেনে নিয়ে গিয়ে আরাম করে খেয়ো।"

শেয়ালের কথাটা সিংহর মনে ধরল। ঘোড়াটাকে তার লেজের সঙ্গে বাঁধার জন্য সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শেয়াল কিন্তু ঘোড়ার লেজ দিয়ে সিংহর পাগুলো চট্‌পট্‌ বেঁধে ফেলল খুব শক্ত করে। তার পর ঘোড়ার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, "ভায়া, এবার কষে দৌড় লাগাও।" সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে সিংহকে হেঁচড়ে টানতে-টানতে ছুটতে শুরু করে দিল ঘোড়াটা। সিংহ এমন হাঁক-ডাক জুড়ে দিল যে, ভয় পেয়ে বন থেকে উড়ে পালাল পাখির দল। ঘোড়া কিন্তু থামল না। সিংহকে সোজা টেনে নিয়ে হাজির করল তার প্রভুর দোরগোড়ায়।

সিংহকে দেখে তার প্রভু বলল—ঘোড়া তার কাছে থাকবে আর যত দিন বাঁচে খেতে পাবে পেট ভরে।

নাচের জুতোয় ফুটো

একসময় এক রাজার ছিল বারোটি মেয়ে। প্রত্যেকেই খুব সুন্দরী। একটা হল ঘরে একসঙ্গে তারা ঘুমোত। সারি সারি করে সাজানো থাকত তাদের বিছানা। প্রতি রাতে শুয়ে পড়ার পর রাজা দরজায় কুলুপ এঁটে দিতেন। কিন্তু রোজ সকালে কুলুপ খুলে তিনি দেখতেন নেচে নেচে মেয়েদের জুতোর তলা ফুটো হয়ে গেছে। এই রহস্যের কোনো কুল-কিনারা না করতে পেরে রাজা ঘোষণা করলেন—রাতের বেলায় নেচে নেচে কী করে মেয়েদের জুতো ফুটো হয় সেটা যে আবিষ্কার করতে পারবে তার সঙ্গে এক মেয়ের বিয়ে দেবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজত্বও পাবে সে। কিন্তু রহস্যভেদ করতে যে আসবে তিন দিন তিন রাতের মধ্যে সে সফল না হলে তাকে মেরে ফেলা হবে। কয়েক-দিনের মধ্যে এক রাজপুত্র জানাল রহস্যভেদ করতে সে প্রস্তুত। রাজপুত্রকে মহা সমাদরে সন্ধেবেলায় নিয়ে যাওয়া হল সেই হল ঘরের পাশের ঘরে। তার পর তার জন্য বিছানা পেতে তাকে বলা হল লক্ষ্য করতে—রাজভবনের শোবার ঘরে গিয়ে কে নাচে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপুত্রের দু চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এল আর শেষপর্যন্ত সে পড়ল ঘুমিয়ে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সে স্পষ্ট বুঝতে পারল রাজকন্যেরা নাচের আসরে গিয়েছিল—কারণ তাদের প্রত্যেকের জুতোর তলায় ছিল ফুটো। দ্বিতীয় আর তৃতীয় রাতেও ঘটল একই ঘটনা। ফলে রাজপুত্রের মুণ্ডু নিষ্ঠুরভাবে কেটে ফেলা হল। তার পর এল আরো কয়েকজন রাজপুত্র। কিন্তু কেউই রহস্যটার কুল-

কিনারা করতে পারল না। ফলে প্রত্যেকেরই মুণ্ড কেটে ফেলা হল।
এমন সময় একদিন সেই শহর দিয়ে যাচ্ছিল গরিব এক আহত সৈনিক। এক বুড়ি তাকে প্রশ্ন করল—সে চলেছে কোথায়।

ঠাট্টার সুরে সৈনিক বলল, "ভাবচি রাজাকে গিয়ে বলি রোজ রাতে কোথায় নাচতে গিয়ে রাজকন্যেরা জুতো ফুটো করে আসে সেটা আমি চুপিসারে দেখতে চাই। এই গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়ে রাজা হবার ইচ্ছা আমার আছে।"

সৈনিকের ঠাট্টার সুর বুড়ি ধরতে পারল না। সে ভাবল সৈনিক বুঝি সত্যি সত্যি রাজার কাছে চলেছে। তাই তাকে বলল, "কাজটা যে-রকম কঠিন বলে ভাবছ আসলে সেটা মোটেও সেরকম কঠিন নয়। রাতে যে সরবত তোমাকে খেতে দেবে সেটা না খেয়ে মট্‌কা মেরে পড়ে থেকো। তা হলেই সব-কিছু জানতে পারবে।" তার পর তাকে একটা আলখাল্লা দিয়ে বুড়ি বলল, "এটা পরলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন রাজকন্যেদের পিছু নিয়ে জানতে পারবে তারা কোথায় যায়।"

বুড়ির কথায় সাহস পেয়ে সৈনিক রাজার কাছে গিয়ে জানাল সে এসেছে রাজকন্যেদের একজনকে বিয়ে করতে। আগের রাজপুত্রদের মতো তাকেও মহা সমাদরে পরতে দেওয়া হল রাজপোশাক। ঘুমোবার সময় হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজকন্যেদের শোবার ঘরের পাশের ঘরে। তার পর বড়ো রাজকন্যে তার জন্যে নিয়ে এল এক গেলাস সরবত। সরবতের একটি ফোঁটাও সে কিন্তু খেল না। থুতনির তলায় সে একটা স্পঞ্জ এঁটে রেখেছিল। সরবতটা সেখানে ঢালতে স্পঞ্জে শুষে গেল। তার পর সে শুয়ে পড়ল আর মিনিটকয়েকের মধ্যে এমনভাবে নাক ডাকতে শুরু করল যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাজকন্যেরা তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। বড়ো রাজকন্যে বলল, "এ বেচারাও মিছিমিছি মরতে এসেছে। তার পর তারা আলমারি ড্রয়ার আর বাক্স খুলে ভালো ভালো পোশাক বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করে নাচতে যাবার কথা ভেবে মনের আনন্দে ঘরময় লুটোপুটি করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু মনে হল, ছোটো রাজকন্যে কেমন যেন মন মরা। সে বলল, "তোমাদের এত ফুর্তি কেন বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হচ্ছে আমাদের একটা বিপদ ঘটবে।"

বড়ো রাজকন্যে বলল, "তুই ভারি বোকা। ভয় পাবার কি আছে? ভুলে যাচ্ছিস কত রাজপুত্তুর আমাদের গোপন কথা জানবার মিথ্যে চেষ্টা করেছিল? অন্যেদের মতো এই সৈনিককেও আমি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। ছোকরা যে জেগে উঠবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।"

যাত্রা করার আগে তারা দেখল সৈনিক চোখ বন্ধ করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারা নিশ্চিন্ত হল।

তার পর বড়ো রাজকন্যে তার বিছানার মাথার কাছে গিয়ে টোকা দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা নেমে গেল মেঝের তলায়। সেই গর্ত দিয়ে তখন তারা একে-একে চলল নেমে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বড়ো রাজকন্যে।

সৈনিক তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। তারা নেমে যেতে আলখাল্লাটা গায়ে চড়িয়ে ছোটো রাজকন্যের পিছন-পিছন সে যেতে শুরু করল। আর সিঁড়ির মাঝপথে ছোটো রাজকন্যের পোশাকটা সে দিল মাড়িয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ ভয় পেয়ে ছোটো রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল—

"কে কে? কেউ আমার পোশাক ধরে টানছে।"

বড়ো রাজকন্যে ধমকে বলল, "বোকার মতো চেঁচাস না। পোশাকটা নিশ্চয়ই কোনো পেরেকে আটকেছিল।"

নামতে নামতে তারা পৌঁছল একেবারে তলায়। সেখানে ছিল চমৎকার এক পথ। দু পাশে সারি-সারি গাছ। গাছগুলোর সোনার আর রুপোর পাতা ঝল্‌মল্‌ করছিল।

সৈনিক ভাবল, 'প্রমাণ হিসেবে গাছের একটা পাতা সঙ্গে নেওয়া যাক।'

গাছের একটা ডাল সে ভাঙতেই ভীষণ জোরে একটা শব্দ হল। শব্দ শুনে চমকে উঠে ছোটো রাজকন্যে চেঁচিয়ে উঠল, "কিছু একটা ঘটতে চলেছে। শব্দটা তোমরা শোনো নি?"

বড়ো রাজকন্যে আবার তাকে ধমকে বলল, "ওটা তো গুলি ছোঁড়ার শব্দ। রাজপুত্তুররা আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে গুলি ছুঁড়ছে।"

তার পর তারা পৌঁছল আর-একটা পথে। সেখানকার গাছের পাতাগুলো ছিল হীরের। সৈনিক একটা ডাল ভাঙতে আবার বন্দুকের শব্দের মতো ভীষণ জোরে একটা শব্দ হল।

ছোটো রাজকন্যে আঁতকে উঠল লাফিয়ে। কিন্তু বড়ো রাজকন্যে আবার বলে উঠল রাজপুত্ররা গুলি ছুঁড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

তার পর তারা পৌঁছল এক হ্রদের তীরে। সেখানে বাঁধা ছিল বারোটা ময়ূরপঙ্খী নৌকো। প্রত্যেক নৌকোর পাটাতনে ছিল এক-একজন সুপুরুষ রাজপুত্র। বারোজন রাজকন্যের জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এক-এক নৌকোয় উঠল এক-এক রাজকন্যে।

ছোটো রাজকন্যের সঙ্গে নৌকোয় উঠল সেই সৈনিক। খানিক পর তার সঙ্গী ছোটো রাজকন্যেকে বলল, "নৌকোটা আজ রাতে এত ভারী লাগছে কেন? নৌকো বাইতে আমি হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছি।"

ছোটো রাজকন্যে বলল, "তার কারণ বোধ হয় আজ রাতটা ভারি গরম। আমার তো নিশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

হ্রদের অন্য পারে ছিল চমৎকার একটা আলোয় ঝল্‌মলে কেল্লা। সেখান থেকে ভেসে আসছিল গান-বাজনার শব্দ। তীরে নেমে কেল্লার মধ্যে গিয়ে সবাই নাচতে শুরু করল। সৈনিকও অদৃশ্য থেকে নাচতে লাগল। আর যখনই তারা জিরোবার সময় সরবতের গেলাস ঠোঁটে তুলতে যায় সৈনিক সঙ্গে-সঙ্গে চোঁ-চোঁ করে সেগুলো শেষ করে দিতে থাকে।

এতে ভীষণ ঘাবড়ে গেল ছোটো রাজকন্যে। কিন্তু আগের মতো বড়ো রাজকন্যে তাকে বলল চুপ করতে। এইভাবে ভোর তিনটে পর্যন্ত তারা নেচে চলল। তার পর জুতোগুলো ফুটো হয়ে যেতে বাধ্য হয়ে নাচ থামিয়ে তারা ফিরে চলল।

সিঁড়িটার কাছে তারা পৌঁছলে সৈনিক চুপিচুপি সামনে এগিয়ে তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে হাই তুলতে-তুলতে রাজকন্যেরা যখন নিজেদের নিজেদের শোবার ঘরে এল তখন আগেকার মতোই সৈনিক নাক ডাকাচ্ছে। তারা তাদের ভালো পোশাকগুলো খুলে আলমারিতে তুলে রেখে পা ঝাঁকিয়ে জুতোগুলো বিছানার তলায় ছুঁড়ে ফেলে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সৈনিক কিছুই বলল না কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতেও চুপিচুপি গিয়ে দেখল সেই-সব অদ্ভুত ঘটনা। আগের মতোই সব-কিছু ঘটল। নেচে-নেচে ফুটো হয়ে গেল রাজকন্যেদের জুতোগুলো।

যা-যা দেখেছে তার প্রমাণ হিসেবে গাছের ডাল-পাতার বদলে তৃতীয় রাতে সৈনিক নিয়ে এল সরবতের একটা গেলাস।

তার পর রাজার কাছে যাবার সময় হলে কোটের ভিতরে সে নিল ডাল-পাতাগুলো আর গেলাসটা। কী কথা হয় শোনার জন্য দরজার পিছনে আড়ি পেতে রইল বারোজন রাজকন্যে।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "রাতে কোথায় নেচে-নেচে আমার মেয়েদের জুতো ফুটো হয়েছে?"

সৈনিক বলল, "মাটির তলার এক কেল্লায় বারোজন রাজপুত্রের সঙ্গে নেচে-নেচে।" এই-না বলে প্রমাণগুলো রাজার হাতে দিল সে।

রাজা তখন তাঁর মেয়েদের ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করলেন সৈনিকের কথা সত্যি কি না। রাজকন্যেরা যখন বুঝল তারা ধরা পড়ে গেছে এবং মিথ্যে কথা বলে কোনো লাভ নেই তখন সব কথা তারা স্বীকার করল।

সৈনিককে রাজা তখন প্রশ্ন করলেন, "আমার কোন মেয়েকে তোমার পছন্দ?"

সৈনিক বলল, "আমি এখন আর তরুণ নই। তাই আপনার বড়ো মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।"

তাই বড়ো রাজকন্যের বিয়ে হয়ে গেল সৈনিকের সঙ্গে এবং রাজার মৃত্যুর পর সে-ই পেল রাজত্ব।

বুলবুলি আর ভালুক

একদিন ভালুক আর নেকড়ে একসঙ্গে বনে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় একটা পাখির গান শুনে ভালুক বলল, "নেকড়ে ভায়া, অমন মিষ্টি গান কোন পাখি গাইছে?"

নেকড়ে বলল, "ও হল পাখিদের রাজা। ওর কাছে আমাদের মাথা নোয়ানো দরকার।" আসলে গান গাইছিল একটা বুলবুলি।

ভালুক বলল, "আমি তার রাজপ্রাসাদটা দেখতে চাই। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।"

নেকড়ে বলল, "যতটা সহজ ভেবেছ ওখানে যাওয়া ততটা সহজ নয়। রানী না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই রানী ফিরল। রাজা আর রানী দুজনেরই মুখে ছিল খাবার। তারা যাচ্ছিল তাদের বাচ্ছাদের খাওয়াতে। ভালুক তখনি চাইল তাদের পিছু নিতে। কিন্তু নেকড়ে বলল, "না, মহামান্য রাজা আর রানী না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" গাছের যে ফোকরে বুলবুলিদের বাসা সেটা লক্ষ্য করে তারা চলে গেল।

কিন্তু রাজপ্রাসাদটা না দেখা পর্যন্ত ভালুক স্বস্তি পেল না। খানিক পরে আবার সেখানে সে ফিরে এল। এসে দেখে রাজা আর রানী বেরিয়েছে। উঁকি মেরে সে দেখল বাসায় রয়েছে পাঁচ-ছটা ছানা। সে বলে উঠল, "এটা রাজপ্রাসাদ না হাতি! এটা তো যাচ্ছেতাই জায়গা। আর তোরাও রাজার ছেলে হতে পারিস না। তোরা তো দীনদুঃখী কতকগুলো ছানা।"

তার কথা শুনে ভীষণ রেগে বুলবুলির বাচ্ছারা চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি যা বললে মোটেই আমরা তা নই। আমাদের মা-বাবা মানী লোক। আমাদের অপমান করলে বলে শাস্তি পাবে।" তাদের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে ভালুক আর নেকড়ে দৌড়ে গিয়ে সেঁধুল নিজেদের গর্তে।

বুলবুলির বাচ্ছারা কিন্তু থামল না। তারস্বরে চলল চেঁচিয়ে। তাদের-মা বাবা খাবার নিয়ে এলে পর তারা বলল, "আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের শিশু কি না স্থির হবার আগে মাছির একটা পা-ও আমরা মুখে দেব না। ভালুক এসে আমাদের অপমান করে গেছে।"

রাজা বলল, "শান্ত হও। এর একটা বিহিত করছি।" এই-না বলে মহামান্য রানীর সঙ্গে ভালুকের আস্তানায় উড়ে গিয়ে সে বলল, "ওরে বুড়ো ভালুক! আমাদের বাচ্ছাদের অপমান করেছিস কেন? এর জন্যে মজা দেখাচ্ছি। ভীষণ একটা লড়াই হবে।"

ভালুকের বিরুদ্ধে তাই যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। ভালুক ডেকে

পাঠাল চারপেয়ে সব জন্তুদের—ষাঁড়, গোরু, গাধা, হরিণ আর হরিণীদের, আর আকাশে যারা উড়ে বেড়ায় তাদের সবাইকে ডেকে পাঠাল বুলবুলি—শুধু ছোটো-বড়ো পাখিদেরই নয়, ডাঁশ-মশা, ভীমরুল, মৌমাছি আর মাছিদেরও।

লড়াই শুরু হবার আগে বিপক্ষ দলের সেনাপতি কে জানবার জন্য বুলবুলি পাঠালো নানা গুপ্তচর। তার দলের মধ্যে ডাঁশ-মশাই সব চেয়ে চতুর। শত্রুদের সৈন্য যেখানে জমায়েত হচ্ছিল বনের সেখানে উড়ে গিয়ে একটা গাছের পাতায় সে বসল। সেই গাছের নীচে বসেছিল জন্তুদের মন্ত্রণা-সভা। ভালুক দাঁড়িয়ে উঠে শেয়ালকে ডেকে বলল, "শেয়ালভায়া, জন্তুদের মধ্যে তুমিই সব চেয়ে ধূর্ত। তাই তুমিই হবে আমাদের সেনাপতি।"

শেয়াল বলল, "মোটেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের সংকেতটা কী হবে?" অন্য জন্তুরা সেটা স্থির করতে না পারায় শেয়াল বলে চলল, "আমার লেজটা খুব লম্বা আর লোমশ। সেটাকে দেখতে অনেকটা পাখির লাল পালকের মতো। সেটা খাড়া দেখলে বুঝবে পথ পরিষ্কার। তখন তোমরা দৌড়ে এগিয়ো। কিন্তু যদি দেখ সেটা নীচের নামান—তা হলে চোঁ-চাঁ দৌড় দিয়ো।"

কথাগুলো শুনে ডাঁশ-মশা বাড়িতে উড়ে এসে বুলবুলিকে সব-কিছু জানাল।

লড়াই শুরু হবার দিন খুব ভোরে জন্তুর দল এমন হৈচৈ করে ছুটে চলল যে, থর্‌থর্‌ করে উঠল চার দিক। আর বুলবুলি তার দলবল নিয়ে উড়ে চলল কানে তালা ধরান কিচির্‌-মিচির্‌ করে। তার পর দু পক্ষই করল পরস্পরকে আক্রমণ। বুলবুলি কিন্তু ডাঁশ-মশাকে আগে পাঠিয়েছিল শেয়ালের পিছনে প্রাণপণ শক্তিতে হুল ফোটানোর জন্য। প্রথমবার হুল ফোটাবার পর চমকে উঠে শেয়াল পিছনকার পা দুটো ছুঁড়ল। কিন্তু লেজ নামাল না। দ্বিতীয়বার হুল ফোটাবার পর মুহূর্তের জন্য তার পতাকাটা নামাতে সে বাধ্য হল। কিন্তু তৃতীয়বার হুল ফোটাবার পর লেজটা আর সে খাড়া রাখতে পারল না। বিকট জোরে আর্তনাদ করে পায়ের মধ্যে লেজটা সে গুটিয়ে ফেলল। আর তাই-না দেখে জন্তুর দল ভাবল আর কোনো আশা নেই। তাই যে যার গর্তের দিকে শুরু করল প্রাণপণে

ছুটতে। এই ভাবে যুদ্ধে জয়ী হল পাখিরা।

মহামান্য রাজা আর রানী তখন তাদের বাসায় উড়ে গিয়ে বাচ্চাদের বলল, "বাছা, লড়াইতে আমরা জিতেছি পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে প্রাণ ভরে ফুর্তি কর।"

কিন্তু বুলবুলিদের ছানারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "যতক্ষণ-না ভালুক এসে ক্ষমা চেয়ে বলছে আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের শিশু ততক্ষণ আমরা জলস্পর্শ করব না।"

তাই বুড়ো বুলবুলি ভালুকের আস্তানায় উড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভালুক, আমাদের বাসায় গিয়ে ছেলেদের কাছে তোকে ক্ষমা চাইতে হবে। নইলে একটা পাঁজরাও আস্ত থাকবে না।"

তাই শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে ভালুক তাঁদের বাসায় গুটিগুটি এসে ক্ষমা চাইল। বুলবুলির বাচ্ছারা তখন ঠাণ্ডা হয়ে পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত করে চলল নাচ-গান-ফূর্তি।